গান্ধীচরিত

গান্ধীচরিত

শ্রীনির্মলকুমার বসু

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২, মোহনবাগান রো : কলিকাতা-৪

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৫৬

মূল্য তিন টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—৩০. ১১. ৪৯

ভূমিকা

গান্ধীজীর চরিত্র আমার চোখে যেমনভাবে ফুটিয়াছে তাহাই গান্ধীচরিতে অঙ্কন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করিতেছি, তাহা হয়তো অপরের নিকট সত্য বলিয়া মনে নাও হইতে পারে। আবার আমারই নিকট আজ যাহা সত্য, তাহা কাল অন্য রূপ ধারণ করিতে পারে। তবু, সমুদ্রের মত বিশাল গান্ধীচরিত্রের সম্পর্কে আজ যাহা সত্য বলিয়া আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে, সুধীবৃন্দের নিকট তাহা পরিবেশন করা আমার ধর্ম বলিয়া মনে করি।

২৭এ কার্তিক ১৩৫৬
৩৭ বোসপাড়া লেন
কলিকাতা-৩

শ্রীনির্মলকুমার বসু

সূচি

সত্য

অহিংসা

দিনচর্যা

ব্রহ্মচর্য

সেনাপতি গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী

সত্য

১৯৪২ সালের দুর্গাপূজার সময়ে প্রচণ্ড ঝড় ও বন্যার আঘাতে মেদিনীপুর জেলাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কাঁথি ও তমলুক মহকুমার অধিবাসীগণ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নিজেদের সাধ্যমত দেশশাসনের কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ইংরেজ সরকার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তাঁহাদিগকে কাবু করিতে পারেন নাই। অবশেষে গান্ধীজী মুক্তিলাভ করিবার পর যখন কংগ্রেসকর্মীগণকে গোপন থাকিতে নিষেধ করিয়া দিলেন, তখনই শুধু মেদিনীপুরের কর্মীরা একে একে সরকারের নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন। মেদিনীপুরবাসীর শৌর্য ও দৃঢ়তার কাহিনী শুনিয়া গান্ধীজী তাঁহাদিগকে যথোচিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু যে যে কাজ দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, কংগ্রেসকর্মীগণ অহিংসার নিয়ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, সেগুলির জন্য তিনি তাঁহাদিগকে সমালোচনা করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন নাই।

* * *

প্রথম পরিচয়

১৯৪৫ সালের শেষভাগে গান্ধীজী বাংলা, আসাম ও মাদ্রাজ প্রদেশ পরিদর্শন করিবার জন্য আগমন করেন। তিনি সেবাগ্রাম হইতে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্বে আমি তাঁহার জনৈক সহকর্মীর নিকট হইতে পত্রে নির্দেশ পাই যে, গান্ধীজীর ইচ্ছা বাংলা দেশে পৌঁছিলে যেন আমি অতি অবশ্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। তারিখ ২রা ডিসেম্বর ১৯৪৫এ

গান্ধীজী সোদপুর খাদিপ্রতিষ্ঠানে পদার্পণ করিবার অল্প কিছুক্ষণ পরে আমাকে ডাকিয়া কয়েকটি কথা বলেন, এবং পরে আরও কিছু বলিবার জন্য আমাকে আসিতে নির্দেশ দেন।

গান্ধীজীর সঙ্গে আমার ইতিপূর্বে কোনদিন ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ ঘটে নাই। অবশ্য অনেক দিন হইতেই তাঁহার রচনাবলী সংগ্রহ করিয়া অথবা তাঁহার মতামতের বিষয়ে আলোচনা করিয়া কিছু কিছু লেখার অভ্যাস আমার ছিল, এবং এই সূত্রে চিঠিপত্রেরও সামান্য আদানপ্রদান হইত। তদুপরি ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে দুই দিনের জন্য ওয়ার্ধাতে তাঁহার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা তর্ক করার সুযোগও লাভ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যাহাকে ঘনিষ্ঠ পরিচয় বলে, তাহার সৌভাগ্য সোদপুরে ১৯৪৫ সালের শেষভাগেই প্রথম লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

প্রথম সাক্ষাতের পরে, ৪-১২-১৯৪৫ তারিখে বেলা ৪-১৫ মিনিটের সময়ে গান্ধীজী পুনরায় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন তিনি বিকালের শেষ আহারে সবেমাত্র বসিয়াছেন। সেবায় নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁহার জন্য ফল, দুধ প্রভৃতি রাখিয়া চলিয়া গেলেন। গান্ধীজীর সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত পিয়ারেলাল তখন অন্যত্র কাজে ব্যস্ত ছিলেন, নিকটে শুধু আমি একটি মোড়ার উপরে বসিয়া রহিলাম। গান্ধীজী খাওয়ার কাজ আরম্ভ করিবার পরে আমাকে বলিলেন, তোমাকে ডাকিয়াছি, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। তুমি যে শুধু আমার লেখা হইতে সংকলন করিয়া থাক তাহা নহে, আমার মতামত সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টাও কর। সে বিষয়ে তোমার ভুল হইয়া থাকে, সেজন্য আমি তোমায় সতর্ক করিয়া দিতে চাই।

গান্ধীজীর অভিযোগ শুনিয়া আমি দমিয়া গেলাম। ভয়ও হইল।

কারণ পাছে কোথাও ভুল হয়, অর্থাৎ আমি নিজের সংস্কারের বশে পাছে গান্ধীজীর মতামতকে বিকৃত করিয়া ফেলি, এই আশঙ্কায় আমি সর্বদা সতর্ক হইয়া চলিতাম। প্রকাশিত লেখার দ্বারা যাহা সমর্থন করা যায় না, এমন মত গান্ধীজীর বলিয়া কখনও চালাইবার চেষ্টা করি নাই। কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে যে আমার প্রবন্ধগুলি একপেশে হইত, ইহা আমি জানিতাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, গান্ধীজী গভীর শ্রদ্ধার সহিত ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার হৃদয়ে ভগবান এবং মানুষ, ভগবৎসেবা ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা, এক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমি গান্ধীবাদের বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার সময়ে তাঁহার এই গভীর ভগবদ্‌বিশ্বাসের বিষয়ে উল্লেখই করিতাম না, কেবল মানুষের প্রতি তাঁহার অবিচল প্রেম এবং মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সুপ্ত মনুষ্যত্বকে তপস্যার দ্বারা জাগাইয়া তোলার বিষয়ে বহুবার লিখিয়াছি। এরূপ একদেশদর্শিতাকে হয়তো দোষের বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে; কিন্তু গান্ধীজী যেরূপ ভুলের কথা উল্লেখ করিলেন, নিজের জ্ঞাতসারে কখনও সেরূপ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারিলাম না। সেই জন্য গান্ধীজী আরও কি বলিবেন, তাহার প্রতীক্ষায় মৌন হইয়া বসিয়া রহিলাম।

অল্পক্ষণ পরে গান্ধীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, তুমি আমার লেখা হইতেই আমাকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু আমার নিকটে থাকিয়া কাজের মধ্যে কখনও আমাকে দেখিবার সুযোগ পাও নাই। আমার লেখার মধ্যে যে মূর্তি প্রকাশ পায়, তাহা তো আমার সমগ্র রূপ নয়। তুমি আমার নিকটে থাকিলে, একসঙ্গে ভ্রমণ করিলে, প্রতিদিনের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিলে আমাকে আরও ভাল ভাবে চিনিতে পারিবে।

অনেক দিন পূর্বে আমি একবার ভ্রমণের মধ্যে মেদিনীপুরে পৌঁছাই। নাড়াজোলের রাজবাড়িতে আমি অতিথি হইয়াছিলাম। খাইবার সময়ে দেখিলাম যে, সোনার থালায় খাবার পরিবেশন করা হইয়াছে। কিন্তু সোনার থালায় খাওয়া আমার নীতিবিরুদ্ধ। তবু মনের ভাব মনের মধ্যে গোপন করিয়া আমি আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। এই জাতীয় দুর্বলতা আমার মধ্যে আছে। সেগুলির পরিচয় না পাইলে তুমি আমার পুরা পরিচয় পাইবে না। আদর্শ এবং আচরণের মধ্যে কতখানি ব্যবধান পড়িয়া যায়, তাহা না জানিলে আদর্শের সম্বন্ধেই তোমার জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

গান্ধীজী আরও একটি উদাহরণের উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, একবার আমি ট্রেনে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে আমার খাবারের সময় হইল। খাবারের মধ্যে আঙুর দেখিতে পাইয়া জনৈক সহযাত্রী অভিযোগ করিয়া বলিলেন, তুমি দিনে ছয় পয়সার বেশি আহার কর না শুনিয়াছিলাম, এই কি তাহার নমুনা? আমি সেই বন্ধুটিকে সম্মান করিয়া বলিয়াছিলাম, ভালই হইল যে আমাকে আজ এই অবস্থায় আপনি দেখিয়া ফেলিলেন। এখন আপনার কর্তব্য, আমার দোষত্রুটি-গুলি অপরের নিকটে জানানো। তাহা হইলে, লোকে অন্তত আমার সত্য পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

তৃতীয় একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া শেষবারের মত গান্ধীজী বলিলেন, সমালোচকদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় একবার স্বামী — আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি নিজে লোক মন্দ নই, কিন্তু যাহারা আমার সঙ্গে থাকে তাহারা কপট এবং মিথ্যাচারী। উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, আমি তো সঙ্গীদের লইয়া একটি আদর্শের জন্য সমবেত ভাবে সাধনা করিতেছি। যদি কোনও দোষত্রুটি ঘটে, তবে

তাহার জন্য অপরেও যেমন দায়ী, আমিও তেমনই সমান দায়ী হইব।

এই সকল সমালোচনার বৃত্তান্ত শুনিবার সময়ে আমার যথেষ্ট বিস্ময়ের উদয় হইতেছিল। কারণ, আমি ভাবি নাই যে, গান্ধীজী কখনও নিজের সাধনার শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তে লব্ধ আদর্শকে নিজের প্রকৃত প্রকাশ না ভাবিয়া বরং আচরণের মধ্যে সেই আদর্শকে যতটুকু স্থান দিতে পারিয়াছেন, তাহাকেই নিজের সত্যতর প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করিবেন।

আর শুধু তাই নয়, আমার মতন একজন নূতন লোকের সামনে যে রকম অকুণ্ঠিত ভাবে নিজের বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন, তাহাতে আরও বিস্মিত হইয়াছিলাম। সর্বশেষে তিনি ইহাও বলিলেন যে, ভারতবর্ষে অহিংসার আদর্শকে রূপ দিবার জন্য তিনি যে-সকল সংঘ রচনা করিয়াছেন, সেগুলিকেও পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। আমি যদি তাঁহার উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির সময়ে বিভিন্ন সমিতিগুলির কাজ দেখি, তাহা হইলে আরও সহজে বাস্তব অবস্থার মধ্যে আদর্শকে কতখানি প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহা বুঝিতে পারিব।

গান্ধীজীর সহিত যেদিন আমার এইরূপ আলোচনা হইয়াছিল, তাহা আমার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। কারণ গান্ধীজীর নূতন একটি রূপ আমার নিকট সেদিন ফুটিয়া উঠিল। এখানে কিন্তু ইহাও বলা প্রয়োজন যে, গান্ধীজীর আলোচনার মধ্যে একটি সুর ক্ষণেকের জন্য আমার কানে ভাল লাগে নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার বিষয়ে যখন উল্লেখ করিতেছিলেন, তখন প্রসঙ্গক্রমে তিনি একবার ইহাও বলিয়া ফেলিলেন যে, পরবর্তীকালে স্বামী —এর চরিত্রে কোন দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছিল এবং তিনি জনসমাজে কিছু হীন বলিয়া প্রতিপন্ন

হইয়াছিলেন। গান্ধীজীর মুখে ক্ষীণ নিন্দাবাচক শব্দ শুনিয়া আমার ভাল লাগে নাই, কারণ ইহা তাঁহার নিকটে প্রত্যাশা করি নাই। আমার সে সময়ে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, গান্ধীজী কি তবে নিন্দাস্তুতির সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই? সম্ভবত আমারই ভুল হইয়া থাকিবে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, নিজেকে বুঝিবার জন্য তাঁহার পক্ষে অপরের সমালোচনার প্রয়োজন হয়তো তখনও অবশিষ্ট ছিল।

এই প্রসঙ্গে পরমহংসদেবের একটি উক্তি মাঝে মাঝে স্মরণ হইয়া থাকে। তিনি একবার বলিয়াছিলেন যে, সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যেও অহং-এর কিছু দাগ থাকিয়া যায়। নারিকেল বা সুপারি গাছের বাল্‌তো খসিয়া গেলে অথবা পদ্মফুলের পাপড়ি খসিয়া পড়িলে যেমন তাহার দাগ থাকিয়া যায়, সিদ্ধপুরুষগণের জীবনেও তেমনই কোন কোন সংস্কারের দাগ অবশিষ্ট থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু তাহা দ্বারা কোন অনিষ্ট ঘটে না।

এইরূপে গান্ধীজীর সান্নিধ্য এবং মানুষ হিসাবে তাঁহার খানিক পরিচয় লাভ করিয়া তৃপ্তমনে সে রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

বিহার যাত্রার বিষয়ে আলোচনা

২৭এ ডিসেম্বর ১৯৪৬। অর্থাৎ প্রায় এক বৎসর পরের ঘটনা। গান্ধীজী তখন দাঙ্গার ফলে বিধ্বস্ত নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত শ্রীরামপুর নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে সাময়িকভাবে বসবাস করিতেছিলেন। সঙ্গে আমরা মাত্র দুই জন সেবক নিযুক্ত ছিলাম। তাহার মধ্যে ত্রিবাঙ্কুরের অধিবাসী পরশুরাম নামে জনৈক তামিল ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরশুরামের বয়স তিরিশের কাছাকাছি হইবে। সে-সময়ে গান্ধীজী প্রতিদিন স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানদের সহিত মিশিয়া পুনরায়

তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি হিন্দুদিগকে সাহসী হইবার জন্য উপদেশ দিতেছিলেন এবং মুসলমানদের বুঝাইতেছিলেন যে, সত্য কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, অতএব হিন্দুকে স্বীয় ধর্ম অনুসরণ করিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে; অন্তত এটুকু উদারতা মুসলমান জনতার নিকটে প্রত্যাশা করা যায়। ইতিমধ্যে বিহার প্রদেশে দাঙ্গা বাধিয়া আবার শেষ হইয়াও গিয়াছিল। কিন্তু সেই দাঙ্গার ফলে অনুমান প্রায় সাত আট হাজার নরনারী প্রাণ হারাইয়াছিল। বিহার সম্পর্কে প্রথম সংবাদ পাইবার পরই গান্ধীজী আংশিকভাবে উপবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই সংবাদের ফলে বিহারের জনতার উত্তেজনা প্রশমিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরেও গান্ধীজী বরাবর পত্র এবং লোক মারফৎ দাঙ্গাবিধ্বস্ত মুসলমানদের পুনর্বসতির জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে নানাবিধ পরামর্শ এবং উপদেশ দিতে-ছিলেন। অর্থাৎ বিহারের কাজ কংগ্রেস-গভর্মেণ্টের সহায়তায় তিনি দূর হইতেই নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন; কিন্তু নোয়াখালিতে বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন মুসলমান জনতার মধ্যে দুরূহ কাজের দায়িত্ব তিনি নিজের উপরেই ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন।

এরূপ অবস্থার মধ্যে একদিন শ্রীরামপুরে লক্ষ্য করিলাম যে, গান্ধীজী পরশুরামের সহিত গভীর আলোচনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। পরশুরামের দৃঢ় ধারণা, গান্ধীজীর পক্ষে নোয়াখালি পরিত্যাগ করিয়া বিহারে মুসলমানদের সাহায্য করিবার জন্য যাওয়া উচিত। নয়তো নোয়াখালির মুসলমানের নিকট তিনি কোন্ মুখে দাঁড়াইয়া বলিবেন যে, তাহাদের পক্ষে হিন্দু প্রতিবেশীর প্রতি সুব্যবহার করা উচিত? আর গান্ধীজী তাহাকে ধীরভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে, বিহারের কাজ এখান হইতেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, কিন্তু নোয়াখালির গুরু দায়িত্ব তিনি

নিজে গ্রহণ না করিলে চলে না। পরশুরাম গান্ধীজীর যুক্তি কিছুতেই মানিতে পারিতেছিলেন না। প্রায় এক ঘণ্টার মত সময় তর্ক করিবার পরও গান্ধীজী তাহাকে স্বীয় মতে আনিতে পারিলেন না।

অথচ গান্ধীজীর নিকট এক ঘণ্টা সময়ের মূল্য কম নহে। অতিশয় গুরুতর প্রশ্নের বিষয়ে আলোচনা করিতে আসিলেও আমরা বহু ভদ্রলোককেই পনরো কুড়ি মিনিটের বেশি সময় দিতে পারিতাম না, তাহার মধ্যেই গান্ধীজী সেই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেন। কিন্তু পরশুরামের সহিত এভাবে সময় নষ্ট করিতে দেখিয়া আমি বিস্ময়প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পরে বলিলাম, তিনি তো পরশুরামকে সহজে বিরত হইতে বলিলেই পারিতেন। গান্ধীজী কিন্তু উত্তর দিলেন, না, আমি সময় কিছুই নষ্ট করি নাই। কারণ, পরশুরাম একজন সাধারণ সৎবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ। তাহাকে বিহার না যাওয়ার কারণ যদি বোঝানো না যায়, তাহা হইলে হয়তো আমার যুক্তির মধ্যেই কোথায় ত্রুটি আছে। যদি যুক্তি ঠিক হয়, তবে শুনিলেই তাহাতে অপরের বিশ্বাস জন্মানোর কথা। কিন্তু যখন তাহা সম্ভব হইল না, তখন পরশুরামের সহিত আলোচনা করিয়া আমি স্বীয় যুক্তির দুর্বলতা সন্ধান করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম।

গান্ধীজী সর্বদাই এই নীতি মানিয়া চলিতেন যে, আমরা সকলেই স্বীয় বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা অনুসারে কেবল খণ্ডসত্যকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হই। অতএব অপরের সমালোচনার ফলে হয়তো আমরা সত্যের পরিধিকে আরও বিস্তারিত করিতে সমর্থ হইব। প্রতিদিন তাঁহার নিকট যে সকল চিঠিপত্র আসিত, তিনি সেগুলি পড়িয়া যেমন দেশের জনমত এবং রাজনৈতিক আবহাওয়ার সম্বন্ধে পরিচয় পাইতেন, তেমনই নিজের মত বা পথের সত্যাসত্য যাচাই করিবার মত যথেষ্ট উপাদানও সংগ্রহ করিতেন। কোনও কোনও সমালোচনা নিন্দা বা কটূক্তির

পর্যায়ে নামিয়া আসিত। গান্ধীজীর সমর্থনে যে সকল চিঠি আসিত, তিনি সেগুলি পাঠ করিতেন ইহা সত্য, কিন্তু সমালোচনামূলক চিঠির উপরেই তাঁহার সমধিক ঝোঁক ছিল। সেগুলি পড়িয়া তিনি উচ্ছ্বাস বাদ দিয়া সার পদার্থ আবিষ্কার করিবার জন্য যত্নবান হইতেন। এবং সেরূপ কিছু অবিষ্কার করিতে পারিলে প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় সে বিষয়ে আলোচনা করিতেন, কখনও বা ইংরেজী এবং গুজরাতী 'হরিজন' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় সে সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতেন।

কলিকাতায় অনশন

শ্রীরামপুরের ঘটনার পর আরও প্রায় এক বৎসর পরের কথা। মুসলিম লীগ কর্তৃক ঘোষিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা ডিরেক্ট অ্যাকৃশনের দিন হইতে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িকতার যে তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছিল, অকস্মাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্তিদিবসকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার পরিবর্তে শহরের সর্বত্র অভাবনীয়ভাবে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাবের সূচনা দেখা গেল। ১৫ই হইতে ৩০এ পর্যন্ত শান্তিতে কাটিয়া গেল। কিন্তু ৩১এ আগস্ট পুনরায় শহরের মধ্যে দাঙ্গা অতি বিশ্রী আকারে আরম্ভ হইল। এই দাঙ্গার মধ্যে বিশেষত্ব ছিল যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেই এবারে প্রথম আঘাত বর্ষিত হয়।

শহরের কোথায় কি ঘটিতেছে সে বৃত্তান্ত শুনিবার পর মনে হইল যেন গান্ধীজী উপবাস করিতে পারেন। বস্তুত তিনি সমস্ত নগর-বাসীর মনে শুভবুদ্ধি ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমরণ অনশনের সম্পর্কে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং সেই বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য

তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং প্রদেশপাল শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীকে সংবাদ দিলেন। গান্ধীজী সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য অনশন সম্পর্কে একখানি বিবৃতি তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা উপরোক্ত সহকর্মীগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তিনি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রদেশপাল নানা ভাবে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি গান্ধীজীর নিকট ভিক্ষা জানাইয়া বলিলেন, গান্ধীজী দুই দিন অন্তত অনশন হইতে বিরত থাকিয়া দেখুন, কংগ্রেস এবং গভর্মেণ্ট সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া শহরে শান্তি ফিরাইয়া আনিতে পারে কি না! গান্ধীজী কিন্তু উত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুই দিনের জন্য তবে কি তাঁহার করিবার কিছু নাই? তিনি শুধু দর্শকের ভূমিকায় অপেক্ষা করিবেন? বস্তুত তাঁহার কর্তব্য হইল, প্রত্যেক নগরবাসীর নিকটে গিয়া বলা যে, আজ নবজাত ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মধ্যে সমান অধিকার ভোগ করিবে। উভয়েই যাহাতে রাষ্ট্রকে সমানভাবে নিজের বলিয়া মনে করে ও আনুগত্য পোষণ করে, তাহার জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে সেরূপ চেষ্টা সম্পূর্ণ পণ্ড হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতএব ভারতরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কলিকাতাবাসী প্রতি নরনারীকে সংযত হইতে হইবে। কলিকাতা শান্ত হইলে হয়তো পাঞ্জাবও শান্ত হইবে এবং ভারতে শান্তি ফিরিয়া আসিবে। আর যদি কলিকাতায় বহ্নি নির্বাপিত না হয়, তাহা হইলে সারা ভারতবর্ষে যে বহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে তাহার বিষয়ে চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইতে হয়। গান্ধীজী বলিলেন, কিন্তু আমার শরীরের বর্তমান অবস্থায় এরূপ পরিশ্রম আজ আর সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, কাল রাত্রে আমি উন্মত্ত জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়াও কিছু বুঝাইতে পারি নাই। এ অবস্থায়

যদি আমি অনশনের ব্রত গ্রহণ করি, তাহা হইলে সর্বসাধারণের চিত্তকে হয়তো স্পর্শ করিতে পারিব; এবং তখন তাহারা সৎপরামর্শ শুনিতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই আমি আমরণ অনশনের ব্রত গ্রহণ করিতে চাই।

গান্ধীজীর প্রস্তাবিত বিবৃতির মধ্যে লেখা ছিল—

> আমি নিজে মুখের কথা বলিয়াও যে কাজ করিতে পারি নাই, অনশনের ফলে হয়তো তাহা সম্ভব হইবে। যদি কলিকাতা শহরে যাহারা পরস্পরের সঙ্গে আজ যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের হৃদয়তন্ত্রীকে স্পর্শ করিতে পারি, তবে হয়তো পাঞ্জাবের উপরেও ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে। অতএব আমি রাত্রি ৮-১৫ হইতে উপবাস আরম্ভ করিতেছি। যখন কলিকাতাবাসীর মধ্যে উন্মত্ত ভাব কাটিয়া মনের সুস্থতা ফিরিয়া আসিবে, তখনই শুধু আমার উপবাসের সমাপ্তি ঘটিবে। যদি উপবাসকালে জলপান করিবার ইচ্ছা হয়, তবে আমি পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী সেই জলে লবণ, সোডি বাইকার্ব এবং টক লেবুর রস মিশাইয়া লইব।

> What my word in person cannot do my fast may. It may touch the hearts of all the warring elements even in the Punjab if it does in Calcutta. I therefore begin fasting from 8-15 P.M. to end only if and when sanity returns to Calcutta. I shall as usual permit myself to add salt and soda bicarb and sour limes to the water I may wish to drink during the fast.

রাজাজী বিবৃতির মধ্যে এই অংশটি পড়িয়া বলিলেন, যদি আমরণ অনশনই করিতে চান, তবে লবণ এবং সোডা মিশাইবার কারণ বুঝিতে পারি, কিন্তু লেবুর রস মিশাইবার হেতু তো বুঝিতে পারিতেছি না। গান্ধীজী তৎক্ষণাৎ 'and sour limes' শব্দ তিনটি পেন্সিল দিয়া কাটিয়া আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, দেখ, তুমি অল্প দিন হইতে

আমার সঙ্গে রহিয়াছ, কিন্তু রাজাজী বহুদিন হইতে আমাকে অন্তরঙ্গ ভাবে চেনেন। সেইজন্য যে মুহূর্তে আমার মধ্যে দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে, উহা তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। শরীরের প্রয়োজনে, কেবল উপবাসের সময়ে উপসর্গ নিবারণের জন্য লবণ এবং সোডাই যথেষ্ট এবং লেবুর রস অনাবশ্যক। আমার মনের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার সূক্ষ্ম বাসনার ফলেই অসতর্ক মুহূর্তে আমি লেবুর কথা যোগ করিয়া দিয়াছিলাম।

নিজের আচরণের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি অসত্য সে সম্বন্ধে এরূপ নিরলস দৃষ্টি আর কাহারও মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অবশ্য এরূপ সতর্কতা লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু প্রাত্যহিক আচরণের সম্পর্কে গান্ধীজীর মত এরূপ সজাগ দৃষ্টি ও সত্যের প্রতি নিষ্ঠা আর কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করি নাই।

অথচ এমন কথাও বলিব না যে, ইহা হইতে তাঁহার কখনও বিচ্যুতি ঘটিত না। সময়ে সময়ে সেরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ক্ষেত্র অল্পপরিসর এবং ঘটনাকালও সঙ্কীর্ণ। তাহার কারণও ছিল, অপরের প্রতি প্রেম কখনও কখনও তাঁহার দৃষ্টিকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করিয়া দিত। কিন্তু সেরূপ অবস্থার মধ্যেও কেহ সাহসভরে গান্ধীজীর ভুল দেখাইয়া দিলে তিনি তাহা বিবেচনা করিতেন এবং সমালোচনার মধ্যে যতটুকু সত্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিত, সেটুকু দ্রুত স্বীকার করিয়া লইতে ইতস্তত করিতেন না।

অর্থাৎ সত্যকেই তিনি জীবনে সর্বোত্তম আসনে বসাইয়াছিলেন বলিয়া সর্বদা যেমন স্বয়ং বিচার করিয়া চলিতেন, অপরের সমালোচনাকেও তেমনই যথাযোগ্য মর্যাদার আসন দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

স্বধর্ম

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে লবণ-আইন-অমান্যের আন্দোলন আরম্ভ হইলে ডাণ্ডি অভিযানের সময়ে গান্ধীজী সবরমতী আশ্রম হইতে নিজের পাট সম্পূর্ণ গুটাইয়া লন। কয়েক বৎসরের মধ্যে নানা ঘটনা ঘটিয়া যায়, এবং তিনিও ১৯৩৪ সালে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভ্য পদ হইতে ইস্তাফা দেন। যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তিনি বোম্বাই হইতে ফিরিয়া সাময়িকভাবে ওয়ার্ধা শহরের পূর্বপ্রান্তে মহিলাশ্রমের পাকা বাড়ির দোতলায় একটি ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময়ে আমার এক বন্ধু এবং আমি ওয়ার্ধা শহরে আসিয়া উপস্থিত হই।

সীমান্ত প্রদেশের খান অবদুল গফার খানের পুত্র অবদুল গনি খান কয়েক দিবস পূর্বেই সেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের বাসার নিকটে, শ্রীযমুনালাল বাজাজের অতিথিশালায় থাকিবার জন্য স্থান পাইলাম। অবদুল গনি খান বিলাত ও আমেরিকায় চিনির কারখানায় রাসায়নিকের বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া তখন চাকরির সন্ধান করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার আসল প্রতিভা শিল্প এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছিল। বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর গনি মিঞা কিছুদিন শান্তিনিকেতনে আচার্য নন্দলাল বসুর নিকটে শিক্ষালাভও করিয়াছিলেন।

আমরা দুই বন্ধু ওয়ার্ধায় পৌঁছিবার পর গনির সঙ্গে আশ্রমের ঘরোয়া ব্যাপার লইয়া আড্ডা জমাইয়া বসিলাম। শুধু ওয়ার্ধাতেই নয়, প্রায় সকল স্থানেই আশ্রমের জীবনে যেন কেমন একটা থম্‌থমে ভাব থাকে, প্রত্যেকে যেন সর্বক্ষণ অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্বের বোঝা বহন করিয়া চলিয়াছেন, কঠোর নিয়মানুশাসনের মধ্য দিয়া নিজেকে

পরিচালিত করিতেছেন, এবং কাহারও বাজে কথা বলিবার অথবা ভাবিবার সময় পর্যন্ত নাই। গনি মিঞা জনৈক আশ্রমবাসীর সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কেহ কেহ গান্ধীজীর চলাফেরা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সব কিছু নকল করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু গান্ধীজীর হাসি কেহ অনুকরণ করিতে পারে না। গনির কথা শুনিয়া মনে হইল, সত্যই তো, গান্ধীজীর মত জীবনের সরসতাকে কে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে? কঠোর তপশ্চারণের মধ্যেও তিনি কোন্ সময়ে মনের রাসকে আলগা দিতে হয় তাহা জানেন, এবং জানেন বলিয়াই অনাবিল হাস্যরসের বায়ুতে মনের মধ্যে ঘনায়মান মেঘভারকে উড়াইয়া দিয়া শরীর এবং মনের সুস্থতা অব্যাহত রাখিতে পারেন।

৯ই নভেম্বর ১৯৩৪ সাল বিকালবেলায় গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাদের ডাক পড়িল। মহিলাশ্রমে গিয়া আমরা যখন পৌঁছিলাম, তখন গান্ধীজীর খাবার সময় হইয়াছে; সেই সময়ে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা না থাকিলেও আমাদের তিনি আসিতে বলিয়াছিলেন। গান্ধীজীর ঘরে তিনি নিজে ভিন্ন খান অবদুল গফার খান, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার খান সাহেব, অবদুল গনি খান, অধ্যাপক কৃপালানি এবং শ্রীযুক্ত পিয়ারেলাল উপস্থিত ছিলেন। মহিলাশ্রমের কয়েকজন কর্মী, যমুনালালজীর কন্যা ও পরিবারের অপর কয়েক ব্যক্তিও মধ্যে মধ্যে যাওয়া-আসা করিতেছিলেন।

গান্ধীজী স্বয়ং কথা পাড়িলেন। তিনি খান সাহেবকে বলিলেন, গনি তো রহিয়াছে, এবার আপনার বক্তব্য শোনা যাক। খান সাহেব কিছুদিন হইতে গনির প্রতি ঠিক সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ অবশ্য গুরুতর কিছু নয়। তিনি সম্প্রতি পাঠানদের মধ্যে প্রচারকার্যের জন্য পোস্তু ভাষায় লিখিত এক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছিলেন। সীমান্ত

প্রদেশে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা খুবই কম। এদিকে গনি মিঞা শিক্ষার ফলে রাসায়নিক হইলেও পোস্তু ভাষায় একজন ভাল লেখক বলিয়া ইতিমধ্যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। গনি পত্রিকাটির ভার লইলে খান সাহেব নিশ্চিত হইতে পারিতেন, কিন্তু পুত্রের ইচ্ছা অন্যরূপ। পুত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঘোড়ায় চড়িয়া সৈনিক হইবেন, ইহা খান সাহেব প্রত্যাশা করেন না; কিন্তু পুত্রের যে প্রতিভা আছে, তাহা জনসেবার ব্যাপারে নিয়োজিত হউক, ইহা তো তিনি আশা করিতে পারেন।

গান্ধীজী ধীরভাবে সমস্ত কথা শুনিবার পর শান্তিনিকেতন হইতে আগত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালানিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নন্দলাল বসু মহাশয় গনির যোগ্যতা সম্পর্কে কি মত পোষণ করেন? কৃপালানি বলিলেন, নন্দবাবু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, গনির প্রতিভা আছে, কিন্তু ধৈর্য বা অধ্যবসায় কম। ইংরেজীতে তিনি আরও বলেন, গনি শিল্পদেবীর সহিত চপল ব্যবহার করেন, Ghani flirts with his art। গান্ধীজী হাসিয়া বলিলেন, দেখিও, যেন সে আর কাহারও সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার না করে, See that he does not flirt with anything else।

এই কথার ফলে, বর্তমান আলোচনার দ্বারা ঘরে যে গুমট ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কাটিয়া যেন সব হালকা হইয়া গেল। কৃপালানি আরও বলিতে লাগিলেন, নন্দবাবুর মত, মূর্তি গড়িবার বিষয়ে গনির প্রতিভা আছে, কিন্তু তিনি নিজে খোদাইয়ের কাজ জানেন না বলিয়া তাঁহার নিকটে গনির শিখিবার কিছু নাই। গান্ধীজী কিন্তু বলিলেন, না, মূর্তিগড়ার মূলে যে ছন্দ আছে নন্দলাল তাহা জানেন, অতএব গনিকে শান্তিনিকেতনে থাকিয়া সেই ছন্দ আয়ত্ত করিতে হইবে, Nandalal knows the poetry of sculpture।

অধ্যাপক কৃপালানির বক্তব্য শেষ হইলে গান্ধীজী গনির বক্তব্য শুনিতে চাহিলেন। গনি মিঞা স্পষ্টভাবে বলিলেন যে, দেশের কাজ তাঁহার ভাল লাগে না, তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শিল্পচর্চা করিতে চান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাহারও গলগ্রহ হইতে চান না বলিয়া, কোথাও চাকরি পাইলে ভাল হয়। তিনি সর্বপ্রথমে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিতে চান। গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তোমার শিল্পচর্চার কি হইবে? গনি উত্তরে বলিলেন, চিনির কারখানায় সারা বৎসর কাজ হয় না, অতএব যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাইবে। গান্ধীজী তাঁহার নিকটে প্রতিশ্রুতি চাহিলেন যে, ঐ সময়ে তিনি নন্দলালবাবুর নিকটে গিয়া থাকিবেন। এই শর্ত স্বীকার করিলে পর তিনি গনির জন্য কোনও চিনির কলে চাকরির চেষ্টা করিতে পারেন।

গনির সঙ্গে কথা শেষ হইলে গান্ধীজী অবদুল গফার খানকে বুঝাইতে লাগিলেন, ভগবান যখন গনিকে শিল্পে প্রতিভা দিয়া গড়িয়াছেন, তখন তাহার উপরে আমাদের কোনও অধিকার নাই। অপরের কর্তব্য হইল, সেই স্বাভাবিক বৃত্তির বিকাশে সহায়তা করা। যদি কোন দিন শিল্পীর মনে হয়, সে নিজের প্রতিভা জনসেবায় নিয়োজিত করিবে, তাহা হইলে সে দুয়ার তো সর্বদাই খোলা রহিয়াছে। এখন তাহার নিকট হইতে কিছু পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া অপর কাহারও আক্ষেপ করা উচিত নয়।

খান অবদুল গফার খান একান্ত বাধ্য সৈনিকের মত গান্ধীজীর নির্দেশ মানিয়া লইলেন। তাঁহার মুখে কোনও তর্ক বা অসন্তোষের ভাব ক্ষণেকের জন্যও প্রকাশ পাইল না। আমি এই কথা ভাবিতে লাগিলাম, গান্ধীজীর মত ব্যক্তি, যিনি সমগ্র জাতিকে ১৯২১ সালে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন, তিনি কি

গভীর সত্যনিষ্ঠার বশেই আজ অপরকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে না ডাকিয়া বরং তাহার স্বধর্মপালনের জন্য যথাযোগ্য আয়োজন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন!

সোদপুর এবং নোয়াখালি

১৯৪৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে গান্ধীজী আমাকে ডাকিয়া, গান্ধীবাদ সম্পর্কে আমার লেখার ত্রুটি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি। কিন্তু তিনি যেদিন প্রথম সোদপুরে আসিয়া পৌঁছান, অর্থাৎ ৩রা ডিসেম্বর ১৯৪৫, সেদিন যাহা বলিয়াছিলেন সে কথা স্বধর্ম বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে একবার উল্লেখ করিতেছি।

স্বর্গীয় দাদাভাই নওরোজীর পৌত্রী খুরসেদ নওরোজীর সহিত ঘটনাচক্রে আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া ফরাসী দেশে ইউরোপীয় সঙ্গীতের চর্চা করার পর দেশে ফিরিয়া বোম্বাই শহরে সঙ্গীত সাধনা লইয়া থাকিতেন। কিন্তু শিল্পের মধ্যে জীবনের সমগ্র রসোপলব্ধি না হওয়ায় গান্ধীজীর তত্ত্বাবধানে সমাজসেবার কাজে যোগ দেন। গান্ধীজী বাংলা দেশে শফরে আসিবার পূর্বে ওয়ার্ধা আশ্রমে খুরসেদবেন আমার বিষয়ে তাঁহার নিকটে পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই জন্য বোধ হয় সোদপুরে পৌঁছিবার অল্পক্ষণ পরে তিনি আমাকে ডাকিয়া প্রস্তাব করিলেন যেন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছাড়িয়া তাঁহার সহিত সেবাগ্রামে চলিয়া যাই। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সেখানে আমাকে কি কাজ দিবেন? ইহাতে তিনি হাসিয়া উত্তর দেন, পায়খানা পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া সকল রকম কাজের সুযোগই সেখানে পাওয়া যাইবে। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, আমার কাজ হইল লেখাপড়া। দেশের জন্য যতটুকু করিয়া থাকি, তাহা আপদ্ধর্ম

বিবেচনায় পালন করি। ইহার জন্য আমি তাঁহারই কাছে ঋণী। কিন্তু দেশের কাজের মধ্যেও ১৯৩২ সাল হইতে আমি প্রধানত তাঁহারই লেখা পড়িয়া, মতের সম্বন্ধে লিখিয়া, প্রচার করার দিকে মন দিয়াছি। এ কাজ সেবাগ্রামে সুবিধামত হইবে না। আশ্রমবাসীগণ মনে করিবেন, এ ব্যক্তি শুধু লেখাপড়া করে, অপর কিছু করে না। আমিও ভাবিব, ইহারা শুধু সূতা কাটে আর কিছু করে না। সেই জন্য আমি কলিকাতায় থাকিয়া, নিজের সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে লেখাপড়ার কাজ করিবার অনুমতি চাহিলাম।

যে পত্রখানি গান্ধীজীর সহিত মৌখিক আলাপের পর তাঁহাকে লিখি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

Bapuji,

I am grateful you have asked me to be with you and to be one of you. Khurshed Ben has grown fond of me, and perhaps placed my case in better light than it should.

Let me therefore place my own case before you. By profession and inclination, I am a scientist; and many years of my life have been spent in abstruse scientific research. That is my first love.

But beyond that, I recognise my social debts and social obligations. There, it is your writings which have opened up a new life for me. Ever since 1921, I have tried to do what little I can in the way of national service. But since 1932, I have specially taken up the task of reading all your writings very carefully, and explaining your teachings through books and articles in English and Bengali. This is in itself a fairly heavy task; and I devote all possible time to it, for it gives me happiness and joy.

But for this work, I require a kind of detachment which would not be possible in the midst of the heavy round of activities as at Wardha.

I would also pray that you will let me be, for the present, in Calcutta, so that the revised manuscript of *Studies in Gandhism* and *Selections from Gandhi* may be got ready by the time you leave Bengal.

*　　*　　*

With pranams,

Yours affectionately,
Nirmal

সেই রাত্রেই গান্ধীজী ইহার উত্তরে লিখিয়া জানাইলেন যে, আমার চিঠি তাঁহার ভাল লাগিয়াছে এবং আমি স্বাধীনভাবে নিজের পথ বাছিয়া লইতে পারি। কেবল তিনি বলিলেন যে, তাঁহার লেখার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে হইলে ওয়ার্ধায় আমার কিছুদিন থাকার দরকার আছে। পত্রের এক খণ্ড নকল সেই রাত্রেই আবার খুরসেদবেনের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল।

Sodepur
3-12-1945

Dear Nirmal Babu,

Your sweet letter. You will do exactly as you please.

In order to interpret my writings, you should be for some time in Wardha when it is fairly cool.

*　　*　　*

Yours
Bapu

ইহার কয়েকদিন পরেই গান্ধীজী মেদিনীপুর আসাম এবং মাদ্রাজ পরিভ্রমণের জন্য সোদপুর আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে গান্ধীজী যখন নোয়াখালিতে একা পরিভ্রমণের সংকল্প করিলেন, তখনকার একটি ব্যক্তিগত ঘটনায় আমি আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারি যে, আপন মতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও কি ভাবে তিনি অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত মতকেও

স্বীকার করিতে পারিতেন। গান্ধীজী নিজে একান্তভাবে স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া অপরের স্বধর্মের অভিব্যক্তিকে সম্যক্ মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

নোয়াখালি-পরিক্রমা শুরু হইবার অব্যবহিত পূর্বে ১৮-১১-১৯৪৬ তারিখে সোমবার মৌন দিবসে তিনি একখণ্ড কাগজে পেন্সিলে আমাকে লিখিয়া দিলেন যে, তাঁহার ইচ্ছা আমি তাঁহার সঙ্গে বাংলা দেশে সর্বদা সহচররূপে থাকি। অপর কোন সঙ্গী থাকিবে না, এবং আমাকেই তাঁহার দোভাষীর কাজ করিতে হইবে। যদি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে স্বীকৃত হই এবং অনাহার বা মৃত্যুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও মত করি, তাহা হইলে যেন তাঁহার সহিত বাহির হইয়া পড়ি। কি করিতে হইবে তাহা সতীশবাবুর (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত) নিকটে যেন আমি শুনিয়া লই।

> **I want you, if you can and will, to be with me wherever I go and stay while I am in Bengal. The idea is that I should be alone only with you as my companion and interpreter.**
>
> **This you should do only if you can sever your connection with the University and would care to risk death, starvation etc. Satis Babu knows all about my design. You will know from him.**

* * *

অল্পক্ষণ পরে আমি তাঁহাকে সংক্ষেপে জানাইয়া আসি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের প্রয়োজন নাই, কারণ বাংলা দেশে গান্ধীজীর সেবা করিবার জন্য অনুমতি বা ছুটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাওয়া যাইবে। অপর শর্তগুলির সম্পর্কে জানাইলাম, আমি নিজের শক্তি ও সাধ্যমত সেগুলি পূরণ করিবার চেষ্টা করিব; তাহার অধিক বলা সম্ভব নয়।

The University releases me for your service as long as you are in Bengal.

As for the rest, all I can say is that I shall try to fulfil your conditions ; more than that I can hardly say.

২০এ নভেম্বর ১৯৪৬ তারিখে, অর্থাৎ যেদিন তিনি একান্তে শ্রীরামপুর গ্রামে বাস করিবার জন্য যাত্রা করিবেন, সেই দিন প্রাতঃকালে অনেক চিন্তার পর তাঁহাকে কয়েকটি বিষয় জানানো প্রয়োজন বোধ করিলাম। অন্যথা আমার কর্তব্যের অবহেলা হইত।

গান্ধীজীর সঙ্গে একা থাকিতে হইলে আমার ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাঁহাকে জানানো বিশেষ প্রয়োজন। অতএব তাঁহাকে জানাইলাম যে, আমি কখনও জীবনে প্রার্থনা করি নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি জীবনে যে ভাবকে মর্যাদা দিয়া থাকি, যাহা মানি তাহার সুরে সুর মিলাইয়া চলিবার চেষ্টা করি। পথে বাধা আসিলে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু ইহাকে তো আর প্রার্থনা বলা চলে না।

গান্ধীজীর প্রাতঃকালীন বা সান্ধ্য প্রার্থনায় অবশ্য আমি কয়েকদিন যাবৎ যোগ দিতেছিলাম ; কিন্তু সমগ্র প্রার্থনার মধ্যে যে কয় মিনিট তিনি মৌন থাকিবার নির্দেশ দিতেন, সেই সময়টি আমার ভাল লাগিত। সমবেতভাবে প্রার্থনার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহা আমার হৃদয়কে কোথাও স্পর্শ করে নাই। কিন্তু যাঁহাদের ভাবের উদয় হইত, তাঁহাদের মনের অবস্থা দেখিয়া আমার ভাল লাগিত। তাঁহাদের সহিত অন্তর-লোকের তীর্থস্নানে আমি সহচর না হইলেও বাহিরের সঙ্গও সে সময়ের জন্য আমার নিকটে ভাল লাগিত।

অতএব গান্ধীজী যদি আমাকে শ্রীরামপুরে লইয়া যান, তবে প্রার্থনার সময়ে আনুষ্ঠানিক কাজ চালাইবার জন্য অপর কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে, আমার দ্বারা তাহা সম্ভব নয়।

Kazirkhil
20·11-1946

Bapu,

Now that you have asked me to be with you, it is necessary that I should place my limitations before you so that I may not cause you any disappointment in future.

Personally, I have never prayed. But in my private life, I frequently try to relate my day's little work to the things I hold dear in life. If anything comes in the way, I try to weed it out by conscious effort ; but that is hardly prayer on any account.

So when I try to join in the early morning and evening prayers, I enjoy the two minutes' silence and keep silent for the rest of the while. The community prayer has not so far touched my emotion ; but I sometimes like to keep company with my friends when they pray and feel great things in the depth of their soul. That companionship may be physical, but I like it all the same.

If I am therefore alone with you at Srirampur, some arrangement has to be made for the community prayer, for I would be useless for that purpose.

This I should place before you for full consideration.

Yours obediently,
Nirmal

চিঠিখানি পাঠ করার পর গান্ধীজী বলিলেন, ইহাব মধ্যে বাধার কিছু নাই। তোমার মত মানুষ ইহার পূর্বেও আমার সঙ্গে থাকিয়াছেন। সমবেত প্রার্থনার মধ্যে নানা মতের লোক তো থাকিবেই। পরে অবসর পাইলে এ বিষয়ে কথা হইবে। এখন সব ঠিকই আছে।

শ্রীরামপুর গ্রামে পৌঁছিবার পরই গান্ধীজী আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না? আমি বলিতে বাধ্য হইলাম যে, ঈশ্বর আছেন অথবা নাই—এ প্রশ্ন আমার

মনে কখনও সত্য সত্যই উদয় হয় নাই। আমি বৈজ্ঞানিক। সমাজ-বিজ্ঞানের বেলায় নিরীক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা তত্ত্বকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি; ইহার অতিরিক্ত অগ্রসর হওয়ার আগ্রহ আমার হয় না।

গান্ধীজী সে উত্তরে খুশি হইয়াছিলেন কি-না বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার নিকটে নোয়াখালি এবং বিহারে যতদিন পর্যন্ত ছিলাম, কোন দিন ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই, নিজে হইতে প্রার্থনায় কখনও যোগ দিতে বলেন নাই। অথচ সান্ধ্য সমবেত প্রার্থনার কথা বাদ দিলে, আমি মাত্র দুই-চার দিন ব্যতীত কখনও ভোরের প্রার্থনাতে যোগ দেওয়া কামাই করি নাই। যে কয়দিন বাদ পড়িয়াছিল, তাহাও বিশেষ বিশেষ কারণে ঘটিয়াছিল। বিছানায় শুইয়া শুইয়াই গান্ধীজী এক-আধদিন মনুকে হয়তো জিজ্ঞাসা করিতেন, কে কে ঘরে উপস্থিত আছে। সে নামের তালিকায় আমার নাম বাদ যাইত না; কিন্তু ইহা লইয়া কখনও পরে উল্লেখ পর্যন্ত করিতে শুনি নাই।

আমার ধর্ম স্বতন্ত্র, তাঁহার ধর্ম স্বতন্ত্র—এইরূপ একটা বোঝাপড়ার ভাব যেন উভয়ের মধ্যে হইয়া গিয়াছিল। শ্রীরামপুরে দশ দিন একত্র বাস করার পর তিনি আমার রাজনৈতিক জীবনের কাহিনী শুনিতে চাহিলেন। সব কথা শুনিবার পর ৩০-১১-১৯৪৬ তারিখে তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি আমার সম্বন্ধে লেখ, ইহার জন্য আমাকে দেখাও দরকার; শুধু আমার লেখা পড়িয়া যথাযথ ধারণা করিতে পারিবে না। কিন্তু তোমাকে ডাকার মধ্যে আমার কোনও স্বার্থবুদ্ধি আছে কি-না, তাহা পরীক্ষা কর। স্বার্থ দুই রকমের হয়। এক হইল নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন, আর দুই হইল—নিজের কাজের উন্নতির জন্য প্রয়োজন।

আমি কোনও স্বার্থের জন্যই অপরকে বাঁধিয়া রাখিতে চাই না। তুমি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকিলেও আমি কোন স্বার্থের প্রয়োজনেই তোমাকে আপন পথ পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বলিব না।

সত্যের ব্যাপ্তি

প্রত্যেক মানুষের স্বধর্মকে মর্যাদা দিবার প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কি আমরা যাহাকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা অপরকে বুঝাইতে পারিব না? সত্যের প্রসারের জন্য কোনও আয়োজন করিব না? প্রত্যেকে কি তবে নিজের খণ্ড সত্যটুকু লইয়াই সংসারে বিচরণ করিতে থাকিব? ১৯৩৪ সালে নভেম্বর মাসে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, আপনি যে সকল মতামত জ্ঞাপন করিলেন, সেগুলি আপনার ব্যক্তিগত মত। স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে আপনি এই সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা যেমন সীমাবদ্ধ, জ্ঞানও তেমনই। অপরাপর মানুষের ন্যায় আপনার সত্যের দৃষ্টিও আংশিক এবং অসম্পূর্ণ। অতএব আমরা নিজের উপলব্ধ সত্যটুকুকে খণ্ডসত্য জানিয়া যদি তাহা নিজের নিকটে আবদ্ধ রাখি, অর্থাৎ প্রচার না করি, তাহা হইলে কি ভাল হয় না? উত্তরে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, সত্যের প্রচারকে নিরোধ করিবার চেষ্টা করিলেও তুমি সফল হইবে না। আমাদের জীবন যদি অন্তরস্থিত সত্যের দ্বারা শাসিত হয়, তবে সেই জীবন হইতেই সত্য বিকীর্ণ হইবে। সত্য স্বভাবত ব্যাপ্তিশীল। সূর্য যেমন নিজের আলো লুকাইয়া রাখিতে পারে না, সত্যের আলোও তেমনই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

Q. Should we not confine our pursuit of truth to ourselves and not press it upon the world, because we know that it is ultimately limited in character?

A. You cannot so circumscribe truth even if you try. Every expression of truth has in it the seeds of propagation, even as the sun cannot hide its light.—*Studies in Gandhism*, p. 206.

যাহাদিগকে গান্ধীজী ভালবাসিতেন, তাহাদের মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিলে তাঁহার দুঃখ এবং আত্মগ্লানির সীমা থাকিত না। ১৯৩৮ সালে এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব। সে বৎসর উড়িষ্যায় পুরী হইতে আঠার মাইল দূরে ডেলাং নামক এক গ্রামে গান্ধী-সেবা-সঙ্ঘের বাৎসরিক অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঘটনাটির বিষয়ে ৺মহাদেব দেশাই ৯ই এপ্রিল ১৯৩৮ তারিখের ইংরেজী 'হরিজন' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন।

১৯৩৮ সালের ২৪এ মার্চ ডেলাং পৌছিবার পর গান্ধীজী প্রথম দিনের জনসভায় দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদিও পুরীধামে জগন্নাথমন্দিরে জাতিবিচার করা হয় না বলিয়া প্রকাশ ; তবু ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় যে, আজও সেখানে হরিজনেরা প্রবেশ করিতে পারে না। যতদিন সকলের সেই অধিকার না জন্মায় ততদিন জগন্নাথকে জগতের নাথ বলিয়া স্বীকার করিতে তিনি ইতস্তত করিবেন। হিন্দু-ধর্মের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে হইলে অস্পৃশ্যতা দূর করা একান্ত প্রয়োজন ; এই ব্রতে সকলে যেন তৎপর হয়।

ঘটনাচক্রে ২৯এ মার্চ তারিখে কস্তুরবা গান্ধী, মহাদেব দেশাইয়ের পত্নী এবং আরও কয়েকজন ডেলাং হইতে পুরীমন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। গান্ধীজী যখন সংবাদ পাইলেন যে কস্তুরবা এবং মহাদেব দেশাইয়ের পত্নী উভয়েই মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং মহাদেব দেশাই পূর্বাহ্নে তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলেন নাই যে, মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকার নাই, তখন তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। এরূপ অসাবধানতা তাঁহার নিকটে অমার্জনীয় অপরাধ। যাহারা তাঁহার

নিকটতম এবং অন্তরতম, তাহাদিগকেই যদি তিনি যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিতে না পারেন, তবে উহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

সে রাত্রে গান্ধীজীর রক্তের চাপ এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে সকলে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। পরদিবস মৌনব্রত গ্রহণ করিয়া অপেক্ষাকৃত শান্তিতে কাটাইয়া তবে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন।

অপরের পথচ্যুতির জন্য তিনি সর্বদা নিজেকেই অধিক দায়ী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহার মনে হইত, হয়তো সত্যচর্যার মধ্যে তাঁহার নিজেরই কোথাও দোষ ঘটিয়াছে। অতএব স্বীয় তপস্যায় তিনি আরও গভীরভাবে মগ্ন হইতেন, আরও অনলসভাবে, সাবধানতার সহিত প্রতি পদক্ষেপ পরীক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মন এবং শরীরের তপস্যা বা কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারাই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, উহার অপর কোনও পথ নাই। অধিকারীর নানাবিধ সংস্কারদোষ যত ধৌত হইয়া যায়, পরিচ্ছন্ন-মুকুর হইতে সূর্যের আলো যেমনভাবে প্রতিফলিত হয়, তাপসের শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর জীবন-মুকুর হইতেও তেমনই সত্যের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে থাকে।

অহিংসা

অনাসক্তি

১৯৪৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর। তখন আমরা নোয়াখালি জেলার শ্রীরামপুর গ্রামে অবস্থান করিতেছি। আমরা যে বাড়িতে ছিলাম, সেই বাড়ির জনৈক বৃদ্ধা শ্রীযুক্ত পরশুরামের সাহায্যে গান্ধীজীর জন্য সিদ্ধ তরকারি প্রভৃতি রান্নার ভার লইয়াছিলেন; তাহা ছাড়া আমাদের দুইজনেরও খাবার বন্দোবস্ত তিনিই করিতেন। যেদিনের কথা বলিতেছি, সেদিন গোরখপুর জেলার বিখ্যাত গীতা প্রেসের জনৈক কর্মী গান্ধীজীর সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত গান্ধীজীর অনেক দিন আগে হইতেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

ঠিক কি উপলক্ষে আমাদের খাওয়ার কথা উঠিল মনে নাই, গান্ধীজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি মাছ খাও? আমি বলিলাম, খাই, কিন্তু এখানে খাই না। গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, এ বাড়িতে কি মাছ রান্না হয় না? আমি বলিলাম, হয়। কিন্তু পরশুরাম এবং আমি একসঙ্গে রহিয়াছি, একসঙ্গে খাইতে বসি। তাহার মধ্যে যদি আমি শুধু মাছের জন্য অন্যত্র খাওয়ার ব্যবস্থা করি, তাহা হইলে ভদ্রতাতেও যে বাধে। গান্ধীজী আমার যুক্তি শুনিয়া বলিলেন, যেন আমি দুধ ও ফল অন্তত বেশি করিয়া খাই। সকল দিকেই তিনি দৃষ্টি রাখিতেন। বিশেষ করিয়া কর্মীদের খাওয়া থাকা বা শোওয়ার ব্যাপারে যাহাতে কোনও অসুবিধা না ঘটে, প্রত্যেকে যেন সাধ্যাতীত কাজ করিবার চেষ্টা না করে, বরং স্বীয় শক্তি অনুসারে দীর্ঘ দিন স্থির

ভাবে কাজ করিতে পারে, তাহার দিকে তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতেন এবং অপরকেও রাখিতে বলিতেন।

আমাদের কথোপকথন শুনিয়া গোরখপুরের বন্ধুও তাহাতে যোগ দিলেন। তিনি আপত্তির সুরে প্রশ্ন করিলেন, বাপুজী, মাছ খাওয়াতে তো হিংসা হয়? তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলিলেন, কেন? বাংলা দেশে মাছ খাওয়ার রীতি আছে এবং এখানে এত খাল বিল যে মানুষ স্বভাবত মাছ খাইয়া থাকে। গোরখপুরের বন্ধু বলিলেন, বাপুজী, কিন্তু ইহাতে তো জীবহত্যা হয়। গান্ধীজী উত্তরে বলিলেন, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দিয়া বহু লোককে হত্যা করার চেয়ে ইহাতে কম হিংসা হয়।

বস্তুত, গান্ধীজীর অহিংসা সম্পর্কে অনেকের অসম্পূর্ণ ধারণা আছে, এবং আমার মনেও হয়তো ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহার পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। অবশ্য 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় এবং নানা স্থানে গান্ধীজী এ কথা বলিয়াছিলেন যে, কাপুরুষের মত কিছু মানিয়া লওয়ার চেয়ে হিংসাত্মক বিদ্রোহও ভাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিতেন, হিংসারও নানা দোষ আছে এবং অহিংসার আচরণ সর্বদাই ভাল বলিয়া মানিতে হইবে, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু যদি কেহ অহিংস পন্থায় অন্যায়ের প্রতিকারে অসমর্থ হয়, তবে হিংসার পথ গ্রহণ করিলে সে কাপুরুষ হওয়া অপেক্ষা ভাল কাজ করিবে। এ সকল মত আমি পূর্বেই পড়িয়াছিলাম; এবং গান্ধীজীর যে অহিংসা সম্পর্কেও গোঁড়ামি নাই, ইহা অবগত ছিলাম। আমি ইহাও জানিতাম, হিংসার বিরুদ্ধে তাঁহার সর্বপ্রধান আপত্তির কারণ হইল হিংসার ফল কদাপি ভাল হয় না, বরং ইহার দ্বারা মানুষে মানুষে ভেদ আরও বাড়িয়া যায়। তবু, যে সকল বিভিন্ন ঘটনার ফলে গান্ধীজীর মনোভাব আমার নিকট স্পষ্টতর

হইয়াছিল, একে একে সেগুলি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব। একটির উল্লেখ তো বর্তমান অধ্যায়ের সূচনায় করিয়াছি। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, ঘটনার পূর্বাপর ঠিক না রাখিয়া বরং ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে তাহাদের ক্রম স্থির করিব।

১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে গান্ধীজী যখন বেলেঘাটাতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন কলিকাতা শহরে আর একবার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়া যায়। গান্ধীজী বেলেঘাটায় আসিবার পর বস্তির পলাতক কোন কোন দরিদ্র মুসলমান-পরিবার আবার পুরাতন বাসস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ১লা তারিখে যখন মধ্য কলিকাতা হইতে জোর দাঙ্গার সংবাদ আসিল তখন হিতৈষী বন্ধুগণ স্থির করিলেন, বস্তির মুসলমানদিগকে কয়েকদিনের জন্য আবার রাজাবাজারে মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। বেলেঘাটার কয়েকজন সহৃদয় হিন্দু অধিবাসী মোটর লরির বন্দোবস্ত করিয়া ইহাদের রওনা করিয়া দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পল্লীর অপর কয়েকজন যুবক গান্ধীজীর শিবিরের নিকটেই সেই লরির উপরে বোমা নিক্ষেপ করিলেন। ফলে দুইজন দরিদ্র মুসলমান যুবক তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল এবং কয়েকজন আহতও হইল। নিহত মুসলমান দুইজনের মধ্যে কালু নামে একজন যুবক ছিল; সে পাড়ায় রাজমিস্ত্রির কাজ করিত। তাহার মায়ের রক্তমাখা কোলের উপর হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া সে রাস্তার উপরে প্রাণত্যাগ করে। ঘটনার বৃত্তান্ত শোনামাত্র গান্ধীজী অকুস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখে কোনও ভাবের বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইল না; পাষাণমূর্তির মত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। কয়েক ঘণ্টা পরেই অবশ্য তিনি

কলিকাতাবাসীর হৃদয়ে শুভবুদ্ধি ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনশনব্রত গ্রহণ করিলেন।

ইতিমধ্যে বেলেঘাটার যুবকগণের মধ্যে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া বিচিত্র আকারে দেখা দিল। এক দল স্থির করিলেন, গান্ধীজীর রাজনৈতিক উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া যে অন্যায় করা হইয়াছে, তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বস্তিতে তখনও কিছু মুসলমান অবশিষ্ট ছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোকও ছিল এবং একটি পুকুরের পাশে স্যাঁৎসেতে ঘরে তক্তাপোশের উপরে একজন যক্ষ্মার রোগীও শুইয়া ছিল। যুবকের দল স্থির করিলেন যে, ইহাদিগকে আর যাইতে দেওয়া হইবে না, সারারাত পাহারা দিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। তাঁহাদের সহিত আমিও বস্তির মধ্যে প্রবেশের পথগুলি পরীক্ষা করিয়া আসিলাম। তাঁহারা জানাইলেন যে, রাত্রে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাঁহারা পাহারা দিবেন; যদি কেহ আক্রমণ করে তবে স্টেনগান চালাইতেও তাঁহারা ইতস্তত করিবেন না। তাঁহাদের কেবল এই অনুরোধ ছিল, রাত্রে পুলিস যদি কাহারও নিকটে লাইসেন্স-বিহীন অস্ত্র পায়, তাহা হইলে যেন ধরিয়া হাজতে না পোরে। গান্ধীজীর নিকটে তাঁহারা এই বিষয়ে আশ্বাস চান।

এই অত্যন্ত দুরূহ প্রার্থনার দৌত্য লইয়া আমি গান্ধীজীর সকাশে উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি ঘরের বাহিরে, বাগানের মধ্যে রাস্তার উপরে সান্ধ্যভ্রমণ করিতেছিলেন। আমি সকল কথাই তাঁহার নিকটে খুলিয়া বলিলাম। তিনি শুনিয়া যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম এই। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, সে সময়ে লীগ-মন্ত্রীদলের পরিবর্তে কংগ্রেসী মন্ত্রীদল বাংলা দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। গান্ধীজী মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, মন্ত্রীগণ যদি দরিদ্র মুসলমান প্রজার প্রাণ রক্ষা করিতে

না পারেন, এবং যুবকেরা যদি তাহার জন্য চেষ্টা করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা সমর্থনের যোগ্য হইবেন।

যে দৃঢ়তার সহিত গান্ধীজী উপরোক্ত কথা বলিলেন তাহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। অবশ্য গান্ধীজীর মন্তব্য যুবকগণের নিকটে সেদিন প্রকাশ করি নাই। বরং পুলিস কর্তৃপক্ষ যাহাতে অস্ত্রধারী সৈনিক দিয়া বস্তিবাসীকে রক্ষা করেন, তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কেবল জনৈক উর্ধ্বতন পুলিস কর্মচারীর নিকটে ব্যক্তিগতভাবে বলিয়া রাখিয়াছিলাম, সে রাত্রে আততায়ী ভিন্ন অপর কাহারও নিকটে অস্ত্র পাইলে যেন তাহাকে গ্রেপ্তার করা না হয়। ঘটনাচক্রে অবশ্য সেরূপ কিছু করিবার প্রয়োজন সেদিন হয় নাই।

ভয়শূন্যতা

বেলেঘাটায় সদ্যোমৃত মানবদেহের পাশে দাঁড়াইয়া গান্ধীজীর যে অবিচল মূর্তি দেখিয়াছিলাম তাহা অন্যত্র অবলোকন করিবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছিল; সে বিষয়ে যথাকালে বলিব। কিন্তু এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর অপর একটি কাহিনী না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যেদিন প্রথম গান্ধীজী বেলেঘাটায় বসবাস করিবার জন্য আসিলেন, সেদিন গাড়ি পৌঁছিবার অব্যবহিত পরে কয়েকজন যুবক গান্ধীজীর ঘরের জানালার কিছু কাচ ঢিল মারিয়া ভাঙিয়া দেন। ৩১এ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ঐরূপ আরও একটি ঘটনা ঘটে। এক বৃহৎ জনতা ঘরে ঢুকিয়া চেয়ার টেবিল ছবি এবং গৃহস্বামীর কাচের বাসনপত্র চুরমার করিয়া ফেলে। গান্ধীজী রাত্রে সেই শব্দ শুনিয়া পাশের ঘর হইতে দালানের দরজায় আসিয়া হাত জোড় করিয়া জনতাকে শান্ত হইবার জন্য মিনতি জানান। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। অবশেষে

কয়েকজন পুলিস কর্মচারী এবং সহকর্মীদের প্রার্থনায় তিনি নিজের ঘরে ফিরিয়া গেলেন। পরের দিন সকালে গান্ধীজীর সহিত বিগত রাত্রের ঘটনার বিষয়ে যখন আলোচনা করিতেছিলাম তখন তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, জনতা মোটের উপরে সংযত ব্যবহারই করিয়াছে। যে কারণে তাহারা গান্ধীজীর উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, সে কারণে তাঁহাকে গুরুতর আঘাত করে নাই, ইহাই বরং আশ্চর্যের বিষয়।

বস্তুত, শারীরিক বিপদকে লঘুভাবে গ্রহণ করার অভ্যাস গান্ধীজীর পুরা মাত্রায় ছিল। জনতা যতই উচ্ছৃঙ্খল হউক না কেন, তিনি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে ইতস্তত করিতেন না। চীৎকারের মাত্রা অসহ্য বোধ হইলে দুই কানে আঙুল দিয়া চাপিয়া ধরিতেন। একদিন বলিলেন, কানে তুলা দিয়াও দেখিয়াছি। কিন্তু সকলের চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়, আঙুলের চাপ দিয়া।

হিংসার প্রকাশ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজীর যেমন একটা উদাসীনতা ছিল, জনতার প্রতি, পৃথিবীর ধূলামাটির প্রতি তেমনই একটি নিবিড় প্রেমের ভাবও বর্তমান ছিল। আশ্রমে তিনি জনৈক কুষ্ঠরোগীকে নানা কাজের মধ্যেও স্বহস্তে সেবা করিতেন। শরীর সম্পর্কে ভয় যেমন তাঁহার অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়াছিল, মাটির উপাদানে রচিত মানুষের প্রতি প্রেমও তেমনই গাঢ় ছিল। একবার পাটনা হইতে দ্রুত দিল্লী যাইবার প্রয়োজন হয়। ট্রেনে গেলে পথে প্রতি ইষ্টিশানে হট্টগোল হইবে, রাত্রে চীৎকারের ফলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিবে, এই সকল কারণে একজন এরোপ্লেনে দিল্লী যাওয়ার বিষয় প্রস্তাব করিলেন। গান্ধীজী বলিলেন, ওই বৃহৎ মাছের মত বস্তুর পেটে তিনি ঢুকিতে পারিবেন না। আমাদের কিন্তু মনে হইত, এই মাটি ছাড়িয়াই যেন তিনি যাইতে চান না।

বস্তুত মাটির প্রতি, মানুষের প্রতি, তাঁহার ভালবাসা ও বিশ্বাসের অন্ত ছিল না। ইহার চরম প্রকাশ নোয়াখালি দাঙ্গার পরে বিশেষভাবে দেখা গিয়াছিল।

১৯৪২ সালে জানুয়ারি ১৫-১৬ তারিখে গান্ধীজী কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে যে বক্তৃতা দেন সে সময়ে তিনি বলেন, মৌলানা আমাকে আকাশের সমান উঁচুতে তুলিয়া ধরায় আমি অত্যন্ত বিব্রত অনুভব করিতেছি। আমি আকাশবিহারী নহি। আমার জন্ম এই মাটির পৃথিবীতে এবং আমি মাটির তৈয়ারি মানুষ। আমি কখনও এরোপ্লেন দেখি নাই। আমি আপনাদেরই মত একজন, সকলের দেহ যে উপাদানে গঠিত, আমি সেই ধূলিরই তৈয়ারি নশ্বর মানুষ। যদি তাহা সত্য না হইত তবে আমরা গত কুড়ি বৎসর ধরিয়া একযোগে কাজ করিতে পারিতাম না। অহিংসা আমার নিকট ধর্ম, আমার প্রাণস্বরূপ। হয়তো এক-আধজনের নিকটে প্রসঙ্গক্রমে আমি অহিংসাকে ধর্মস্বরূপ গ্রহণ করিবার কথা বলিয়া থাকিব, কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে আমি অহিংসা ধর্মস্বরূপ গ্রহণ করিবার কথা কখনও বলি নাই। রাজনৈতিক জীবনে সিদ্ধি লাভের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিবার জন্যই আমি কংগ্রেসের নিকট ইহা উপস্থাপিত করিয়াছি; এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যই ইহা ব্যবহার করিতে বলিয়াছি। হয়তো এরূপ উপায়ের মধ্যে অভিনবত্ব থাকিতে পারে; কিন্তু অভিনব বলিয়াই ইহার রাজনৈতিক দিকটা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

I was not a little perturbed when the Maulana raised me sky-high. I do not live up in the air. I am of the earth, earthy. I have never seen an aeroplane. I am like you, an ordinary mortal made of common clay....Had that not been the case, we

should not have been able to work together these twenty years Ahimsa with me is a creed, the breath of my life. But it is never as a creed that I placed it before India, or for the matter of that before anyone except in casual informal talks. I placed it before the Congress as a political method, to be employed for the solution of political questions. It may be it is a novel method, but it does not on that account lose its political character.—*Congress Bulletin*, Feb. 5, 1942, p. 16.

নোয়াখালিতে বীরের অহিংস-সাধনা

নানা কারণে ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, গান্ধীজী পাকিস্তানের প্রবলতম শত্রু; হিন্দুমাত্রেই তাহাদের শত্রু। নোয়াখালিতে যখন হিন্দুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত বর্ষিত হইল, এবং সেই আঘাতের তাড়নায় বহু হিন্দু ধর্মান্তরিত হইয়া গেল, গান্ধীজী সেই মুহূর্তে স্থির করিলেন তাঁহার স্থান আর দিল্লীতে নয়, তাঁহাকে নোয়াখালি যাইতে হইবে। কলিকাতায় পৌছানোর পর তিনি তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী শহীদ সুহরাবর্দি সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন। গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতে নোয়াখালির ব্যাপারে অনেক গাফিলতি প্রকাশ পাইল। গান্ধীজী কিন্তু গভর্মেণ্টের ভ্রম সংশোধন অপেক্ষা নোয়াখালির গ্রামে নিজের কর্তব্যের সন্ধানে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

প্রথম বারো-চোদ্দ দিন তিনি হিন্দু ও মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও জেলার কর্তৃপক্ষের সাহায্যে বিভিন্ন গ্রামে গিয়া প্রকৃত তথ্য আহরণ করিতে লাগিলেন। লুঠতরাজ, গৃহদাহ, নরহত্যা, নারীধর্ষণ সবই যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিয়াছিল। কিন্তু বিশ্লেষণের ফলে গান্ধীজী স্থির করিলেন, ধর্মান্তরকরণকেই বাধা দিতে হইবে, কারণ তাহাই মূল রোগ। অতএব তিনি সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গভর্মেণ্ট অবশ্য স্বীয় শক্তি প্রয়োগ

করিয়া গৃহদাহ বা নরহত্যা বন্ধ করিতে পারেন, কিন্তু যে ধর্মান্ধতার বশে মুসলিম জনতা হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করিয়াছিল বা যে ভয়ের বশে হিন্দু বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহা শাসনের দ্বারা দূর করা গভর্মেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়।

গান্ধীজী চারিদিকে ঘন অন্ধকার অনুভব করিতে লাগিলেন। ভোরের আলো ফুটিবার পূর্বে রাত্রির অন্ধকার যেমন গাঢ়তম হয়, হয়তো এ অন্ধকারও তেমনই ছিল। কিন্তু গান্ধীজী কোথাও আলোর রেখার আভাসও দেখিতে পান নাই। তাহা সত্ত্বেও একদিন প্রার্থনা-সভায় তিনি বলিলেন, আমি হৃদয়ের মধ্যে আশার অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়া অগ্রসর হইতেছি।

যে আলোর প্রত্যাশা তিনি করিতেছিলেন, তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। গান্ধীজী জানিতেন যে, প্রতি সমাজের মধ্যেই যেমন একদিকে স্বার্থবুদ্ধি, সঙ্কীর্ণতা ও নিষ্ঠুরতা আছে, তেমনই অপর দিকে প্রেম এবং উদারতাও বর্তমান থাকে। কিন্তু সমাজে বা ব্যক্তির অন্তরে সু এবং কু-এর দ্বন্দ্বে সচরাচর সু-এর মাত্রা অধিক হইলেও তাহার শক্তি কম হয়। কু পরিমাণে কম হইলেও সহজে প্রবল আকার ধারণ করে। সু এবং কু-এর মধ্যে সু-এর মাত্রা যদি বেশি না হইত, তবে মানবসমাজ আজ টিকিয়া থাকিতে পারিত না, জীর্ণ অট্টালিকার মত ধূলিসাৎ হইয়া যাইত। কিন্তু কু পরিমাণে অল্প হইলেও শুধু প্রাবল্যের দ্বারা সু-কে পরাস্ত করে। অতএব সমাজে কু-কে পরাস্ত করিতে হইলে সু-কে সক্রিয় এবং শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

নোয়াখালিতে দাঙ্গার সময়েও মুসলমান সমাজের মধ্যে সু-এর পরিচয় ক্ষেত্রবিশেষে পাওয়া গিয়াছিল। গান্ধীজীর উপস্থিতির ফলে তাহা আরও দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে সমাজের বিরুদ্ধ-

শক্তিও যেন কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধের জন্ম আয়োজন করিতে লাগিল। গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় মুসলমানের সংখ্যা উত্তরোত্তর ক্ষীণ হইতে লাগিল। উপরন্তু লীগ গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতে নোয়াখালির ঘটনাকে জগতের সামনে অত্যন্ত লঘু বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্ম সুচিন্তিত প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল। হিন্দু অধিবাসীগণ বিরুদ্ধ আবহাওয়ার সন্ধান পাইয়া, এবং গান্ধীজীর উপস্থিতির প্রসাদে যাতায়াত আরও সহজ হওয়ার সুযোগ লইয়া, অধিক সংখ্যায় দেশত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল।

গান্ধীজী দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। যে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান গ্রামবাসী প্রার্থনা-সভায় আসিত, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, মুসলমানেরা যেন অন্তত তাঁহার বক্তব্য শোনে। কিন্তু বিশেষ কোনও সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা গেল না। তখন গান্ধীজী অহিংসার পথে, অর্থাৎ প্রেম এবং বিশ্বাসের পথে আরও এক ধাপ অগ্রসর হইলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, একান্ত নিরালম্ব অবস্থায় পায়ে হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাত্রা করিবেন। সম্ভব হইলে মুসলমান গৃহস্থদের বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করিবেন; এবং তাহাদের পরীক্ষা করিবার সুযোগ দিবেন যে, তিনি সত্যই শত্রু, অথবা মিত্র।

কিন্তু গান্ধীজী স্পষ্টভাবেই বলিলেন যে, মুসলমান গ্রামবাসীর হৃদয়ের নিকট আবেদনের মধ্যে কোনও খোশামোদের ভাব নাই। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শ্রীরামপুর ত্যাগ করিবার পর চণ্ডীপুর চাঙ্গিরগাঁও হইতে যখন তিনি পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন, তখন প্রথমে প্রস্তাব হইয়াছিল যে, যাত্রাকালে একটি ছোট দল খোল-করতাল লইয়া সঙ্গে সঙ্গে নাম-সংকীর্তন করিতে করিতে যাইবে। কিন্তু গান্ধীজীর তাহাতে সম্মতি ছিল না। তিনি প্রার্থনা-সভায় কীর্তনের

পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ঘটা করিয়া পরিক্রমার পথে কীর্তন করার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। যে মুসলমান গ্রামবাসীরা অল্পদিন পূর্বে বলপূর্বক হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করিয়াছিল, তাহাদের গ্রামের মধ্য দিয়া অনাবশ্যকভাবে কীর্তন লইয়া যাওয়াকে তিনি আতিশয্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কিন্তু ৭ই জানুয়ারি ১৯৪৭ তারিখে মাসিমপুরের প্রার্থনা-সভা হইতে রামনাম-কীর্তনের সময়ে অনেক মুসলমান সভা ত্যাগ করিয়া গেল। প্রার্থনার শেষে বক্তৃতাকালে গান্ধীজী ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, পাকিস্তানে খোদা ভিন্ন অপর নামে ভগবানের উপাসনা বা নামকীর্তন বরদাস্ত করা হইবে না, ইহা তিনি ভাবিতেও পারেন না। লীগের নেতৃবৃন্দ বরং ধর্মের স্বাধীনতাই প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সেই দিন প্রাতঃকালেই তিনি উৎসাহী বন্ধুদিগকে যাত্রাকালে কীর্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, পাছে মুসলমান গ্রামবাসীর মনে অকারণে আঘাত লাগে। কিন্তু বর্তমান ঘটনার অর্থ যদি ইহাই হয় যে, রামনাম পরিহার না করিলে মুসলমানগণ তাঁহার সেবা গ্রহণ করিবে না, তাহা হইলে সে শর্ত অস্বীকার করা ছাড়া তাঁহার গতি নাই। যেখানে কোনও নীতিকে বিসর্জন দিবার দাবি করা হয়, সেক্ষেত্রে সংগ্রাম ভিন্ন উপায় নাই। ১৯৩০ সালে এই কারণেই লবণ-আইন উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল।

নোয়াখালির হিন্দু অধিবাসীগণকেও তিনি উপদেশ দিলেন, তাহারাও যেন মুসলমান প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে দম্ভ প্রকাশ করিবার জন্য রামনাম কীর্তন না করে; প্রতি দিবসের সেবাব্রতের দ্বারা অজ্ঞ এবং বিরুদ্ধ-মনোভাবাপন্ন প্রতিবেশীর অন্তরকে জয় করিবার চেষ্টা করে; এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের নাম কীর্তনের দ্বারা যেন সেই সেবাব্রত সন্দীপিত হয়।

সেই সময় হইতে প্রার্থনা ভিন্ন যাত্রাকালেও খোল-করতাল লইয়া কীর্তনের ব্যবস্থা প্রচলিত হইল।

অর্থাৎ গান্ধীজী মুসলমান জনতার মনে অবিশ্বাসের রুদ্ধ দুয়ারকে বিশ্বাসের আঘাতের দ্বারা খুলিবার জন্য পণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে বিরুদ্ধ পক্ষকে তোষামোদ করার ভাব লেশমাত্র ছিল না। বরং যে ধর্মমতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সর্বত্রই উচিত, সেই 'সত্য'কে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংগ্রামের মনোভাবের অভাব গান্ধীজীর মনের মধ্যে ছিল না। কেবল প্রভেদ এই, সে সংগ্রামের মধ্যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আঘাত হানিবার কোন প্রশ্নই ছিল না, বরং স্বীয় সত্যকে আশ্রয় করিয়া বীরের মত পদক্ষেপে, যদি তাহারা আঘাত হানে তবে সে আঘাত সহিয়াও পথ হইতে বিচ্যুত না হইবার দৃঢ় সঙ্কল্প বর্তমান ছিল; এবং আঘাতকারীকে ভুলিয়াও শত্রু না ভাবিবার সঙ্কল্প ছিল। এইরূপে বীরের অহিংসার দ্বারা গান্ধীজী নোয়াখালিতে 'সত্য'কে প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিলেন।

গান্ধীজীর পরিক্রমায় তিনি সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য গ্রামের শিল্প, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে যে-সকল উপদেশ ও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, এ সকলের ফলে নোয়াখালির মুসলমান সমাজে কতদূর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল জানি না। হয়তো তাহা যাচাই করিবার সময় আজও আসে নাই; এখনও সম্পূর্ণ মানবসেবার ভাব লইয়া দৃঢ়ভাবে যাঁহারা সেখানে গান্ধীজীর পথে কাজ করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের সেবার মূল্য যাচাই করিবার সময় ভবিষ্যতে আসিবে। কিন্তু গান্ধীজীর বীর্যে-ভরা অহিংসার প্রভাবে মানুষের মন যে টলিতে পারে, সু সক্রিয় হইয়া কু-কে পরাভূত করিতে পারে, তাহা ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায়

প্রত্যক্ষ করা গিয়াছিল। সে সময় গান্ধীজীর অনশনের ফলে ক্রোধোন্মত্ত হিন্দু জনতা স্বীয় অস্ত্র সংবরণ করিয়াছিল। তাহার পূর্ব হইতেই গান্ধীজী বারংবার কলিকাতাবাসী এবং সমগ্র ভারতবাসীকে এই উপদেশ দিতেছিলেন যে, আমরা ধর্মনিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক নাগরিককে সমান অধিকার দিব। মুসলমান ভারতবাসীর প্রতি আচরণে যেন আমাদের এই নিরপেক্ষতা প্রকাশ পায়, তবেই তাহারা এই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিবে, তাহারাও তখন ভয়ের বশে নয়, আনন্দচিত্তে 'জয়হিন্দ' উচ্চারণ করিবে। কলিকাতার কোন কোন অধিবাসী যখন সেই উপদেশ বিস্মৃত হইয়াছিল, তখন অবশিষ্ট হিন্দুর সুবুদ্ধিকে সক্রিয় করিয়া কু-কে প্রশমিত করিবার শক্তি জাগ্রত করিবার জন্য গান্ধীজী অনশনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিন দিন অনশনের পর শুধু হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দই যে কর্তব্যে তৎপর হইয়া উঠিলেন তাহা নয়, যাহারা উত্তেজনার বশে মুসলমানের বিরুদ্ধে আঘাত বর্ষণ করিয়াছিল, তাহারাও লজ্জিত হইয়া অনেক অস্ত্র সমর্পণ করিয়া গেল। দাঙ্গা সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল, ইহা বোধ হয় উল্লেখ না করিলেও চলে।

দণ্ডশক্তি প্রয়োগের দ্বারা হিংসার বর্তমান প্রকাশকে পরাস্ত করা সম্ভব এবং গভর্মেণ্ট সেই ভাবেই সচরাচর শান্তি স্থাপনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা দ্বারা সমাজের শুভশক্তি জাগ্রত হয় না। কেবল উচ্ছৃঙ্খল জনতার অশুভশক্তি গভর্মেণ্টের অশুভশক্তির নিকট পরাস্ত হয় মাত্র। রাজার পক্ষে হত্যা করিবার ক্ষমতা সদুদ্দেশ্যে প্রয়োজিত হইলেই যে তাহা নির্দোষ হইয়া যায়, ইহা গান্ধীজী কোনদিন স্বীকার করেন নাই। তাহার কারণ, স্বীয় অভিজ্ঞতা এবং পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, হিংসা

বা দণ্ডের আশু-ফল যতই চমকপ্রদ হউক না কেন, ইহার দ্বারা কোনও স্থায়ী কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়। গান্ধীজীর চরিত্র বুঝিতে হইলে তাঁহার এই বিশ্বাসের মূল কোথায়, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করা দরকার।

অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়

গান্ধীজী মনে করিতেন, আজ জগতের যে কোন দেশের রাষ্ট্র যেরূপ হেলায় ব্যক্তির জীবনকে শাসিত করে, ব্যক্তির চরিত্রে নিহিত জড়তা এবং ভয়ই তাহার মূল কারণ। তিনি চিরদিনই ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যে অবস্থিত জড়তা বা তামসিক গুণকে স্থায়ী কল্যাণের বিরোধী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। অতএব নোয়াখালিতে দণ্ডের দ্বারা শান্তিস্থাপনকে তিনি স্থায়ী কল্যাণের আধার বলিয়া মনে করেন নাই। এবং কল্যাণকে স্থায়ী করিবার জন্য মুসলমান-হৃদয়ের মধ্যে পরের মত সম্বন্ধে যে অসহিষ্ণুতা অতি কদর্য আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা পরাস্ত করার জন্য বীরের অহিংসার আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সেবার দ্বারা এবং বিশ্বাসের আঘাতে প্রতিপক্ষের অন্তরে যে সু জড়তার আবরণে আবৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহার উপরের আবরণ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে এবং সু আত্মপ্রকাশ করিবে। এইরূপে ব্যক্তি যখন সত্যাগ্রহীর বীর্য, প্রেম ও দৃঢ়তার আঘাতে শুদ্ধতর হইবে, তখন সেই শোধিত ব্যক্তিত্বের ভিত্তির উপরে ভবিষ্যতের কল্যাণময় সমাজ গঠন করা সম্ভব হইবে। সর্বমানবের কল্যাণের অপর কোনও পথ নাই বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এবং নিজের অন্তরে সেই শক্তি কতখানি অর্জিত হইয়াছে, ইহারই অগ্নিপরীক্ষা করিবার জন্য তিনি নোয়াখালির পথে অনিকেতনব্রত অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলেন।

অথচ গান্ধীজী নিজের অহিংসাকে কত অসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহা একদিনকার ইতিহাস হইতে আমি বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় আগে হইতে ষড়যন্ত্র করার ফলে মুসলমান জনতা কোথাও হিন্দু অধিবাসীগণের নিকট বাধা পায় নাই বলা চলে। যেটুকু বাধা ক্ষেত্রবিশেষে পাইয়াছিল, তাহাও জনতার ধ্বংসশক্তির তুলনায় পুষ্করিণীর নিকট গোষ্পদের অপেক্ষা বেশি হইবে না। ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে, বাংলার প্রাচীন বিপ্লবী কর্মীগণের মধ্যে কেহ কেহ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অতর্কিত এবং বিক্ষিপ্ত আক্রমণের দ্বারা মুসলমান সমাজকে বিপর্যস্ত করিতে হইবে। এই সময়ে প্রবীণ বিপ্লবপন্থী কয়েকজন নেতা, গান্ধীজীর পথে কোনও অন্তরায় সৃষ্টি করিবেন না বলিয়া একদিন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং পরামর্শ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গান্ধীজী অগ্নিযুগের সেই কর্মীবৃন্দের নিকট একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি আপনাদের বিষয়ে শুনিয়াছি, আপনারা মৃত্যুর ভয়কে অতিক্রম করিয়াছেন। আপনাদের সাহসের মূলে প্রথমাবস্থায় অস্ত্রের প্রয়োজন থাকিলেও আজ আপনারা এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন যে, অস্ত্র না থাকিলেও আপনারা হেলায় মৃত্যুকে বরণ করিতে পারেন। দেশের সাধারণ লোককে তো অস্ত্রে সজ্জিত করা সম্ভব নয়; আর চেষ্টা করিলেও গভর্মেণ্ট বাধা দিবে। এরূপ অবস্থায় আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এমন কয়জন ব্যক্তি আছে, যাহারা অস্ত্রের অপেক্ষা কোনদিন না রাখিয়া আপনাদের বীরত্বের স্পর্শে মৃত্যুর ভয়কে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে? বন্ধুগণ উত্তর দিলেন, সেরূপ সাহস অস্ত্রহীন জনসমূহের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে তাঁহারা সমর্থ হন নাই।

গান্ধীজী তখন নিজের সম্পর্কে বলিতে লাগিলেন, তিনি গীতায় বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা হইতে এখনও দূরে রহিয়াছেন, তিনি এখনও অহিংসায় পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। বস্তুত আমি তাঁহার লেখায় অন্যত্র পাঠ করিয়াছি যে, জীবনে যখন মৃত্যু তাঁহার সন্নিকট বলিয়া মনে হইয়াছে, তখন মৃত্যুকে তিনি অভিসারিকার মত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, জীবনের প্রতি আসক্তি অথবা মৃত্যুর প্রতি বিরাগ তাঁহার অন্তরে অবশিষ্ট রহিয়াছে। যাহাই হউক, বিপ্লবী বন্ধুগণকে তিনি আরও বলিতে লাগিলেন, তাঁহার অহিংসা 'টুটী ফুটী' অর্থাৎ ভাঙাচোরা হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের নানা স্থানে নিতান্ত সাধারণ মানুষও স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময়ে কি পরম ভয়শূন্যতার পরিচয়ই না দিয়াছে! সে ক্ষেত্রে বিপ্লবী বন্ধুদের হিংসাশ্রিত অক্ষত বীর্যও অপরের মনে অস্ত্রহীন অবস্থায় সম্যক বীর্য জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই; এইখানেই অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

গান্ধীজীর সম্পর্কে মনে পড়ে, গোখলে এক সময়ে লিখিয়াছিলেন যে, সাধারণ মানুষকে বীর ও শস্ত্রযোধীর অবস্থায় পরিণত করিবার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা গান্ধীজীর মধ্যে আছে।

> **He has in him the marvellous spiritual power to turn ordinary men around him into heroes and martyrs.**

অথচ গান্ধীজীর আচরণ আমাদের দৃষ্টিতে ভয়লেশশূন্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি কেন নিজেকে দুর্বল বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহা তাঁহারই ভাষায় প্রকাশ করিতেছি।

> **হৃদয় হইতে মৃত্যুভয় এবং অপর সকল ভয় দূর করিবার জন্য আমি সতর্কভাবে অবিচ্ছিন্ন চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও**

এমন ঘটনা ঘটিয়াছে, যখন মৃত্যুর সম্ভাবনাকে আমি আনন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে পারি নাই, পরম সুহৃদের মত মৃত্যুকে সাদরে আবাহন করিতে পারি নাই। মানুষ শক্তির জন্য সাধনা করা সত্ত্বেও এইরূপে দুর্বল থাকিয়া যায়; যে জ্ঞান শুধু আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, হৃদয়কে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না, জীবনের সন্ধিক্ষণে সেরূপ জ্ঞানের দ্বারা কোনও লাভ হয় না।

I have deliberately made a supreme attempt to cast out from my heart all fear whatsoever including the fear of death. Still I remember occasions in my life when I have not rejoiced at the thought of approaching death as one might rejoice at the prospect of meeting a long lost friend. Thus man often remains weak notwithstanding all his efforts to be strong, and knowledge which stops at the head and does not penetrate into the heart is of but little use in the critical times of living experience.—*Satyagraha in South Africa*, p. 286.

মৃত্যুকে পরম সুহৃদের মত সকল অবস্থায় গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি মনে করিতেন, রাগ এবং দ্বেষের দ্বৈত শৃঙ্খল হইতে তাঁহার মুক্তি ঘটে নাই। অর্থাৎ বিচারের দ্বারা ইহাই তিনি জানিতে পারিলেন যে, মনের গভীর স্তরে জীবনের প্রতি অনুরাগ এবং মৃত্যুর প্রতি দ্বেষ তাঁহার রহিয়া গিয়াছে।

এই বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার আকাঙ্ক্ষার যেন তাঁহার শেষ ছিল না। মৃত্যুর সুযোগ পাইলেই যেন তিনি সামনে ছুটিয়া যাইতেন; মৃত্যুর ভয়কে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিতে পারিয়াছেন—নিজের অন্তরে এই আশ্বাস লাভের জন্য যেন তাঁহার মধ্যে একটা উন্মাদ আগ্রহ আসিয়া দেখা দিত। প্রেম নাই, সেখানে প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; পথে মৃত্যুর ঘনায়মান ছায়া অবতরণ করিতে পারে, ইহার সম্ভাবনা অনুভব করা মাত্র তিনি নিজের দেহকে, মনের অবশিষ্ট রাগদ্বেষকে আহুতি দিবার জন্য ছুটিয়া চলিতেন।

প্রেম এবং আত্মাহুতি, অহিংসা এবং তপশ্চর্যা তাঁহার নিকটে সমানার্থবোধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বস্তুত ইহা তাঁহার নিকটে দেহ এবং মনের সর্বোত্তম ক্রীড়া বা লীলার স্থান অধিকার করিয়াছিল।

১৯৩৯ সালে রাজকোট-সত্যাগ্রহের সময়ে প্রতিপক্ষ শ্রীবীরাওয়ালা সম্পর্কে গান্ধীজী সত্যাগ্রহীগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—

তিনি অহিংসা যে অর্থে ব্যবহার করেন সে অর্থ স্বীকার করিলে সত্যাগ্রহীগণের পক্ষে দরবার শ্রীবীরাওয়ালাকে না তাড়াইয়া বরং চেষ্টা করা উচিত, কিভাবে তাঁহার হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটানো যায়। বীরাওয়ালার মধ্যে যে-সকল ক্ষেত্রে সু-এর প্রকাশ পাওয়া যায়, সেগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেগুলির বৃদ্ধিসাধন করিতে হইবে। হিংসার প্রবলতম প্রকাশকে বশীভূত করার অনন্ত শক্তি অহিংসার মধ্যে নিহিত আছে—এ বিশ্বাস সত্যাগ্রহীগণকে অর্জন করিতে হইবে। **সত্যকার অহিংসা দ্রুতপদক্ষেপে হিংসার মুখবিবরে প্রবেশ করে।**

সত্যাগ্রহীদের কর্তব্য, দরবার শ্রীবীরাওয়ালার প্রতি ভয় বা অবিশ্বাস পরিহার করা। যাহা আপাতত অসম্ভব, অহিংসা সেরূপ কার্যসিদ্ধি করিতে পারে না, এই অবিশ্বাসের ভাবও তাহাদিগকে মন হইতে অপসারিত করিতে হইবে।

I told them that if they accepted my explanation of ahimsa they would have to set their heart not on getting rid of Darbar Shri Virawala, but on converting him. This they could do only if they would set about finding his good points and working at them. They must develop infinite faith in the capacity of ahimsa to neutralise every person of himsa. *True ahimsa lay in running into the mouth of himsa.*

They must, therefore, shed their fear of Darbar Shri Virawala and their disbelief in the power of ahimsa to achieve the seemingly impossible.—*Harijan*, 29-4-39, p. 104.

দিনচর্যা

নিয়মিত জীবন

নোয়াখালি যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে বিহারে দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। তাহারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ১৯৪৬ সালে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সোদপুরে থাকিবার সময়েই গান্ধীজী খাওয়ার পরিমাণ বিশেষভাবে কমাইয়া দিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, যদি বিহার শান্ত না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে উপবাস আরম্ভ করিতে হইবে। নোয়াখালি পৌঁছিবার পর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট হইতে সংবাদ আসিল, বিহারের অবস্থা শান্ত হইয়াছে এবং আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে, অতএব গান্ধীজী যেন তাঁহাদের ক্ষমা করিয়া স্বাভাবিক আহার গ্রহণ করেন। পণ্ডিত জওহরলালের নিকট হইতেও অনুরূপ সংবাদ আসিল। তৎপরে গান্ধীজী অল্পে অল্পে নিজের আহারের মাত্রা বাড়াইয়া স্বাভাবিক পরিমাণে ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু নানা কারণে আহারের মাত্রার ইতরবিশেষ ঘটিলেও গান্ধীজীর দৈনন্দিন খাইবার সময়ের ব্যতিক্রম ঘটিত না। সকল বিষয়েই তিনি অত্যন্ত নিয়মিতভাবে চলার অভ্যাস করিয়াছিলেন। এমন কি রেলে বা ইস্টিমারে যাতায়াতের মধ্যেও তিনি যথাসম্ভব দিনচর্যা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেন। নোয়াখালিতে তাঁহার দিনচর্যা যেভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা এবার পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

শয্যাত্যাগ

ভোরে উঠা তাঁহার বরাবরের অভ্যাস ছিল। কিন্তু ঋতু অনুসারে অথবা কাজের চাপে কখনও কখনও তিনি ঘুমের পরিমাণ কমাইয়া দিতেন। শ্রীরামপুরে থাকার সময়ে তিনি তদানীন্তন বেঙ্গল টাইম পাঁচটা, অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম চারটার সময়ে উঠিতেন। বালিশের নীচে একটি টেঁকঘড়ি থাকিত, ঐটুকু ঘড়ির মধ্যেও অ্যালার্মের ঘণ্টা বাজিত। কিন্তু অভ্যাসের বশে প্রায়ই তিনি ঘণ্টা বাজিবার পূর্বে উঠিতেন এবং হয়তো উঠার কয়েক মিনিট পরে শোনা যাইত, ঘড়ি বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যে বিছানায় গান্ধীজী শুইতেন তাহার পাশে দুইটি বেঞ্চিতে কাগজপত্র, লিখিবার সরঞ্জাম ইত্যাদি সাজানো থাকিত, এবং পাশে একটি নীচু জলচৌকির উপরে দুইটি বোতলে জল ও দাঁতন রাখিয়া দেওয়া হইত। দাঁতনের এক দিক শক্ত কোন জিনিস দিয়া ঠুকিয়া আমরা নরম কুঁচিতে পরিণত করিয়া রাখিতাম। উলটা দিকে কিছুদূর পর্যন্ত আধাআধি চিরিয়া রাখা হইত, যেন দাঁতনের পর উহা পুরাপুরি চিরিয়া জিবছোলার মত ব্যবহার করিতে পারেন। একটি মোটা মুখওয়ালা তালমিছরির শিশিতে অর্ধেক জল ভরিয়া দাঁতনটি রাত্রে শুইবার সময়ে ডুবাইয়া রাখা হইত। জল কম-বেশি হওয়ায় গান্ধীজী একদিন নিজেই জল ঢালিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন, ঠিক কতটুকু পর্যন্ত রাখার প্রয়োজন। পাশে একটি ছোট শিশিতে মিহি কাঠকয়লার গুড়ার সঙ্গে নুন মিশাইয়া মাজন তৈয়ারি করিয়া রাখা হইত। আর একটি বড় বোতলে মুখ ধুইবার জল এবং পাশে বহুদিন হইতে ব্যবহৃত একটি পরিষ্কার লোহার গামলা থাকিত। নিকটে প্রস্রাবের বোতল

এবং বড় পাত্রও থাকিত। বিছানার পাশে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া পলিতা খুব কমাইয়া রাখা হইত।

গান্ধীজী এক সময়ে প্লুরিসি রোগে ভুগিয়াছিলেন; সেই হইতে বরাবর তাঁহার সর্দির ধাত ছিল। অল্প ঠাণ্ডা লাগিলে, বিশেষত বাংলা দেশের সেঁতসেতে হাওয়ার ফলে তাঁহার অল্পেই সর্দি লাগিয়া যাইত। সেইজন্য ভোরবেলা উঠিলেও তিনি বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইতেন না।

ঘুম ভাঙার পরে মশারির বাহিরে হাত বাড়াইয়া খাটের নীচে রাখা প্রস্রাবের বোতল গ্রহণ করিতেন এবং তাহার পরেই দাঁতন আরম্ভ করিতেন। কোলের উপরে লোহার গামলাটি থাকিত। বেশ ভাল ভাবে মাজনের সাহায্যে দাঁতন করিবার পর, গান্ধীজী মুখ ধুইয়া ফেলিতেন। ব্যবহারের প্রত্যেক জিনিসটি প্রত্যহ ঠিক একই জায়গায় রাখিবার জন্য তিনি নির্দেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, এগুলি যদি ঠিক জায়গায় না থাকে, অভ্যাসবশে যন্ত্রের মত যদি এই সকল কাজ না চলে এবং প্রতিদিন সকল জিনিস আমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া লইতে হয়, তবে অকারণে খানিক সময় নষ্ট হয়। এসব কাজের জন্য যেন ভাবিবার প্রয়োজন না হয়। গান্ধীজীর দাঁত একটিও ছিল না, তিনি মাড়ির উপরেই দাঁতন করিতেন; ভিতরে ও বাহিরে পরিষ্কার করিয়া দাঁতনের পর মুখ ধুইয়া ফেলিলে আমরা লোহার গামলা সরাইয়া লইতাম। তখন প্রার্থনার আয়োজন হইত।

শ্রীরামপুরে গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথমে শ্রীযুক্ত পরশুরাম এবং আমি থাকিতাম; তখন প্রার্থনার অনুষ্ঠান পরশুরাম করিতেন। এক মাস পরে যখন মনু গান্ধী উপস্থিত হইলেন, তখন হইতে প্রার্থনার ভার তাঁহার উপরে দেওয়া হইল। কোন কোন রাত্রে সুশীলা নায়ার বা

অপর কোনও পুরাতন সহকর্মী উপস্থিত থাকিলে ভোরে প্রার্থনার সময়ে গীতাপাঠ ইত্যাদি তাঁহারাই করিতেন।

ভোরের প্রার্থনা

প্রার্থনার প্রথম অংশে গান্ধীজী বিছানার মধ্যে বসিয়া থাকিতেন। প্রার্থনা আরম্ভ হইবার সময়ে লণ্ঠনের আলো খুব কমাইয়া, হয়তো বা একখানি খাতা দিয়া আড়াল করিয়া দেওয়া হইত। গান্ধীজী বিছানার মধ্যে এবং আমরা বাহিরে মেঝেতে মাদুর বা কম্বল পাতিয়া অন্ধকারে বসিয়া থাকিতাম। সর্বপ্রথমে গান্ধীজী ইঙ্গিত করিয়া বলিতেন, নম্যো। তিনি ইহা এইরূপে উচ্চারণ করিতেন, নম্-ইয়ো। মন্ত্র নির্দেশ পাইয়া গভীর কণ্ঠে তিনবার ধীরে ধীরে বিলম্বিত তালে নিম্নলিখিত জাপানী বৌদ্ধ মন্ত্রটি উচ্চারণ করিতেন :

নম্যো হো রেঙ্গে ক্যো

যাঁহারা বুদ্ধত্ব (জ্ঞানের আলো) পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার।

এই মন্ত্রের আবৃত্তি শেষ হইলে গান্ধীজী বলিতেন, দো মিনিটকী শান্তি। তখন দুই মিনিটকাল আমরা নিস্তব্ধ হইয়া আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। গান্ধীজীর জপের জন্য একটি তুলসীর মালা ছিল। পুরানোটি কেহ চাওয়ায় তাহাকে দিয়া দেন, তখন আবার ছোট রুদ্রাক্ষের মত বীজের একটি মালা বাজার হইতে কিনিয়া আনা হয়। তাহাতে ১০৮ দানা ছিল ; কিন্তু সে ব্যাপার পাটনা যাত্রার সময়ে ঘটে, নোয়াখালিতে তিনি পূর্বের জপমালাটিই ব্যবহার করিতেন। দুই মিনিট মৌনের সময়ে গান্ধীজীর হাতে মালা থাকিত। তিনি সে সময়ে কোন্ মন্ত্র জপ করিতেন, তাহা বলিতে পারি না। দুই মিনিটকাল অতিবাহিত

হইলে পর তিনি নির্দেশ দিতেন, প্রার্থনা। তখন মনু ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক পাঠ করিতেন।—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্॥

এই জগতে যাহা কিছু, তাহা ঈশ্বরের নিবাসযোগ্য। অতএব সকলই তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া ভোগ করিও, কাহারও ধনে লোভ করিও না।

তাহার পর নিয়মানুক্রমে অন্যান্য শ্লোক পাঠ হইত। যাঁহারা প্রার্থনার সমগ্র অনুষ্ঠানটি জানিতে চান, তাঁহারা খাদিপ্রতিষ্ঠান, সোদপুর হইতে প্রকাশিত 'আশ্রম ভজনাবলী' নামে একখানি পুস্তিকায় উহার সম্পূর্ণ বিবরণ পাইবেন। যে সকল শ্লোক ভোরের সময়ে পড়া হইত তাহার মধ্যে একটি আমার বিশেষভাবে ভাল লাগিত।—

ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥

আমি রাজ্য বা স্বর্গ অথবা অপুনর্ভব বা মোক্ষ চাই না। দুঃখতপ্ত প্রাণীদের দুঃখের নাশ হউক, ইহাই আমি কামনা করি।

এই সময়ে একটি গানও গাওয়া হইত। সচরাচর মনুই গাহিতেন; কিন্তু তিনি বাংলা গান বেশি জানিতেন না বলিয়া আমাদের শিবিরে যে সকল সাংবাদিক বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ প্রার্থনায় উপস্থিত থাকিলে রবীন্দ্রনাথের কোনও গান গাওয়া হইত। একদিন গান্ধীজী স্বয়ং একখানি ইংরেজী কবিতা ওই সময়ে পাঠ করিয়াছিলেন। সেটির প্রথম লাইন,—**Oh Lord ! Our help in ages past.**

গান শেষ হইলে কিছুক্ষণ রামধুন অর্থাৎ নাম-সংকীর্তন হইত। কোনদিন হয়তো 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম',

কোনদিন বা 'নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে, নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে' এইরূপ কোনও কীর্তন সহজ সুরে সমবেতভাবে উচ্চারণ করা হইত। গান্ধীজী মৌন অবস্থায় চাদর মুড়ি দিয়া বসিয়া থাকিতেন, কিন্তু রামধুনের সময়ে গায়ের চাদরের ভিতর হইতে আমরা শব্দ শুনিতে পাইতাম, তিনি তালে তালে তালি দিতেছেন।

রামধুন কীর্তনের পরে প্রত্যহ গীতাপাঠের নিয়ম ছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে একবার সমগ্র গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পড়িয়া শেষ করা হইত। যে দিন যে যে অধ্যায় পড়া হইত, তাহার তালিকা দিতেছি। শুক্রবারে ১ম ও ২য় অধ্যায়; শনিবার ৩য়, ৪র্থ, ৫ম অধ্যায়; রবিবাব ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম অধ্যায়; সোমবার ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ অধ্যায়; মঙ্গলবার ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ অধ্যায়; বুধবার ১৬শ, ১৭শ অধ্যায়; বৃহস্পতিবার ১৮শ অধ্যায়। গীতাপাঠের সময়ে গান্ধীজী বিছানায় শুইয়া পড়িতেন এবং মন দিয়া সব শুনিতেন। পাঠে ভুল হইলে সঙ্গে সঙ্গে ভুল সংশোধন করিয়া দিতেন; কোনও শব্দ অসাবধানতাবশত ছাড়িয়া গেলে তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। বিশুদ্ধ উচ্চারণের দিকে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। একদিনকার ঘটনায় ইহা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।

সেদিন ২২এ নভেম্বর ১৯৪৬ সাল। আগাখান প্রাসাদে বন্দিনী অবস্থায় ২২এ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ সালে কস্তুরবা গান্ধীর দেহান্ত ঘটিয়াছিল। সেই অবধি প্রতি ইংরেজী মাসের ২২ তারিখে ভোরবেলার প্রার্থনায় গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় একসঙ্গে পড়া হইত। শুনিয়াছি, ডাক্তার সুশীলা নায়ার এই রীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। যেদিনের ঘটনা বলিতেছি, সেদিন গান্ধীজী অপরাপর দিনের চেয়ে বোধ হয় এক ঘণ্টা আগে উঠিলেন, কেননা সমগ্র গীতা পাঠ করিতে

অনেক সময় লাগিবার কথা। অন্যান্য দিনের মত প্রার্থনা চলিতে লাগিল, কিন্তু গীতাপাঠের ভার একজনের উপরে না দিয়া আমরা কয়েকজনে তাহা ভাগ করিয়া লইলাম। শ্রীরামপুর গ্রামের জনৈক অধিবাসী প্রার্থনায় যোগ দিয়াছিলেন; তাঁহার উপরে ১১শ অধ্যায় পাঠ করিবার পালা পড়িল। সাধারণ বাঙালী যে ভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ করিয়া থাকে, তিনি সেই ভাবে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত দ্রুত পাঠের ফলে আমাদের কানেও সমস্ত শব্দগুলি যথাযথভাবে ধরা পড়িল না। বন্ধুটির পাঠ শেষ হইলে পরবর্তী অধ্যায় আবার অপরকে পড়িতে দেওয়া হইল।

প্রার্থনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী উঠিয়া বসিতেন। তখন আমরা মশারি খুলিয়া বিছানার উপর জলচৌকি বসাইয়া লণ্ঠনের আলোয় তাঁহার লেখার ব্যবস্থা করিয়া দিতাম। কিন্তু সেদিন মশারি সরাইবার সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কে গীতাপাঠ করিয়াছিলেন? সকলের নাম শুনিয়া তিনি একাদশ অধ্যায়ের পাঠক বন্ধুটিকে কতকগুলি কথা বলিলেন। বলার সময়ে তাঁহার ভঙ্গিতে কোনও উত্তেজনার লক্ষণ ছিল না বটে, কিন্তু যে শব্দ তিনি উচ্চারণ করিলেন, তাহার মধ্যেই গভীর আবেগের পরিচয় পাওয়া গেল। গান্ধীজী ইংরেজীতে বলিলেন,

> আমি মৃতজনের স্মৃতিকে এরূপ পাঠের দ্বারা অপমানিত হইতে দিব না। এখানে যাহা ঘটিতেছে, বিদেহী আত্মা তাহা জানিতে পারেন কিনা আমি জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়, এরূপ পাঠের দ্বারা বিদেহী আত্মার কোন কল্যাণ হয়তো হয়। অন্তত আমাদের আত্মার তো হয়।
>
> সংস্কৃত ভাষা কঠিন, সেইজন্য আমি সঠিক উচ্চারণ আয়ত্ত

করিবার জন্ত উপযুক্ত পরিশ্রম করিয়াছি। কাশী বা শ্রীরঙ্গমের পণ্ডিতগণ যথাযথভাবে গীতাপাঠ করেন ; আমি তাঁহাদের মত পারি বলিয়া দাবি করি না। কিন্তু আপনাকে পুনরায় এরূপ কোন দিবসে গীতাপাঠ করিতে দিবার পূর্বে আমার ইচ্ছা, আপনি গীতার উচ্চারণ এবং অর্থ যথাযথভাবে আয়ত্ত করেন। আজ যেরূপ পাঠ হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা মৌন থাকা অনেক ভাল ছিল।

কখনও কোনও কাজ ঢিলাভাবে করিবেন না। তাহাতে অপরে প্রতারিত হইবে না, আপনি নিজেকেই প্রতারিত করিবেন।

I will not allow you to insult the memory of the dead by such reading. I do not know if the departed soul knows what is happening here. I don't know, but I believe in some way it may be of some good to the soul. At least it is good for our soul.

Sanskrit is difficult, therefore I have taken sufficient pains to learn the correct pronunciation. Pandits in Kashi and Shrirangam read it correctly and I do not pretend to read it as well as they do. But you must learn both the meaning as well as the correct pronunciation before I permit you to read the Gita any more on a similar occasion. I would far rather that we should keep silent than do it in the present fashion.

Never slur over a thing. You never deceive anyone else except yourself.

এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরে উদ্ধৃত ইংরেজী অংশটুকু আমার নিজের ডায়েরি হইতে তুলিয়া দিলাম। কেবল সর্বপ্রথম বাক্যটি উহাতে লেখা ছিল না; আমার মনে ছিল। বড় কঠিন তিরস্কার বলিয়াই হয়তো ডায়েরিতে লিখি নাই, গান্ধীজীর মুখে মানায় না বলিয়াই ইতস্তত করিয়া ডায়েরিতে টুকিয়া রাখি নাই। কিন্তু গান্ধীজীকে সংশোধন করিয়া প্রকাশিত করিবার অধিকার আমাদের

কাহারও নাই বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। সেইজন্য স্মৃতিপট হইতে প্রথম বাক্যটি লিখিয়া দিলাম।

যেদিনকার ঘটনা উল্লিখিত হইল, তাহার পর-দিবস অর্থাৎ ২৩এ নভেম্বর ১৯৪৬ তারিখ শনিবার ছিল বলিয়া গান্ধীজী ৩য় হইতে ৫ম অধ্যায় পর্যন্ত নিজেই পাঠ করিলেন, আমরা তাঁহার উপদেশ মত সামনে গীতা খুলিয়া শুনিতে লাগিলাম। গান্ধীজীর উচ্চারণ শুদ্ধ ছিল, তিনি নিজে দ্রুত পাঠ করিতেন না, এবং পড়ার সময়ে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন অর্থাৎ শুধু মন্ত্রপাঠের মত আবৃত্তি করিতেছেন না, ইহা বুঝা যাইত। গান্ধীজীর নিজের পাঠ ঐ একবারই শুনিয়াছি। অপরাপর সময়ে সুশীলা নায়ার, সুশীলা পাই প্রভৃতি অনেকেরই গীতাপাঠ শুনিয়াছি। মনু ১৯এ ডিসেম্বর ১৯৪৬ তারিখে শ্রীরামপুর গ্রামে আসার পর হইতে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে গীতা পাঠ করিতেন। ইঁহাদের সকলের উচ্চারণই শুদ্ধ এবং নির্দোষ ছিল। কিন্তু পাঠ এত দ্রুত হইত যে, আমাদের মত শ্রোতার মনে অর্থাগম হইবার পূর্বেই দ্রুত শ্লোক-পাঠের রথ ছুটিয়া যাইত, আমরা পিছনে পড়িয়া থাকিতাম।

প্রার্থনার সহিত সংশ্লিষ্ট দুইটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ভোরের প্রার্থনায় আমরা শ্রীরামপুরে চার-পাঁচজনের বেশি সচরাচর থাকিতাম না। সেখানে যে সঙ্গীত হইত, তাহা বাংলাতেই হইত এবং এজন্য আমরা প্রধানত রবীন্দ্রনাথের রচনার উপরেই নির্ভর করিতাম। এক-আধদিন ঘটনাচক্রে, যেমন যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিবসে, কোনও ইংরেজী সঙ্গীত হয়তো বা কবিতার মত পাঠ করিয়া লওয়া হইত। কিন্তু একদিন দৈবাৎ সাংবাদিক বন্ধুগণের মধ্যে একজন প্রার্থনায় যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি মীরাবাঈয়ের রচিত একখানি হিন্দী ভজন আমাদিগকে শুনাইলেন।

প্রার্থনার শেষে সকলে চলিয়া যাওয়ার পর গান্ধীজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে হিন্দী ভজন আজ গাওয়া হইল, তাহা কি আমরা কেহ গাহিতে বলিয়াছিলাম? আমি বলিলাম, সাংবাদিক বন্ধু আপনার গানটি ভাল লাগিবে ভাবিয়া উহা গাহিয়াছেন। গান্ধীজী তখন বলিলেন, তিনি বাঙালী হইতে চান, এবং মনে প্রাণেই তাহা চান। সেইজন্য একান্তে প্রার্থনা হইলেও যেন বাংলা দেশে কেবল বাংলা গানই গাওয়া হয়। উহা শুধু ভজন হিসাবে নয়, প্রতিদিনের প্রথম বাংলা পাঠ হিসাবেও তিনি শুনিতে চান। রবীন্দ্রনাথের গান তিনি শুনিতে ভালবাসিতেন এবং মোটামুটি বুঝিতেও পারিতেন। মাঝে মাঝে কোনও শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিলে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন।

আর একদিনের ঘটনা। তখন আমরা শ্রীরামপুর গ্রাম ছাড়িয়া চণ্ডীপুর নামক গ্রামে তিন-চার দিন অতিবাহিত করিয়াছি। ৭ই জানুয়ারি ১৯৪৭ সাল। সেই দিন হইতে গান্ধীজী প্রতিদিবস এক গ্রাম হইতে নূতন এক গ্রামে যাত্রা আরম্ভ করিবেন। আমরা সকাল সাড়ে সাতটায় মাসিমপুর নামক এক গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিব; কিন্তু তখনও ভোরের অন্ধকার বেশ ঘন হইয়া রহিয়াছে। গান্ধীজী সেদিন প্রার্থনার সময়ে তাঁহার প্রিয় গুজরাটী গান 'বৈষ্ণব জন তো তেনে কহীএ' গাহিতে বলিলেন। এবং ইহাও নির্দেশ দিলেন যেন 'বৈষ্ণব' শব্দের পরিবর্তে 'ঈশাই' 'মুসলিম' প্রভৃতি শব্দও এক-একবার ব্যবহার করা হয়। মনু গান গাহিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ মশারির ভিতর হইতে ভারি গলায়, অনভ্যস্ত হইলেও মোটামুটি সাদাসিধা কিন্তু শুদ্ধ সুরে গান্ধীজীর গানের শব্দ বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। আমরা সকলে নীরবে আশ্চর্য হইয়া সেই গান শুনিতে লাগিলাম।

বৈষ্ণব জন তো তেনে কহীএ জে পীড় পরাঈ জানে রে।
পর দুঃখে উপকার করে তোয়ে, মন অভিমান ন আনে রে॥
সকল লোকমাঁ সহুনে বন্দে, নিন্দা ন করে কেনী রে।
বাচ কাছ মন নিশ্চল রাখে, ধন ধন জননী তেনী রে॥
সমদৃষ্টি নে তৃষ্ণা ত্যাগী, পরস্ত্রী জেনে মাত রে।
জিহ্বা থকী অসত্য ন বোলে, পরধন নব ঝালে হাথ রে॥
মোহ মায়া ব্যাপে নহি জেনে, দৃঢ় বৈরাগ্য জেনা মনমাঁ রে।
রামনামসুঁ তালী লাগী, সকল তীরথ তেনা তনমা রে॥
বনলোভী নে কপট রহিত ছে, কাম ক্রোধ নিবার্যা রে।
ভণে নরসৈঁয়া তেনু দরসন করতাঁ, কূল একোতের তার্যাঁ রে॥

বৈষ্ণব জন তো তাহাকেই বলে যে পরের দুঃখ অনুভব করিতে পারে। অপরের দুঃখে যে তাহার উপকার করে, (কিন্তু) মনে কোনও অভিমান আসিতে দেয় না।

সকল মানুষকে বন্দনীয় বলিয়া মনে করে, নিন্দা কাহারও করে না; বাক্য কাজ ও মন যে ব্যক্তি অবিচল রাখিতে পারে, তাহার জননী ধন্য।

সকল বিষয়ে যাহার দৃষ্টি সমভাবাপন্ন থাকে, যে তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়াছে, পরস্ত্রী যাহার নিকটে মাতার স্থান লাভ করিয়াছে, যাহার জিহ্বা ভুলিয়াও অসত্য বলে না, পরের ধনে যে হাত দেয় না;

মোহ এবং মায়া যাহাকে আচ্ছন্ন করে না, যাহার মনে দৃঢ় বৈরাগ্য বর্তমান, রামনাম শুনিয়া যে তালি দেয়, তাহার তনুতে সকল তীর্থ বিরাজ করে;

যাহার মন বনে পড়িয়া আছে, যাহার মধ্যে কপটতা নাই, কাম এবং ক্রোধের বেগকে যে নিবারণ করিয়াছে;

নরসৈঁয়া বলিতেছেন, এমন লোকের দর্শন লাভ করিলে সমগ্র কুল তরিয়া যায়।

ভোরে অপরাপর কাজ

প্রার্থনা শেষ হইলে গান্ধীজী লণ্ঠন লইয়া বসিতেন। নোয়াখালিতে প্রত্যহ তাঁহার কাজ ছিল বাংলা পড়া। অক্ষর পরিচয়ের জন্য নানা বই আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে শ্রীঅনাথনাথ বসুর 'বড়দের পড়া' অবলম্বন করিয়া গান্ধীজী প্রথমে বাংলা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। বইখানি বড়দের জন্য লিখিত, কিন্তু বাঙালী বয়স্কদের জন্যই লেখা হইয়াছে; অর্থাৎ যাহারা বাংলা ভাষা জানে অথচ লেখাপড়া শিখিতে চায় ইহা তাহাদের উপযুক্ত বই। পাঠক্রম বেশ সহজ ধাপে ধাপে সাজানো আছে। গান্ধীজী ইহা লইয়া আরম্ভ করিলেন বটে; কিন্তু কয়েকদিন পরে বলিলেন, বাংলা ভাষা আমার জানা না থাকায় চলতি কথার জন্য মাঝে মাঝে আমার আটকাইয়া যাইতেছে। বাংলা ভাষার ব্যাপারে আমি তো শিশুদেরই মত; অতএব শিশুদের পাঠ্যপুস্তকই আমার পক্ষে ঠিক হইবে। সেই সময়ে নানা বই বাছিয়া হিন্দী ভাষায় লিখিত বাংলা শেখার উপযোগী আর একখানি বই তাঁহার জন্য নির্বাচন করা হইল।

গান্ধীজী নিয়মিতভাবে হাতের লেখা লিখিতেন; প্রত্যহ অন্তত তিন-চার লাইন না দেখিয়া লেখার অভ্যাস করিতেন। একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, প্রত্যহ অন্তত পাঁচ মিনিট সময় বাংলা অভ্যাস করিতেই হইবে। অবশ্য এই পাঁচ মিনিট প্রায় রোজই দশ-পনরো মিনিটে পরিণত হইত। কিন্তু নোয়াখালিতে কোনদিন পাঠের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখি নাই। বিহারেও বাংলা পড়া চলিয়াছিল, এবং দিল্লীতে শেষ দিন পর্যন্ত

তিনি বাংলা পড়িয়াছিলেন, ইহা ইংরেজী 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নোয়াখালি ছাড়িবার পর গান্ধীজী ৯ই মে ১৯৪৭ তারিখে বিহার হইতে পাঁচ দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে হাতের অক্ষরে লেখা, কিন্তু ব্লক করিয়া ছাপা তুইখানি বাংলা বই ছিল। সে সময়ে গান্ধীজী ছাপা অক্ষরে পড়া ছাড়িয়া হাতের লেখা পড়িবার অভ্যাস করিতেছিলেন। লেখা এবং ছাপা বাংলা অক্ষরের মধ্যে ব্যবধান বড় বেশি বলিয়া তাঁহার মনে হইত।

ভোরের বেলা ছাড়া অপর সময়ে অবসর পাইলেও তিনি বাংলা পড়িতেন। পরদিন সকালে যে কয় লাইন নূতন পাঠ লইবেন, অবসর পাইলে সেটি আগে হইতে পড়িয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। একদিন এরূপ অবসর পান নাই। সকালে পাঠের সময়ে রহস্য করিয়া আমাকে লিখিয়া দিলেন, ছাত্র যদি ছাত্র নামের যোগ্য হইতে চায় তবে শিক্ষকের কাছে যাইবার আগেই তাহার পক্ষে পড়া তৈয়ারি করা কর্তব্য।

A pupil to be worthy must make previous preparation for the lesson before the teacher. (সোমবার মৌনদিবস, ২৩-১২-১৯৪৬)।

ভোর সাড়ে পাঁচটা বেঙ্গল টাইম, অর্থাৎ সাড়ে চারটার সময়ে গান্ধীজী বড় এক গেলাস ভর্তি গরম জল পান করিতেন। পাথরের গেলাসে তাঁহাকে জল দেওয়া হইত এবং উহার সহিত তিন চামচ অর্থাৎ আধ ছটাক বা এক আউন্স মধু এবং পাঁচ গ্রেন সোডি বাইকার্ব মিশাইয়া দেওয়া হইত। সেই গরম জলের গেলাসটি বাঁ হাতে কোন রুমাল অথবা ছোট কাপড়ের টুকরা দিয়া ধরিয়া ডান হাতে অবস্থিত কাঠের চামচ দিয়া অল্প অল্প পান করিতেন। ইহার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে এক গেলাস, বারো আউন্স বা দেড় পোয়া লেবুর রস তৈয়ারি করিয়া আনা হইত। সচরাচর মোসম্বি অর্থাৎ শরবতীলেবু অথবা

কমলালেবুর রস এবং তাহার সহিত এক আউন্স বা আধ ছটাক পাতি-লেবুর রস চামচ দিয়া গুলিয়া দেওয়া হইত। ইহাই ছিল গান্ধীজীর প্রাতরাশ।

গান্ধীজীর গন্ধ সম্বন্ধে কোনও বোধ ছিল না। স্বাদের সম্পর্কে তিনি সাধনা করিয়াই উদাসীন হইয়াছিলেন। কমলা বা শরবতীলেবুর রসে গেলাস ভর্তি না হইলে আনারসের রস দিয়াও তাহা পূরণ করিয়া দেওয়া হইত; কিন্তু কোন দিন ইহার জন্য আপত্তি তিনি করেন নাই, এমন কি এ বিষয়ে উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। ফলের রস বাহির করিবার জন্য কাচের একরকম যন্ত্র পাওয়া যায়; লেবুটিকে পেটের কাছে আধাআধি চিরিয়া মন্দিরের চূড়া অথবা বরণডালার শ্রীর মত ছুঁচাল অংশের উপর চাপ দিয়া ঘুরাইলে রস বাহির হইয়া পড়ে। আমরা যখন রস করিতাম, তখন খুব সাবধানে করিতাম। মনু গান্ধী আসিবার পর তিনি নিজে গান্ধীজীর খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। তখন লক্ষ্য করিতাম, তিনি আমাদের মত অত টিপিয়া নিঃশেষে রস বাহির করিতেছেন না। অবশ্য লেবুর অকুলান আমাদের কখনও হইত না। গ্রামের নরনারী এবং বাহির হইতে আগন্তুক যাত্রীদল প্রায়ই উপহারস্বরূপ ফল লইয়া আসিতেন। গান্ধীজী সমবেত জনতার মধ্যে বালক-বালিকাদের ডাকিয়া সচরাচর উহা বিলাইয়া দিতেন। তাহা সত্ত্বেও আমাদের ভাঁড়ারে যথেষ্ট লেবু ও অন্যান্য ফল আসিয়া জমিত। গান্ধীজীর কড়া নির্দেশ ছিল যেন একটি ফলও নষ্ট না হয়, যাহার যখন দরকার সে যেন উহা ব্যবহার করিতে পায়।

ফলের রস খাইবার আগে, অর্থাৎ বাংলা পাঠের পরেই গান্ধীজী লেখার কাজ লইয়া বসিতেন। কোন দিন হয়তো কোন চিঠির উত্তর

লিখিতেন; মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ বা বিবৃতি রচনা করিতেন। কখনও বা দেখিতাম, তিনি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। আমাদের সঙ্গে বাংলা ভাষা শেখার পুস্তক ছাড়া প্রায় ৫০।৬০খানি ছোট-বড় বইও ছিল। শ্রীরামপুর গ্রামে গান্ধীজী মোট ৪২ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের সম্পদের মাত্রা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুহরাবর্দি নামক জনৈক লেখকের দ্বারা সঙ্কলিত মুহম্মদের বাণী—*Sayings of Muhammad*, অলডুস হাক্সলের *Perennial Philosophy* হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দী ভাষায় লেখা প্রাকৃতিক চিকিৎসাবিধান সম্বন্ধে বইও আমাদের সঙ্গে ছিল। কদাচিৎ তিনি এই সকল বইয়ের মধ্যে কিছু বাছিয়া লইয়া পড়িতেন। তাঁহার বেশি সময় চিঠি পড়া এবং উত্তর দেওয়াতেই অতিবাহিত হইত।

ইতিমধ্যে বেলা সাতটা বাজিলে তিনি প্রাতর্ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেন।

প্রাতর্ভ্রমণ

প্রত্যহ সকালে এবং সন্ধ্যায় বেড়ানো গান্ধীজীর অভ্যাস ছিল। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে ওয়ার্ধাতে যখন তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই, তখন দুই দিন বিকালের ভ্রমণের সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তখন লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তিনি পায়ে চামড়ার চপ্পল পরিয়া খুব দ্রুত হাঁটিতে পারিতেন। সে সময়ে এক মাইল যাওয়া ও এক মাইল ফিরিয়া আসা তাঁহার নিয়ম ছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীরামপুর গ্রামে থাকার সময়ে তিনি যাতায়াতে সবসুদ্ধ এক মাইল বা তাহার কম বেড়াইতেন। প্রায় মাসখানেক পরে তাঁহার শরীর আরও সবল হইলে তিনি ভ্রমণের পরিমাণও বাড়াইয়া দেন।

শ্রীরামপুরে আমরা যে বাড়িতে ছিলাম, তাহার সীমানা ছাড়াইলেই দুই পাশে ধানের ক্ষেত এবং মাঝে মাঝে সুপারি-নারিকেলের বাগানে ঘেরা গৃহস্থদের বাড়ি দেখা যাইত। ধানক্ষেতের আল ধরিয়া অথবা কোন সরু কাঁচা পথে গান্ধীজী হাতে একটি পাঁচ ফুট আন্দাজ লম্বা হালকা বাঁশের লাঠি লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। এই সকল পথে মাঝে মাঝে খাল বা নালা পড়িত। তাহার উপরে সুপারিগাছ পাতিয়া সাঁকো করাই নোয়াখালির রীতি। বড় হইলে বাঁশের ধরনি ও কাঠের পুল থাকিত। শ্রীরামপুরে বেড়াইবার সময়ে প্রত্যহ গান্ধীজী এমনই একটি সাঁকোর উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন। সকালে শিশিরে মাঠ, ঘাস ও সাঁকোর কাঠ সবই ভিজিয়া থাকিত বলিয়া পা পিছলাইয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল। আমাদের মধ্যে কেহ হয়তো সাঁকো পার হইবার সময়ে তাঁহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিতাম, কিন্তু তিনি রোজই বিনা সাহায্যে পার হইবার চেষ্টা করিতেন। প্রথম প্রথম দুর্বলতার জন্য পা ঠিকমত পড়িত না, এক-আধদিন পড়-পড় হওয়ায় শেষ মুহূর্তে পার্শ্ববর্তী কাহারও কাঁধে ভর দিয়া সামলাইয়া লইয়াছিলেন। বিহারের দাঙ্গা নিবারণের জন্য তিনি যে খাওয়া কমাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার জন্যই বিশেষভাবে দুর্বলতা আসিয়াছিল। কিন্তু সে দুর্বলতা ক্রমে ক্রমে কাটিয়া গেল।

গান্ধীজীর শরীর আর একটু সুস্থ হওয়ার পর তিনি গ্রামপরিক্রমা আরম্ভ করিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের ব্যবস্থা অনুসারে প্রতিদিন ভোরবেলা সমস্ত জিনিসপত্র গুছাইয়া আগামী গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকের দল মাল বহিয়া লইয়া চলিয়া যাইত এবং তাহার পরে সকাল সাড়ে সাতটার সময়ে গান্ধীজী যাত্রা আরম্ভ করিতেন। অর্থাৎ তাঁহার প্রাতর্ভ্রমণের পরিবর্তে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাত্রার

বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সতীশবাবু এমন সুন্দরভাবেই বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, তুই বা তিন মাইলের কম হাঁটিয়া গান্ধীজী রাত্রিবাসের জন্য পরবর্তী গ্রামে আসিয়া পৌঁছাইয়া যাইতেন।

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ সালে আমরা ছামচাদি নামক একটি গ্রাম ছাড়িয়া কাফিলাতলির অভিমুখে রওনা হইলাম। তখন শীতের শেষ, মাঠে ফসল নাই; আমাদের পথ কিছুদূর পর্যন্ত ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। একটি ক্ষেত হইতে অপর একটি নীচু ক্ষেতে নামিবার সময়ে আল হইতে আমি লাফাইয়া পড়িলাম। গান্ধীজীর নামিবার সময়ে পাছে অসুবিধা হয়, এই ভাবিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি নিকটে আসিলে হাত বাড়াইয়া দিলাম। কিন্তু গান্ধীজী সাহায্য না লইয়া, কেবল নিজের লাঠির সাহায্যে সহজে নামিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, এ কি শ্রীরামপুর পাইয়াছ? অর্থাৎ, এখন বেশ জোর আসিয়া গিয়াছে। শরীরের তুর্বলতা স্বীকার করিতে গান্ধীজী ভালবাসিতেন না। অবশ্য শরীরের ক্ষমতায় না কুলাইলে তিনি অপরের সাহায্য অনাড়ম্বরভাবে গ্রহণ করিতেন; কিন্তু যতক্ষণ শরীর চলে, ততক্ষণ তাহাকে ছুটি দিতে চাহিতেন না।

১৯৩৮ সালে ২৪এ অথবা ২৫এ ফেব্রুয়ারি তারিখে পুরী জেলায় গান্ধী-সেবা-সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন হয়। গান্ধীজী জনসভায় বক্তৃতা দিবেন বলিয়া একটি উঁচু কাঠের মঞ্চ তৈয়ারি করা হইয়াছিল। সেই মঞ্চটিতে উঠিবার জন্য বাঁশের সিঁড়ি ছিল। আমার মনে আছে, গান্ধীজী যখন সেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিলেন, তখন পাশ হইতে কেহ তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। গান্ধীজী যেভাবে ঝটকা দিয়া সেই হাত সরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা

দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, শারীরিক দুর্বলতার ইঙ্গিত পাইলে তিনি যেন বিরক্ত হইয়া উঠেন।

শ্রীরামপুর গ্রামে শীত বেশি না হইলেও নোয়াখালির সেঁতসেতে আবহাওয়ার ফলে আমাদের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইত। আমরা গায়ে গরম আলোয়ান জড়াইয়া বাহির হইতাম। কিন্তু গান্ধীজী ঘরের ভিতরে আলোয়ান ব্যবহার করিলেও সকালে বেড়াইবার সময়ে একখানি খাদির চাদর গায়ে দিয়া বাহির হইতেন। সূর্যের আলো এবং তাপ তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। সকালের আলো যাহাতে পরিপূর্ণ ধারায় গায়ের উপরে আসিয়া পড়ে, তাহার জন্য তিনি গায়ের উপরে যথাসম্ভব কম কাপড় রাখিতেন।

শ্রীরামপুর গ্রামে সকালে বেড়ানোর সময়ে তাঁহার সঙ্গে খুব কম লোক থাকিত। হয়তো কাহারও কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে কোন বিষয়ে কথাবার্তা বলিতেন, কিন্তু তিনি নিজে এ সময়ে একা নীরবে চলা ভালবাসিতেন। চলিতে চলিতে কখনও বা স্থানীয় চাষের সম্বন্ধে দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, কখনও বা পথের পাশে ছোট ছেলেমেয়েরা পাঠশালার সামনে রোদে মাদুর পাতিয়া যেখানে সুর করিয়া পড়িতেছে সেখানে দাঁড়াইয়া শুনিতেন এবং আপন মনে হাসিতেন। গান্ধীজীকে দেখিয়া ছাত্রের দল পড়া বন্ধ করিলে তাহাদিগকে বলিতেন, পঢ়ো, পঢ়ো—অর্থাৎ পড়া বন্ধ করিও না।

চিকিৎসায় উৎসাহ

শ্রীরামপুর গ্রামে গান্ধীজী যে পথ ধরিয়া প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতেন তাহার পাশে জনৈক মুসলমান চাষীর বাড়ি ছিল। সে ব্যক্তির নাম ছিল ইসমাইল খোন্দকার চৌধুরী। গান্ধীজী বেডাইয়া ফিরিবার সময়ে

মধ্যে মধ্যে পথের ধারে কোন বাড়িতে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিতেন। ২রা ডিসেম্বর ১৯৪৬ তারিখে, সোমবার, তিনি এইরূপে ইসমাইল খোন্দকারের বাড়ি গিয়া শুনিলেন যে, একটি ছোট ছেলের জ্বর হইয়াছে এবং গৃহস্বামীরও শরীর বিশেষ ভাল নয়, কয়েকদিন ধরিয়া পেট পরিষ্কার হইতেছে না।

চিকিৎসার কোনও সুযোগ পাইলে গান্ধীজী বড় খুশি হইতেন। রোগীর সেবায় তিনি যথার্থই খুব পটু ছিলেন। সেদিন সোমবার বলিয়া তাঁহার মৌন দিবস, অতএব ছোট কাগজের টুকরায় তিনি লিখিয়া জানাইলেন যে, ইসমাইল খোন্দকারের বাড়ির রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা তিনি করিতে চান। বেড়ানো শেষ হইলে আমরা তাঁহার নির্দেশ-মত ইসমাইল মিঞাকে একবার সেবন করিবার মত ম্যাগ সাল্‌ফ দিয়া আসিলাম এবং ছোট ছেলেটিকে এনিমা দিবার জন্য শিবিরে পাঠাইয়া দিতে বলিলাম। ইসমাইল কিন্তু রাজি হইল না। তাহার ইচ্ছা, এনিমা বাড়িতেই দেওয়া হয়, কি জানি যদি অকস্মাৎ কোন বিপদ-আপদ ঘটিয়া যায়! গান্ধীজীকে এই সংবাদ দিলে তিনি লিখিয়া জানাইলেন, বেলা দুইটার সময়ে যেন গরম জল তৈয়ারি থাকে, তিনি নিজেই এনিমা দিয়া আসিবেন।

কিন্তু ইহাতে আমাদের ঘোর আপত্তি ছিল। শ্রীযুক্ত পরশুরাম অথবা আমার কাজের চাপ যতই বেশি থাকুক না কেন, গান্ধীজীকে এরূপ কাজের জন্য দুপুর রৌদ্রে আধ মাইল দূরে পাঠাইলে, লোকেই বা আমাদিগকে বলিবে কি? এই কথা বলায় গান্ধীজী কয়েক খণ্ড কাগজের টুকরায় খুঁটিনাটি নির্দেশ লিখিয়া দিলেন। সেই বিচিত্র লেখাগুলি পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এখানে দিতেছি।—

১। আমি যাহা বলিতে চাই, তাহা কি তুমি ঠিক বুঝিয়াছ? একজন রোগীকে ম্যাগ সাল্‌ফ, অপরকে এনিমা। যখন সে এখানে আসিবে, তখন আমি এনিমা দিব।

২। সকালে, অর্থাৎ খালি পেটে থাকার সময়ে দিতে চাই। আমি এনিমা এখানে (উহাদের বাড়িতে) আনিয়া রোগীকে দিব। শুধু খানিক পরিষ্কার গরম জলের ব্যবস্থা রাখিও।

৩। ছেলেটিকে কখন এনিমা দেওয়া যাইবে?

আচ্ছা, তাহা হইলে আমরা দুইটার সময়ে এখানে আসিব। যদি উনি চান, কাল সকালেও দেওয়া যাইতে পারে।

৪। এই বৃদ্ধের জন্য চর্মরোগের মলমের দরকার। মলম আসিয়া যাইবে।

৫। হাতে সহ্য হয়, ইহার চেয়ে যেন জল বেশি গরম না হয়।

ঐরকম গরম জল দশ আউন্স লইয়া তাহার সহিত দুই চামচ পরিষ্কার লবণ মিশাইয়া ভাল করিয়া নাড়িয়া লইবে। এনিমা ধীরে ধীরে দিবে, যেন জল অন্ত্রের ভিতরে খানিকক্ষণ থাকে। এনিমার ক্রিয়া পুরা হইয়া গেলে যখন সকল জলটুকু নিঃশেষে বাহির হইয়া যাইবে, তাহার পর সমপরিমাণ ঠাণ্ডা জল দিও; তাহাতে নুন বা অপর কিছু মিশাইও না। প্রতি বার যে মল নির্গত হইবে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিও, কোনও কৃমি বাহির হইয়াছে কি না।

দ্বিতীয়বার যে জলের এনিমা দিবে, তাহা যদি কয়েক মিনিট পর্যন্ত নির্গত না হয়, তবে চলিয়া আসিও ও বাড়ির লোকেদের বলিও তাঁহারা যেন মল পরীক্ষা করিয়া তোমাদিগকে পরে জানায়।

অন্যরূপ নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত রোগীকে প্রত্যহ রাত্রে আধ ড্রাম পরিষ্কৃত জোয়ান খাইতে দিবে।

এনিমার মুখে ভেসলিন মাখাইও, তাহা হইলে দিবার সুবিধা হইবে। ব্যবহারের পর ফুটাইয়া লইও।

1. You understand what is meant. Mag-Sulph to one patient, enema to another. When he comes here I shall give the enema.

2. In the morning, i.e. now, if he has not eaten anything. I shall bring the enema here and give it. The only thing is that there shd. be clean hot water.

3. When will the child be ready ?

Then we shall come here at 2 o'clock. If he prefers it can be given tomorrow morning.

4. This old man requires an ointment for his skin-disease. The ointment will come.

5. The water should be no warmer than the fingers can bear.

Take ten ounces of such water and mix in it 2 teaspoonfuls of clean salt, stir well. The enema shd. be gently administered so that the water may be retained for a while. When it has acted and the water is expelled, administer an equal quantity of cold water without salt or anything else. Examine the contents of the stool each time to see whether any worm is expelled. If the 2nd. quantity is not expelled in a few minutes you may leave the patient asking the people to examine the stool and report upon the condition of the stool.

The patient shd. be given every night until further instructions ½ a dram of Ajben seeds properly cleaned.

Smear the nozzle with vaseline to ensure easy insertion. Boil it after to sterilise it.

আমরা শ্রীরামপুরে যে বাড়িতে থাকিতাম, তাহার নিকটে অপর একটি বাড়িতে সাংবাদিক বন্ধুগণ থাকিতেন। ইঁহারা পাঁচ-ছয় জনে দুইখানি ঘরে স্থান পাইয়াছিলেন। কাজের চাপ খুব বেশি থাকায় সব সময়ে তাঁহাদের বিছানা বা টেবিলপত্র গোছানো থাকিত না। মাদ্রাজের 'হিন্দু' নামক ইংরেজী পত্রিকার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী

বাংলার ভিজা হাওয়ায় আসার পরেই সর্দি-জ্বরে পড়িলেন। মাথায় যন্ত্রণা বেশি হওয়ায় সারারাত তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই। গান্ধীজী তাঁহার অসুখের সংবাদ শুনিয়া সকালে বেড়াইয়া ফিরিবার সময়ে এক জায়গায় মোড় ফিরিয়া সাংবাদিক বন্ধুদের ঘরের অভিমুখে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে যাঁহারা বেড়াইতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন অবস্থা দেখিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ঘরের দিকে ছুটিয়া বাসি বিছানা মশারি তুলিয়া কাগজপত্র যথাসম্ভব সুবিন্যস্ত করিয়া, মেঝেতে ছড়ানো কয়েকদিনের সঞ্চিত সিগারেটের গোড়া ঝাঁট দিয়া ঘরের সব দরজা জানালা খুলিয়া, কোন রকমে উহাকে গান্ধীজীর অভ্যর্থনার যোগ্য করিয়া তুলিলেন।

গান্ধীজী রোগীর দেহের তাপ পরীক্ষা করার পর মাথায় হাত বুলাইয়া, মাটির প্রলেপের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি নিজে প্রত্যহ দুপুর বেলায় পেটে মাটির মোটা প্রলেপ দিয়া কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিতেন বলিয়া পরশুরাম ঐ ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। পরশুরাম আসিয়া রঙ্গস্বামীর কপালে মাটির প্রলেপ দিয়া গেলেন, অন্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হইল। প্রলেপ দেওয়ার ফলে রোগীর মাথায় যন্ত্রণার যথেষ্ট উপশম হইয়াছিল, এবং নিদ্রা হওয়ার পর রোগীও ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

শত কাজের মধ্যেও গান্ধীজী চিকিৎসা বা সেবার সুযোগ পাইলে খুশিই হইতেন। বিশেষত প্রাকৃতিক চিকিৎসাপদ্ধতির প্রয়োগ করিতে পাইলে তিনি যেন আরও প্রসন্ন হইতেন। নোয়াখালিতে যাঁহারা গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন, তাঁহাদের আলোচনার বিষয় অত্যন্ত গুরুতর হইলেও কাহাকেও বেশি সময় দেওয়া সম্ভব হইত না। সেরূপ অবস্থার মধ্যে প্রাকৃতিক চিকিৎসার বিষয়ে উপদেশ লইতে

আসিয়া বিনয়ভূষণ দাস নামে একজন রোগী গান্ধীজীর কাছে ৪-২-১৯৪৭ তারিখে আধ ঘণ্টার উপর নানা উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন।

২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ তারিখে আমরা সাতঘরিয়া নামক একটি গ্রামে রাত্রিযাপন করিয়াছিলাম। যে গৃহস্থের বাড়িতে আমাদের বাসা হইয়াছিল, সেখানে পাশের একটি ঘরে কোনও উন্মাদ রোগী থাকিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে অসংলগ্ন শব্দ করিতেন। গান্ধীজী ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। পরদিন আমরা যখন সাতঘরিয়া হইতে সাধুরখিল গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিব, তখন গান্ধীজী এক খণ্ড ছোট কাগজে লিখিয়া ঐ রোগীর বিষয়ে নির্দেশ দিলেন। সেদিন সোমবার, তাঁহার মৌন দিবস ছিল। কাগজখানি পড়িয়া দেখিলাম গান্ধীজী লিখিয়াছেন—

> এখানে একজন উন্মাদ রোগী আছে। মনু তাহার জন্য ঠিক ঔষধের বিধান দিয়াছে। রামনাম। যদি রামনামে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া উহার সামনে ছন্দোবদ্ধভাবে রামনাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে রোগী নিশ্চয়ই উন্মাদ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। গৃহস্থদের এই কথা বলিয়া দাও। আমি পরে আরও বলিব।
>
> **There is a lunatic here. Manu prescribed the right medicine. It is Ramnam. If a believer repeats it before him rhythmically long enough, he will surely get out of his insanity. Please tell the inmates this much. More from me later.**

সকালে বেড়ানো শেষ হইত। গান্ধীজী ফিরিয়া আসিয়া ঘরের বাহিরে চামড়ার স্যাণ্ডাল ছাড়িয়া খড়ম পরিতেন। বাড়িতে চলাফেরা করার জন্য তিনি সর্বদা খড়ম ব্যবহার করিতেন, বাহিরে যাইতে হইলে চামড়ার জুতা পরিতেন। সকালে ভিজা মাটিতে হাঁটার ফলে জুতার

তলায় কাদা এবং ঘাসের চাবড়া জমিয়া থাকিত। আমরা বাঁখারি দিয়া তাহা চাঁছিয়া পরিষ্কার করিতাম এবং উবুড় করিয়া রোদে শুখাইতে দিতাম। কোন কোন দিন অসাবধানতাবশত বেশিক্ষণ রৌদে থাকার ফলে স্যাণ্ডাল শুকাইয়া বাঁকিয়া যাইত, তখন আবার তাহাকে মোচড় দিয়া সোজা করিয়া বিকালে ব্যবহারের জন্য তুলিয়া রাখা হইত।

নিত্যক্রিয়া

সকালে বেড়ানো শেষ হইলে গান্ধীজী শৌচাগারে যাইতেন। শ্রীরামপুরে শুইবার ঘরের এক কোণে পর্দা দিয়া ঘেরা একটু জায়গায় কমোড পাতা হইয়াছিল। গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণের সময়ে কিন্তু স্বতন্ত্র ঘেরা কোনও জায়গায় উহা বসানো হইত। শৌচাগারে সাবান, তোয়ালে প্রভৃতি রাখিবার জন্য একটি তাক ছিল। গান্ধীজী যখন শৌচাগারের মধ্যে থাকিতেন, তখন অন্তরঙ্গ সহকর্মীগণ সে ঘরে প্রবেশ করিতে ইতস্তত করিতেন না। আমরা যেমন সচরাচর উবু হইয়া বসি, গান্ধীজী কমোডেও সেই ভাবে বসিতেন। পাশের তাকে তোয়ালের সঙ্গে গান্ধীজী বাংলা পড়ার বইও রাখিতেন, এবং যতটুকু সময় সেখানে পাওয়া যাইত ততটুকু সময় অপচয় না করিয়া তিনি কয়েক ছত্র পড়িয়া লইতেন। দৈনিক সংবাদ-পত্র আসিয়া পৌঁছিলে শৌচাগারে মোটামুটি তাহার উপরে একবার চোখ বুলাইয়া লইতেন।

কমোড পরিষ্কার করার ভার সঙ্গীদের উপরেই থাকিত। প্রথমে বন্ধুবর পরশুরাম এবং পরে কিছুদিন রামচন্দ্রন্ নামে এক যুবক এই কাজ করিতেন। একদিন আমি কোন এক শিবিরে অসাবধনতাবশত গান্ধীজী শৌচাগারে থাকিবার সময়েই ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলাম ও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম।

তিনি ইহা লক্ষ্য করিয়া পরে আমাকে বলিয়াছিলেন, এরূপ লজ্জা পাওয়া আমার উচিত হয় নাই। যাহা প্রাকৃতিক ব্যাপার, তাহাতে লজ্জা পাইবার কি পাছে ?

ইংরেজ জাতির মধ্যে যেখানে শুধু পুরুষেরা পরস্পরের মধ্যে থাকেন, স্নান করেন বা পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়েন, সেখানেও এইরূপ উদাসীনতার ভাব দেখা যায়। কিন্তু গান্ধীজীর বেলায় তাহা পুরুষ বা নারী অন্তরঙ্গ সহচরদের সম্পর্কে একই ভাবে দেখা যাইত। ইহা লক্ষ্য করিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে, গান্ধীজীর শরীর সম্পর্কে বোধ আমাদের বোধ হইতে স্বতন্ত্র। নগ্নতাকে তিনি যে পছন্দ করিতেন তাহা নয়, বরং শরীর সম্পর্কে তাহার একটা আশ্চর্য রকমের উদাসীনতা আসিয়া গিয়াছিল। তাঁহার আচরণের কোন অঙ্গকে অশোভন বলিয়া মনে হয় নাই, কেবল অনুভব করিয়াছিলাম যে আমাদের চলতি লজ্জা বা ঘৃণার শাসনের দ্বারা তিনি শাসিত নহেন।

খড়মের শব্দ শুনিয়া যখন আমরা বুঝিতে পারিতাম যে, গান্ধীজী শৌচাগার হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন, তখন আমরা তেল মাখাইবার জন্য প্রস্তুত হইতাম। ইতিমধ্যে রান্নাঘরের পাশে একটি চালায় মাটির হাঁড়িতে অথবা টিনের কানেস্তারায় তাঁহার জন্য স্নানের জল গরম হইত।

গান্ধীজীর স্নানের জন্য নলকূপ হইতে জল তুলিয়া গরম করা হইত। বাংলা দেশের পানা পুকুরের জল তিনি কিছুতেই ব্যবহার করিতেন না। পণ্ডিত জওহরলাল যখন ডিসেম্বর-(১৯৪৬)-এর শেষে নোয়াখালিতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন, তখন গ্রামের পথঘাট ও পুকুরের অপরিচ্ছন্ন অবস্থা দেখিয়া গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি ইহা সহ্য করেন কেমন করিয়া ? গান্ধীজী তখন বলিয়াছিলেন, পরিচ্ছন্নতার

ব্যাপারে আমি ইংরেজের মত। গ্রামকে ভালবাসি বলিয়া গ্রামের ময়লাকেও ভালবাসি না। উহাকে পরিষ্কার করিয়া সুস্থ গ্রামে পরিণত করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি গ্রামের লোককে অবিরত সেই শিক্ষাই দিতেছি।*

---

* গান্ধীজীর পুরানো লেখার মধ্যেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।

I wish to utter a word of caution against your believing that I am an indiscriminate despiser of everything that comes from the West. There are many things which I have myself assimilated from the West. —*Selections from Gandhi*, no. 762.

The one thing which we can and must learn from the West is the science of municipal sanitation. The peoples of the West have evolved a science of corporate sanitation and hygiene from which we have much to learn. We must modify Western methods of sanitation to suit our requirements. And as my patriotism is inclusive and admits of no enmity or ill-will, I do not hesitate, in spite of my horror of Western materialism, to take from the West what is beneficial to me.—*ibid*, no. 734.

আমি এক বিষয়ে আপনাদের সাবধান করিয়া দিতে চাই; আপনারা মনে করিবেন না যে, আমি নির্বিচারে পশ্চিম হইতে আগত সকল জিনিসের বিরুদ্ধাচরণ করি। পশ্চিমের অনেক শিক্ষাই আমি নিজে গ্রহণ করিয়াছি।

পশ্চিমী সভ্যতার একটি অঙ্গ আমরা সহজে গ্রহণ করিতে পারি এবং যাহা শিক্ষা করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য, তাহা হইল সমবেতভাবে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান। বহু লোক একত্র থাকিতে হইলে কিভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে তাহার বিদ্যা পশ্চিম-দেশবাসীগণ আয়ত্ত করিয়াছে। আমাদের দেশে পশ্চিমী কৌশলগুলি ক্ষেত্র অনুসারে কিছু পরিবর্তিত করিয়া লইতে হইবে। আমার স্বদেশপ্রেম সঙ্কীর্ণ শত্রুতা বা ঘৃণার উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। ইহা সাদরে অপরকেও স্থান দিতে পারে। সেইজন্য পশ্চিমী সভ্যতার জড়বাদের সহিত আমার প্রচণ্ড বিরোধ থাকা সত্ত্বেও সে সভ্যতার মধ্যে যাহা কিছু আমার পক্ষে কল্যাণকর, তাহা গ্রহণ করিতে আমার বাধে না।

গান্ধীজীকে তেল মাখাইবার জন্য উঠানে একটু জায়গা পর্দা দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইত এবং তাহার মধ্যে প্রায় কোমরের সমান উঁচু একখানি বা দুইখানি টেবিল জুড়িয়া শুইবার মত উচ্চ আসন করা হইত। আসনটি বেশি উঁচু হইলে একটি জলচৌকির সাহায্যে গান্ধীজী তাহার উপরে উঠিতেন, নয়তো মাটি হইতে একেবারে তাহাতে চড়িতেন। আসনটির দিকে পিছন ফিরিয়া তাহার কানায় হাতের চাড়া দিয়া তিনি উঠিতে পারিতেন।

তেল মাখার সময়ে তাঁহার গায়ে আদৌ কোনও কাপড় থাকিত না, উপরের খোলা রোদ দেহে আসিয়া লাগিত। সকাল নয়টার সময়ে তেল মাখা আরম্ভ করিয়া আমরা দশটায় শেষ করিতাম।

গান্ধীজীর একদিন অন্তর দাড়ি কামানোর অভ্যাস ছিল এবং ইহার জন্য সেফ্‌টি রেজর ব্যবহার করা হইত। কামানোর জন্য পৃথক সাবান বুরুশ ব্যবহার না করিয়া আমরা হাত ধুইবার সাবানই ব্যবহার করিতাম। হাতের দ্বারা দাড়ি ভিজাইয়া অনেকক্ষণ ঘষিয়া আমরা দাড়ি নরম করিতাম। এক-একটি ব্লেড যতদিন সম্ভব হয়, ততদিন পর্যন্ত গান্ধীজী ব্যবহার করিতে বলিতেন। শেষের দিকে যখন কামানো আর প্রায় যায় না, তখনও গান্ধীজী কৃপণের মত তাহা ছাড়িতে চাহিতেন না। বলিতেন, আরও কিছুক্ষণ টান দাও, তাড়াতাড়ি কিছুই নাই। এক-একদিন দেখিয়াছি, তিনি কামানোর পর হাত উল্টাভাবে ঘষিয়া দেখিতেছেন, কামানো ঠিক হইয়াছে কি না। যদি মনে হইত যে দোষ থাকিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে নিজে ক্ষুর লইয়া সেই স্থানটা কামাইতে বসিতেন। ভোঁতা ক্ষুরের টানে কখনও কখনও দাড়ি কাটিয়া রক্তপাতও হইত, কিন্তু তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না; স্নানের পরে সেই জায়গায় পরিষ্কৃত মাটির পুলটিশ লাগাইয়া দিতেন।

নূতন কলকৌশলের সম্পর্কে গান্ধীজী সন্দেহ পোষণ করিতেন। ইহা লইয়া তিনি নিজে যেমন কখনও কখনও কৌতুক অনুভব করিতেন, আমরাও করিতাম। বড়দিন উপলক্ষে ফ্রেণ্ড্‌স্‌ সার্ভিস ইউনিট নামক এক প্রতিষ্ঠান হইতে আমাদের শিবিরে কতকগুলি উপহার আসিয়া পৌঁছায়। তাহার মধ্যে সাবানের পরিবর্তে দাড়ি কামাইবার জন্য এক প্রকার ক্রীম আসিয়াছিল, তাহা শুধু মাখাইবার পরই কামানো যায়। একদিন কামাইবার সময়ে আমি গান্ধীজীর অনুমতি লইয়া সেই ক্রীম ব্যবহার করিলাম। হয়তো যথেষ্ট ঘষা হয় নাই, অথবা ক্ষুরের ব্লেড সেদিন ভোঁতা হইয়া গিয়াছিল, সেদিন কামানো ভাল হইল না। গান্ধীজী কামানোর শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন হইল? আমি উত্তর দিলাম, নূতন জিনিসটিতে সুবিধা হইল না। কৌতুকের সুরে তিনি তখন বলিলেন, ওয়সা হোনা হি চাহিয়ে, কহাঁসে হোগা? হবেই তো, ভাল কামানো কোথা হইতে হইবে?

তেল মাখানোর সময়ে গান্ধীজী প্রথমে চিৎ হইয়া শুইতেন, আমরা পেটে হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তেল মাখাইতে আরম্ভ করিতাম। হেজেলিন স্নোর শিশিতে আধ শিশি সরিষার তেল ও বাকি অংশ পাতিলেবুর রস ভরিয়া খুব ঝাঁকানির সাহায্যে তাহা মিশাইয়া সারা গায়ে মাখানো হইত। যে সময়ে আমরা পেটে তেল মাখাইতাম, সে সময়ে তাঁহার হাতে কোনও বই থাকিত। শ্রীরামপুরে থাকার সময়ে তিনি হিন্দী ভাষায় লিখিত প্রাকৃতিক চিকিৎসা সম্বন্ধে একখানি বই পাঠ করিতেন। ঐ বইখানি অপর কোনও সময়ে তাঁহাকে পড়িতে দেখি নাই। তেল মাখার মধ্যেই হয়তো কোনদিন এক পৃষ্ঠা, কোনদিন দুই পৃষ্ঠা পড়িতে পড়িতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সে বইখানি শেষ করিয়া ফেলিলেন।

পেটে তেল মাখানো শেষ হইলে বুকে এবং বুকের পরে হাত

দুইটিতে মাখানো হইত। তাহার পরে পা। পায়ে মালিশ আরম্ভ হইলে গান্ধীজী চশমা খুলিয়া বই বন্ধ করিয়া একটু ঘুমাইয়া লইতেন। মুখে রোদ পড়িলে পাশের বেড়ায় একটি ছাতা গুঁজিয়া আমরা ছায়া করিয়া দিতাম। এই ভাবে গান্ধীজী কুড়ি মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমাইয়া লইতেন। আমরাও সে সময়ে সন্তর্পণে তেল মালিশ করিয়া যাইতাম। অবশেষে ঘুম ভাঙিলে তিনি উপুড় হইয়া শুইতেন, এবং আমরা পিঠে ও মাথায় ভাল করিয়া তেল মাখাইয়া মালিশের কাজ শেষ করিতাম।

তেল মাখার পর্ব এক ঘণ্টা ধরিয়া চলিত। তাহার পর গান্ধীজী একবার শৌচাগারে প্রবেশ করিয়া স্নানের জায়গায় যাইতেন। বড় টবে ঠাণ্ডা জলের সহিত গরম জল মেশানো হইত। তিনি হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া যখন বলিতেন, আর দরকার নাই, তখন আমরা গরম জল ঢালা বন্ধ করিতাম। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বিলাতে থাকিতে গান্ধীজীর কঠিন প্লুরিসি রোগ হইয়াছিল। তাহার পর হইতে অল্পেতেই তাঁহার সর্দি লাগিত। এই জন্য তিনি গরম জলেই স্নান করিতেন। শরীরের দ্বারা পুরা কাজ করাইয়া লইতে হইবে, অতএব সেই শরীরকে কার্যকরী অবস্থায় রাখিবার জন্য তিনি সর্বদা সযত্নে চেষ্টা করিতেন।

শ্রীরামপুর গ্রামে থাকার সময়ে স্নান তিনি নিজেই করিতেন। আমি নিজে পাশে দাঁড়াইয়া জল ঢালিয়া দিতাম। স্নানের জন্য দুইটি ছোট গামছা লাগিত, পায়ের তলা ঘষিবার জন্য এক খণ্ড ঝামার টুকরা ছিল। আমি লক্ষ্য করিতাম, তিনি প্রত্যহ ঠিক একই ভাবে ও একই পর্যায়ক্রমে হাত পা ইত্যাদি রগড়াইয়া তেল তুলিতেন। স্নানের জন্য তিনি সাবান ব্যবহার করিতেন না। স্নান শেষ হইলে শুখনা তোয়ালে দিয়া পরিষ্কারভাবে গা মুছিয়া কাপড় পরিয়া বাহির হইতেন। অত্যন্ত

পরিচ্ছন্ন অভ্যাসের মানুষ ছিলেন বলিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া গায়ের তেল তুলিতে যথেষ্ট সময় লাগিত; কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কখনও তাড়াহুড়া করিতেন না। যে কাজ যখন করিতেন, সেই সময়ে সেই কাজটিকে একান্ত মনোযোগের সহিত সুনিপুণভাবে করা তাঁহার বরাবরের অভ্যাস ছিল।

গান্ধীজী ২০ নভেম্বর ১৯৪৬ বৈকালবেলা শ্রীরামপুর শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হন। ২১এ এবং ২২এ তিনি নিজেই তেল মাখিয়াছিলেন। ২৩ তারিখ হইতে ১৯-১২-১৯৪৬ পর্যন্ত আমি তেল মাখাইয়াছিলাম। আমার কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্ত ২০ তারিখ হইতে গান্ধীজীর নাতনী মনু এই ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। গান্ধীজীকে তেল মাখানোর কাজ বরাবর তাঁহার নাতি এবং সেবাগ্রামের বিশিষ্ট কর্মী কানু গান্ধী করিতেন। নোয়াখালিতে আসিবার পর প্রথম প্রথম তিনিই তেল মাখাইতেন। কিন্তু যখন গান্ধীজী পুরাতন সকল কর্মীকে এক এক গ্রামে বসাইয়া দিলেন, তখন ভার আমার উপরেই পড়িয়াছিল। আমার পরিবর্তে মনু কিছুদিন মাখাইয়াছিলেন মাত্র। বিহারে এবং দিল্লীতে পুরুষ কর্মীদের উপরে আবার এই ভার আসিয়া পড়িল। দিল্লীতে ব্রজকিষেণ চান্দিওয়ালা এ কাজ করিতেন। এ কথা বলার তাৎপর্য এই যে, গান্ধীজীকে তেল মালিশ করার কাজ যদিও পুরুষদের উপরেই অর্পিত থাকিত, তবু ঘটনাচক্রে মেয়েরা সাময়িকভাবে সে দায়িত্ব গ্রহণ করিলে তিনি আপত্তি করিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার পছন্দ-অপছন্দ কিছু আছে বলিয়া আমরা কোনদিন অনুভব করি নাই।

প্রথম প্রথম তেল মাখানোর সময়ে গান্ধীজীর দেহে একটি লক্ষণ দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম। গান্ধীজীর গায়ের

রঙ বেশ ফরসা ছিল। কিন্তু যাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম তাহা হইল, তাঁহার গলার নীচে বুকের উপরের অংশে খানিক দূর পর্যন্ত লাল রঙ। মুখে হঠাৎ রক্ত জমিলে ফরসা মানুষ যেমন লাল হইয়া উঠে, তাঁহার বুকের উপরের অংশ যেন সর্বদাই সেই রকম রঙে রঙিন থাকিত।

পরমহংসদেব যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করিতে যান, তখন জামা খুলিয়া বুক পরীক্ষা করিয়াছিলেন; এবং গায়ের উপরে সিঁদুর-ছড়ানো রঙ দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইহা যোগী পুরুষের বিশেষ লক্ষণ। গান্ধীজীর বুকে প্রথম গাঢ় লাল রঙ দেখিয়া আমার পরমহংসদেবের সেই পুরাতন উক্তি মনে পড়িয়াছিল

খাওয়া

স্নানের পরেই খাওয়ার পালা। গান্ধীজীর খাওয়ার সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, তিনি দিনে ছয় পয়সার বেশি খাইতেন না। কথাটির কবে কোথায় উৎপত্তি হইয়াছিল জানি না; কিন্তু ইহার জন্য গান্ধীজীকে মাঝে মাঝে অকারণ তিরস্কার শুনিতে হইত। তিনি নিজে খাওয়ার সম্বন্ধে এই নিয়ম পালন করিতেন যে, শরীরকে সুস্থ এবং কর্মক্ষম রাখিবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা অবশ্য খরচ করিতে হইবে। বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে আহারের পরিমাণ এবং খরচ বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। প্রয়োজনকে গান্ধীজী যেমন মর্যাদা দিতেন, তেমনই আবার আর এক বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। শুধু স্বাদের জন্য বা অপর কোনও কারণ বশত যদি প্রয়োজনের সীমা লঙ্ঘন করা হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে সত্যভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব প্রয়োজনের সীমা কখনও অতিক্রম করা উচিত নয়। অস্বাদব্রতকে দেশসেবকের

পক্ষে তিনি অবশ্যপালনীয় ব্রত বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ব্রহ্মচর্য পালনের পক্ষে ইহাকে সহায়ক ব্রত হিসাবে তিনি গণ্য করিতেন। সত্যকে সর্ববিষয়ে কষ্টিপাথরের মত ব্যবহার করিতেন বলিয়া গান্ধীজী অকারণ কৃচ্ছ্রসাধনার বিপক্ষে ছিলেন। কঠোরত্বের প্রতি আসক্তি শরীরের প্রয়োজনে উদ্ভূত না হইয়া অনেক সময়ে মানুষের অভিমান বা আমিত্বের মূল হইতে উদ্ভূত হইতে পারে ; অতএব তাহা অসত্য বস্তু এবং পরিহার্য বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।

৺মহাদেব দেশাই একবার লিখিয়াছিলেন যে, গান্ধীজী চান যে গ্রামসেবকগণ সাধারণ অধিবাসীর মতই আহার করিবে। তাহার দাম হয়তো দৈনিক তিন আনার মত পড়ে। কিন্তু তিনি অনাহার বা কৃচ্ছ্রসাধনার পক্ষপাতী নন। জনৈক কর্মী প্রতিদিন একবার মাত্র আহার করিতেন। তিনি প্রত্যহ ১৫ তোলা বা তিন ছটাক চাল, কিছু তরকারি দেওয়া ডাল এবং ঘোল খাওয়ার অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার দৈনিক ব্যয় এক আনা পড়িত। গান্ধীজী কর্মীটিকে লিখিয়াছিলেন—

> তুমি খাদ্যের মাত্রা অত্যধিক কমাইয়া ফেলিয়াছ, প্রায় অনাহারে রহিয়াছ। আমার ধারণা, ভগবান তোমাকে যে উপকরণ দিয়াছেন, তুমি তাহার পুরা ব্যবহার করিতেছ না। একজন মানুষকে ব্যবহারের জন্য কিছু অর্থ দেওয়া হইয়াছিল ; কিন্তু সে ব্যক্তি তাহার সম্যক্ ব্যবহার জানিত না অথবা উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে নাই বলিয়া পরে সে অর্থ তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল, এ গল্প কি তুমি শোন নাই? আমাদের দেহ যখন বিদ্রোহীর মত আচরণ করে তখন কৃচ্ছ্রসাধনার অর্থ আছে। কিন্তু যখন দেহ সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, এবং সেবাকার্যে তাহাকে

নিয়োগ করায় কোন বাধা নাই, তখন শরীরকে পীড়া দেওয়া পাপ। ইহার তাৎপর্য হইল, শুধু কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে কোনও গুণ নিহিত নাই।

Whilst Gandhiji insists, as we have seen, on a village worker living on a villager's diet not costing say three annas a day, he is far from insisting on starvation or mortification of the flesh. To a worker who has imposed on himself a strict regimen involving only one meal a day, consisting generally of 15 tolas of rice boiled, *amti* (made of vegetables and *dal*) and butter-milk, all costing only one anna per day, Gandhiji wrote :

"Your meal is very meagre, it is starvation diet. In my opinion, you are not making full use of the instrument that God has put at your disposal. Do you know the story of the talents that were taken away from him who did not know how to use them, or having known would not use them ?

"Mortification of the flesh is a necessity when the flesh rebels against one ; it is a sin when the flesh has come under subjection and can be used as an instrument of service. In other words, there is no inherent merit in mortification of the flesh".—*Selections from Gandhi*, no. 609.

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন গান্ধীজী বাংলা দেশে আসেন, তখনকার দৈনিক আহারের তালিকা দিবার পর নোয়াখালিতে তাঁহার দিনচর্যার বিষয়ে পুনরায় আলোচনা করিব।

ভোর ৫৷৷০টা—মোসম্বী বা কমলালেবুর রস ১৬ আউন্স।

সকাল ৭টা—ছাগদুগ্ধ ১৬ আউন্স ও ফলের রস ৮ আউন্স।

বেলা ১২টা—ছাগদুগ্ধ ১৬ আউন্স ফুটাইয়া ৪ আউন্স করা। সিদ্ধ তরকারি ৮ আউন্স। কাঁচা তরকারি ৮ আউন্স; যথা—গাজর মুলা টমাটো। কাঁচা পাতা ২ আউন্স; যথা—ধনেপাতা পালংশাক।

বেলা ২॥০টা—ডাবের জল।

বিকাল ৫টা—ছাগদুগ্ধ ১৬ আউন্স ফুটাইয়া ৪ আউন্স করা। দুধে সিদ্ধ খেজুর ১০ আউন্স। সামান্য ফল, নারিকেল।

নোয়াখালি জেলায় শ্রীরামপুর গ্রামে যখন তিনি অবস্থান করিতেছিলেন, তখনকার খাবার কিন্তু অন্য রকম ছিল। ভোরে মধু, গরম জল এবং ফলের রসের বিষয়ে পূর্বে বলিয়াছি। এবার স্নানের পর দুপুরে যাহা খাইতেন তাহার বিষয়ে বলিব।

গান্ধীজীর জন্য একটি ছোট কুকারে রান্না করা হইত। তাহার মধ্যে তিনটি বাটি ছিল। একটির মধ্যে প্রায় এক পোয়া আন্দাজ তরকারি বাটিয়া তাল করিয়া রাখা হইত, আর একটিতে এক পোয়া বা ৮ আউন্স ছাগলের দুধ। তরকারির মধ্যে কুমড়া ঝিঙে হইতে আরম্ভ করিয়া পালংশাক পর্যন্ত থাকিত। সব কয়টি জিনিস কুরুনিতে কুরিয়া পরে শিলে বাটিয়া একটি ডেলায় পরিণত করার পর সিদ্ধ করা হইত। তাহাতে নুন, মশলা অথবা তেল কিছুই থাকিত না; গান্ধীজী তেল আদৌ খাইতেন না।

ইহা ছাড়া রান্না জিনিসের মধ্যে খাকরা নামে এক প্রকার কড়কড়ে গুজরাতী রুটি গান্ধীজী নিত্য আহার করিতেন। পাঁচ আউন্স আটার সঙ্গে পাঁচ গ্রেন খাইবার সোডা এবং আড়াই গ্রেন নুন মিশাইয়া ছাগঘৃতের ময়ান ও সামান্য জল দিয়া খুব কড়া করিয়া মাখা হইত। তাহার পরে পাতলা করিয়া বেলিয়া শুধু তাওয়ার উপরে শক্ত করিয়া সেঁকা হইত। জিনিসটি কড়কড়ে পাঁপরের মত হইলেও ময়ানের গুণে খাস্তা থাকিত। প্রথম আমরা যখন শ্রীরামপুরে পৌছাই, তখন মৌখিক উপদেশ শুনিয়া পরশুরাম ভাল খাকরা করিতে পারেন নাই। খুব পাতলা করিয়া বেলা হয় নাই বলিয়া ভাল সেঁকাও যায় নাই। ২৬এ

নভেম্বর ১৯৪৬ গান্ধীজী স্নান সারিয়া ঘরে আসিয়া শুনিলেন যে, অন্য সব তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু খাকরার জন্য তখনও কিছু বিলম্ব হইবে। শুনিয়া পূর্বদিনের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়াই বোধ হয়, তিনি খড়ম পরিয়া খটখট শব্দ করিয়া রান্নাঘরে উপস্থিত হইলেন এবং চাকি-বেলুন লইয়া পরিপাটিভাবে খাকরা বেলিতে আরম্ভ করিলেন। আমরাও দেখিয়া শিখিয়া লইলাম, ইহার পর হইতে খাকরা সম্বন্ধে কোন অভিযোগের কারণ আর ঘটে নাই। গান্ধীজীর নানাবিধ ছবি দেখিয়াছি, কিন্তু রান্নাঘরের মধ্যে রুটি বেলিতেছেন এমন ছবি কোথাও দেখি নাই।

খাকরা ভিন্ন অপর যাহা যাহা গান্ধীজী আহার করিতেন, এবার তাহার তালিকা দিতেছি। ৮ আউন্স ছাগদুগ্ধের সঙ্গে ১ আউন্স পাতিলেবুর রস। সিদ্ধ তরকারির সঙ্গে তিন চামচ ঈস্ট্ (Yeast) পাউডার। একটি বাতাবিলেবুর মত বড়, গ্রেপ ফ্রুট নামক টক লেবুর সঙ্গে দুই চামচ গ্লুকোজ মিশাইয়া খাইতেন। সরু সরু ফালি করিয়া কাটা মুলা গাজর প্রভৃতি কাঁচা তরকারি।

ইহার পর বেলা একটার সময়ে একটি ডাব ও তাহার শাঁস খাইতেন। বিকালবেলায় প্রার্থনা-সভায় যাইবার পূর্বে ৪॥০টার সময়ে গান্ধীজী আহার করিয়া লইতেন। তখন আট আউন্স দুধ (লেবুর রস না দিয়া), পেঁপে প্রভৃতি ফল এবং সকালের মত সিদ্ধ তরকারি খাইতেন; ইহার পর রাত্রে আর তিনি কিছু আহার করিতেন না।

গান্ধীজীর খাওয়ার মধ্যে কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। তিনি অত্যন্ত ধীরে ধীরে খাইতেন; সময় প্রায় ৪০ মিনিট বা তাহার বেশি লাগিত। তবে ঐ সময়ের মধ্যে তিনি চিঠিপত্রের কাজ অথবা খবরের কাগজ পড়া শুনিয়া লইতেন। খাইবার জন্য কাঁটা এবং চামচ ব্যবহার করিতেন। চামচটি সেবাগ্রামে কেহ কাঠ খোদাই করিয়া গড়িয়া দিয়াছিল। পান

করিবার জন্য; বিশেষত ডাবের জল খাইবার জন্য কাচের ছোট একটি নল ছিল; প্রত্যহ ব্যবহারের পর তাহা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া রাখা হইত। স্বাদের দিকে গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল না, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। উপরন্তু দুর্গন্ধ ঈস্ট্ পাউডার মিশাইয়া চামচ দিয়া তৃপ্তি-সহকারে তিনি সিদ্ধ তরকারি খাইতেন। এমনও কোন-কোনদিন দেখিয়াছি, দুধের সঙ্গে ঐ পদার্থটি মিশাইয়া তিনি আহার করিতেছেন।

কথনও কখনও তরকারির পরিমাণ বেশি মনে হইলে প্রয়োজনের মত রাখিয়া বাকি অংশ আমাদিগকে দিয়া দিতেন। আমরা নুন, মশলা ও কিঞ্চিৎ ঘৃতসহযোগে তাহাকে গলাধঃকরণের যোগ্য করিয়া গান্ধীজীর অন্তরালে আহার করিতাম।

চিবাইয়া খাইতে ভাল বাসিতেন বলিয়া গান্ধীজীর বাঁধানো দাঁত ছিল। সে দাঁতগুলি খাইবার সময়ে পরিলে তাঁহার মুখের গড়ন একটু বদলাইয়া যাইত, এবং কথা বলিবার সময়ে আমাদের কান পাতিয়া শুনিতে হইত, কারণ উচ্চারণের মধ্যে কিছু প্রভেদ অনুভব করিতাম। খাইবার সময় ভিন্ন গান্ধীজী বাঁধানো দাঁত কখনও ব্যবহার করিতেন না। প্রত্যহ বুরুশ দিয়া উহা মাজিয়া জলে ভিজাইয়া রাখা হইত। জিনিসপত্রের বিষয়ে গান্ধীজীর বড় যত্ন ছিল। কিন্তু কোন জিনিস হারাইয়া বা ভাঙিয়া গেলে, সোজাসুজি দোষ স্বীকার করিলে তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হইতেন না।

অপরিগ্রহ

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে যখন তিনি শেষ বারের মত পাটনা হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন জিনিসপত্রের মধ্যে তাঁহার বাঁধানো দাঁত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই পাটনায় খবর পাঠানো হইল,

শ্রীযুক্তা মৃদুলা সারাভাই সংবাদ দিলেন যে উহা পাটনায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। আমরা নূতন দাঁত বাঁধানোর প্রস্তাব করিলাম। প্রথমে গান্ধীজীকে কিছুতে রাজি করানো গেল না। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই জিনিসপত্রের মধ্যে কোথাও ঢুকিয়া আছে, খুঁজিয়া দেখ। তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও যখন পাওয়া গেল না, তখন আমার জনৈক ডাক্তার-বন্ধুকে সংবাদ দেওয়ার বিষয়ে প্রস্তাব করিলাম। গান্ধীজী বলিলেন, দাঁতের যে রকম দাম, তাহাতে নূতন করানোর প্রয়োজন নাই। তর্ক-বিতর্কের পর বলিলেন, আচ্ছা, দামের মধ্যে মজুরি যদি বেশি হয়, তোমার বন্ধুকে ডাকিতে পার। আর যদি দাঁত কেনার খরচ বেশি হয় তাহা হইলে সে বেচারাকে লোকসানে ফেলিও না। যখন বলিলাম, ডাক্তার আমার বাল্যবন্ধু, তখন হাসিয়া লিখিয়া দিলেন, সে জন্য তাহাকে সাজা দিও না'। সোমবার ছিল বলিয়া তিনি নিজের বক্তব্য কাগজের টুকরায় লিখিয়া দিয়াছিলেন। পাঠকের অবগতি এবং কৌতুকের জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

১। Then the set is lying buried somewhere in the luggage. It cannot be lost. I am in no hurry. Do not want to spend money.

২। We must now know what the intrinsic value is. If it is anything approaching what the dentists charge, I wd. love to go without a set. If it is largely the labour then you may trouble the dentist and see what he can do.

৩। Who is the man who will do it ?

৪। Don't think of punishing [him] like that. Let us wait and hear from Mridula. I am in no hurry.

শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীকে রাজি করানো গেল, এবং সারারাত জাগিয়া দাঁত গড়িয়া শেষ করা হইল ; কারণ পরের দিন ভোরবেলা আমাদের

সকলের নোয়াখালি রওনা হইবার কথা ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে নোয়াখালি যাওয়া আর আমাদের শেষ পর্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই।

বহুদিন পূর্বে রিচার্ড গ্রেগ নামে জনৈক আমেরিকান ভদ্রলোক গান্ধীজীকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যথাসাধ্য ব্যয়-সঙ্কোচের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই পুস্তকপাঠ ও পুস্তকসংগ্রহের বিলাসকে সংযত করিতে পারিতেছেন না। গান্ধীজী তাঁহাকে উপদেশ দিয়া লিখিয়াছিলেন—

> যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও বস্তুর ব্যবহার করিয়া অন্তরে সহায়তা বা আরাম অনুভব কর, ততক্ষণ তাহা রাখাই উচিত। যদি হঠাৎ কৃচ্ছ্রসাধনার আবেগে, অথবা কঠিন কর্তব্যবোধের বশে তাহাকে ত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে তাহা ফিরিয়া পাইবার বাসনা মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবে এবং তোমাকে শান্তি দিবে না। যখন আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছাই যে, অন্য কোন বস্তু বা আদর্শের প্রচণ্ড আকর্ষণের ফলে পুরাতন একটি বস্তুর প্রতি আর আমাদের আসক্তি থাকে না, তখনই শুধু দ্বিতীয় বস্তুটিকে ত্যাগ করিও। অথবা পুরাতনের কোনও বন্ধন যদি নূতন আকর্ষণের পথে অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় এবং নূতন বস্তুটি যদি আমাদের সমধিক কাম্য বলিয়া মনে হয়, তখনই ত্যাগের চেষ্টা করিও।

As long as you derive inner help and comfort from anything, you should keep it. If you were to give it up in a mood of self-sacrifice or out of a stern sense of duty, you would continue to want it back, and that unsatisfied want would make trouble for you. Only give up a thing when you want some other condition so much that the thing no longer has any attraction for you, or when it seems to interfere with that which is more greatly desired.—*Selections from Gandhi*, no. 150.

দুপুরের কাজ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, খাইবার সময়ে গান্ধীজী কিছু কিছু কাজও করিতেন। সে সময়ে তাঁহার নিকটে চিঠিপত্র বা খবরের কাগজ পড়া হইত। নোয়াখালিতে নিয়ম ছিল, খাইবার সময়ে চিঠি এবং বেলা তিনটায় যখন তিনি চরকা কাটিতে বসিতেন তখন খবরের কাগজ পড়িয়া শোনানো হইত।

খাইবার পরে লোহার গামলাটি কোলে লইয়া মুখ ধুইয়া হাতমুখ তোয়ালে দিয়া মুছিয়া গান্ধীজী বিশ্রাম করিতেন। বিশ্রামের সময়ে তিনি শুইয়া থাকিতেন এবং আমরা পায়ে ঘি মালিশ করিয়া দিতাম। পা জানালার সামনে রোদে মেলিয়া তিনি ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেন, আমরা মালিশ করিয়া যাইতাম। গান্ধীজীর পায়ের তলা খুব পরিষ্কার ছিল। ক্রমাগত বগুলাওয়ালা খড়ম পরার ফলে বুড়ো আঙুলের নীচে এবং আঙুলের মাঝখানে ও উপরিভাগে কড়া পড়িয়া গিয়াছিল। বোধ হয় বয়সের জন্য, পা প্রায় ঠাণ্ডা হইয়া থাকিত, অর্থাৎ রক্তচলাচল অপেক্ষাকৃত কম হইত। সেইজন্য ঘি দিয়া মালিশ করার ব্যবস্থা ছিল। মালিশের পর এক খণ্ড ন্যাকড়া দিয়া পরিষ্কার করিয়া মোছানো হইত। প্রথম প্রথম আমি যখন মালিশ করিতাম, তখন একদিন ঘুমাইয়া পড়ার কারণে মোছানোর সময়ে পায়ের আঙুলগুলি টানিয়া ফাঁক করিয়া মুছাই নাই। ফলে সামান্য তেলা-তেলা ভাব থাকিয়া গিয়াছিল। ঘুম ভাঙার পর গান্ধীজী তাহা লক্ষ্য করিয়া ন্যাকড়া দিয়া পরিপাটিভাবে আঙুলের ফাঁক মুছিতে বসিলেন এবং আমাকে বলিলেন, তাঁহার ঘুমের কারণেও যেন আমি পা পরিষ্কার করিয়া মুছিয়া ফেলায় অবহেলা না করি।

বিশ্রামের পর গান্ধীজী চিঠিপত্র লইয়া বসিতেন। যে-সকল চিঠি

নিজের হাতে উত্তর দিবার প্রয়োজন হইত, সেগুলি তিনি লিখিয়া দিলে আমরা নকল রাখিয়া তাহার পর ডাকে দিতাম। অবশ্য প্রত্যেক উত্তরের নকল রাখা হইত না। চিঠি লেখার মধ্যে একটি ব্যাপার ছিল। যে-সব চিঠি প্রত্যহ আসিত, তাহার প্রত্যেক খামের প্রান্ত কাঁচি দিয়া পরিষ্কার করিয়া কাটা হইত। যে খামের কাগজ পুরু, তাহা কাটিয়া আবার ছোট খামে পরিণত করিয়া ঠিকানা লেখা অংশের উপরে সাদা কাগজ মারিয়া আবার ব্যবহারের উপযোগী করা হইত। সঙ্গীদের মধ্যে কাহারও উপরে হয়তো গান্ধীজী ভার দিতেন যেন তিনি প্রত্যহ এইরূপে ছয়খানি খাম মেরামত করিয়া দেন। যে খাম অচল, তাহা কাটিয়া ভিতর পিঠের সাদা অংশ প্রবন্ধ লেখার জন্য বা অন্য কিছু লেখার জন্য গান্ধীজী ব্যবহার করিতেন। টেলিগ্রামের উল্টা পিঠ, কোনও চিঠির শেষে অব্যবহৃত সাদা অংশ—কিছুই নষ্ট হইত না, তাহার প্রত্যেকটির পুরা ব্যবহার করিতেন।

চিঠি লেখার কাজ কিছুক্ষণ করার পর বেলা একটার সময়ে গান্ধীজী ডাবের জল খাইতেন। ডাবের মুখ কাটিয়া কাচের নল দিয়া তিনি জল পান করিতেন, ও তাহার পর ডাবের শাঁস একটি রেকাবিতে দিলে চামচের সাহায্যে তাহা আহার করিতেন। ইহার পরে কিছুক্ষণের জন্য তিনি পেটে, এবং কোন কোন দিন কপাল এবং চোখের উপরেও মাটির প্রলেপ দিয়া শুইয়া থাকিতেন। গান্ধীজীর কপালের শির ফোলাই থাকিত; তাহা ছাড়া তাঁহার পুরাতন আমাশায় (chronic amoebiasis) তো ছিলই। তিনি বলিতেন, রোগ হইয়াছে বলিয়া নয়, রোগ যাহাতে না হয় সেইজন্যই তাঁহার পক্ষে মাটির প্রলেপের প্রয়োজন হইত। শরীর যাহাতে কর্মঠ অবস্থায় থাকে তাহার জন্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

মাটির পটি প্রায় আধ ঘণ্টা থাকিত। সে সময়টুকুতেও কিছু কিছু কাজ করিয়া লইতেন। একদিন জনৈক ফরাসী সাংবাদিক ওই সময়ে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া গেলেন। কিন্তু সচরাচর দেখা-সাক্ষাতের জন্য আরও পরে সময় নির্দিষ্ট ছিল। বেলা তিনটা নাগাদ গান্ধীজী স্তুতা-কাটায় বসিতেন। সে সময়ে সাক্ষাৎ করিবার কেহ না থাকিলে খবরের কাগজ পড়া হইত। তাহার পর হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা সাড়ে চারটা পর্যন্ত বিভিন্ন সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন।

গান্ধীজী একটি ব্যাপারে বড় বিরক্ত হইতেন। ঘরের বাহির হইতে কেহ উঁকি মারিয়া দেখিতেছে, অথবা জানালার খড়খড়ি তুলিয়া তিনি কি করিতেছেন তাহার দিকে চাহিয়া আছে, ইহা জানিতে পারিলে তিনি সে ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিতেন, ভাই, যদি কোনও দরকার থাকে ভিতরে আসিয়া ব'স। এমনও হইয়াছে যে, কেহ কেহ শুধু তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্যই আসিতেন। আমরা তাঁহাদিগকে স্থযোগ বুঝিয়া ঘরের মধ্যে বসাইয়া দিতাম, তাঁহারাও কিছুক্ষণ কর্মরত গান্ধীজীকে দর্শন করিয়া দূর হইতে প্রণাম সারিয়া চলিয়া যাইতেন। গান্ধীজীও হাত তুলিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেন এবং খুশিমনে আপন কাজে লিপ্ত থাকিতেন। এক-আধ দিন স্বীয় কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে অপরের নমস্কার গ্রহণ করেন নাই, সেজন্য কাহাকেও কাহাকেও স্বভাবত বিরক্ত হইতে দেখিয়াছি। আবার গ্রামের মেয়েদের দেখিতাম, তাঁহারা ঘরের বাহির হইতে শুধু দর্শন করিয়া উঠানেই দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া যাইতেন।

শ্রীরামপুরে একদিন আমি নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলাম, এমন সময়ে কয়েকজন গ্রাম্য বন্ধু গান্ধীজীর ঘরের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিতেছিলেন। গান্ধীজী তাঁহাদিগকে হিন্দীতে কিছু বলিয়াছিলেন,

হয়তো ঘরে আসিয়া বসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা গান্ধীজীর কথা বুঝিতে পারেন নাই ও পূর্বের মতই আড়াল হইতে ঝুঁকিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমি আসিলে গান্ধীজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা কি আমার রাসভ-সুলভ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করিতেছে? Are they observing my asinine qualities? বুঝিলাম, গান্ধীজী বিরক্ত হইয়াছেন। আগন্তুক বন্ধুগণকে বুঝাইলাম, তাঁহারা যদি দর্শন করিতে চান, তাহা হইলে ঘরে আসিয়া বসুন। তাঁহারা কথাটা বুঝিয়া ঘরে মাদুরের উপরে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া দণ্ডবৎ করার পর প্রস্থান করিলেন।

চিঠিলেখা

গান্ধীজীর কাছে প্রত্যহ যে-পরিমাণ চিঠি আসিত, তাহার সকলগুলি নিজে পড়িয়া উত্তর দিতে গেলে চব্বিশ ঘণ্টাতেও কুলাইত না। সেই জন্য ব্যবস্থা ছিল যে, শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালা, রাজকুমারী অমৃত কাউর প্রভৃতি নিতান্ত অন্তরঙ্গ মহলের বন্ধুদের চিঠি ছাড়া অপর সকলের চিঠি আমরা প্রথমে পড়িয়া দেখিতাম। কিছু চিঠিতে হয়তো কোনও প্রয়োজনীয় সংবাদ থাকিত, কোনটিতে বা গান্ধীজীর কাজের সমালোচনা থাকিত, কেহ বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উপদেশের আশায় চিঠি লিখিতেন। আমরা এগুলি পড়িয়া সাজাইয়া ফেলিতাম। যে সকল চিঠির প্রাপ্তি-সংবাদ দিলেই যথেষ্ট, অথবা যাঁহারা এমন কোনও সংবাদের জন্য লিখিয়াছেন যাহা আমরাই জানাইতে পারি, সেগুলি আর গান্ধীজীর কাছ পর্যন্ত পৌঁছাইত না। আমরা তাহার যথাযোগ্য উত্তর পাঠাইয়া দিতাম। অবশিষ্ট চিঠির সকল অংশ নয়, ঠিক যে অংশটুকু প্রয়োজনীয়, সেইটুকু গান্ধীজীকে পড়িয়া শোনানো হইত। তিনি শুনিয়া মুখে মুখেই

হয়তো জবাব বলিয়া দিতেন, আমরা তাহার মর্ম টুকিয়া রাখিয়া পরে নিজেদের ভাষায় তাহার উত্তর দিতাম। কিন্তু এমন চিঠি কিছু রোজ আসিত, যাহার উত্তর লেখার পর গান্ধীজীর দ্বারা সংশোধন করাইয়া পাঠানো হইত।

গান্ধীজীর বিছানার পাশে তাঁহার নিজের চিঠিপত্রের একটি তাড়া থাকিত। যে সকল চিঠির উত্তর তিনি নিজহাতে লিখিতেন, সেই চিঠিগুলি ওইখানে স্থান পাইত। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পত্রাবলী, কোনও সহকর্মীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনবোধে লেখা চিঠি, অথবা গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর গান্ধীজী স্বয়ং লিখিতেন। কোনও পত্র হিন্দুস্থানীতে, কোনটি গুজরাটীতে, কোনটি বা ইংরেজী ভাষায় লেখা হইত। কখনও কখনও আমার দ্বারা বাংলায় চিঠি লেখাইয়া পত্রের প্রথমে এবং শেষে বাংলায় নিজহাতে পত্র-প্রেরকের প্রতি সম্বোধন এবং 'বাপুর আশীর্বাদ' লিখিয়া চিঠি সমাপ্ত করিতেন।

গান্ধীজীকে যাঁহারা চিঠি লিখিতেন, তাঁহারা সাদা মনে যাহাই লিখুন না কেন, আমরা অনেক সময়ে তাহার মধ্যে যথেষ্ট উপভোগের সামগ্রী আহরণ করিতাম। এইরূপ তিনখানি চিঠির নকল পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। বলা বাহুল্য যে, এ সকল চিঠির মধ্যে কিছু কিছু আটক করা হইত, অর্থাৎ গান্ধীজীর সকাশে তাহা উপস্থিত করা হইত না।

একবার একটি বালক পোস্টকার্ডে গান্ধীজীকে লিখিয়াছিল যে, সে দারুণ অশান্তি ভোগ করিতেছে, তিনি ভিন্ন কাহার কাছেই বা মনের সান্ত্বনার জন্য যায়? অশান্তির কারণ হইল, সম্মুখে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা। তিনি আশীর্বাদ করুন যেন বালকটি পাস করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে।

Sir,

At first accept my hearty salutation. For a long time I had decided to write something to you. I want to know something from you. I have no peace of mind. Please advise me something by which I may get some sort of peace of mind. You are the regent of God on earth. I think that there is no one to give me some relief except you. I pray you with all my hearts. I am going to appear at the Matriculation examination this year. O Lord, bless me that I may shine in the examination and thus make the face of my country bright.

So far for the present. Hope this to find you quite hale and hearty.

আর একবার গান্ধীজীর নিকটে আশীর্বাদ চাহিয়া এক পত্র আসে, লেখক দীর্ঘদিন পরে পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন এবং সে পুত্র অকস্মাৎ ভারতবিপ্লবের তারিখ ৯ই আগস্ট (১৯৪৬) সালে জন্মগ্রহণ করে। এইজন্যই বিশেষভাবে আশীর্বাদ ভিক্ষা।

To

Mahathma Gandhiji
Savagarakam
Respected and Honoured Babu,

I have extreme pleasure to inform you that after 13 long years after my marriage a son was born to me on *August 9*, the glorious and remembrable day in the History of India. My son is named as "*Subbas Babu.*" I therefore, humbly request you to shower your blessings upon him.

আর একবার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়ে জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত গান্ধীজীকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, যে-কোন উপায়ে হউক প্রথমে কলিকাতার উপদ্রুত অঞ্চলের দুষ্ট লোকগুলিকে একত্র জড়ো করিয়া ফেলিতে হইবে, কারণ সাধারণ লোক শান্তিপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও ইহারা যখন স্বীয় স্বার্থপুষ্টির জন্য গোলমাল বাধায় তখন সাধারণ লোক অবশ

হইয়া পড়ে। দুষ্ট লোকগুলিকে আলাদা করার পর তাহাদের সম্পর্কে তিনি বাংলায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হুবহু নকল করিয়া দিতেছি।—

> **আমার মনে হয় কুখ্যাত অঞ্চলগুলির নাগরিকদের সাহায্যে ইহাদের সন্ধান করিয়া বাহির করা যায়। উভয় সম্প্রদায়ই আত্মরক্ষার জন্ম ইহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে ও প্রয়োজনীয় অভাব-অভিযোগও মিটাইয়াছে। বর্তমানে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের সাহায্যে অবিলম্বে ইহাদের আটক করিয়া রজঃ, তমঃ গুণপ্রধান খাদ্য বন্ধ করিয়া (যথা ডিম, মাংস, মাছ, মসুর ডাউল, বেগুন ও দধি সেবন) সত্ত্বগুণপ্রধান ঘৃত দুগ্ধ প্রভৃতি স্নিগ্ধ পদার্থ ব্যবহারে ইহাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইতে না পারিলে, ইহাদের দ্বারা পুনরায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটিতে পারে।**

এই চিঠিখানির বিষয়ে গান্ধীজী কোন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন কি না তাহা আমার মনে নাই। তবে ইহা সর্বদা লক্ষ্য করিতাম যে, তিনি নিজে কখনও চিঠির মধ্যে ছোট-বড় বিচার করিতেন না। কেবল চিঠিখানির প্রয়োজন শেষ হওয়ামাত্র তাহা পেন্সিল দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কাটিয়া দিতেন ও পিছনের পিঠ সাদা থাকিলে অতি যত্নের সহিত ভবিষ্যতে ব্যবহার করিবার জন্ম তুলিয়া রাখিতেন।

১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহের ফলে যখন গান্ধীজী য়েরোডা জেলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর জনৈক ছাত্র তাঁহাকে এক পত্র লেখেন। যুবকটি ইতিপূর্বে বাংলার বিপ্লবী কর্মীবৃন্দের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, কিন্তু লবণ-সত্যাগ্রহের অন্তর্নিহিত বীরত্বের প্রভাবে তিনি অহিংস পন্থার প্রতি আকৃষ্ট হন। আকর্ষণের প্রথম অবস্থায় তাঁহার বিচারের তীক্ষ্ণতা

বৃদ্ধি পায়, এবং কোন কোন বিষয়ে অতিরিক্ত আত্মসচেতনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ডাক্তারী পড়িতে হইলে জীবহত্যা করিয়া জীবতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে হয়, ইহা সমালোচনাকালে তাঁহার মনে সংশয়ের উদয় হয় যে, ভবিষ্যতে চিকিৎসাবিদ্যার দ্বারা মানবের কল্যাণসাধন করিতে পারিব, ইহা জানিয়াও কি আমরা অবোধ প্রাণীদের হত্যা করিতে পারি ?

যুবকটি স্থির করিলেন, ডাক্তারী পড়া ছাড়িয়া দিবেন। তাঁহার পিতা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। অবশেষে সমস্যার মীমাংসা করিতে না পারিয়া তিনি য়েরোডা জেলে বন্দী গান্ধীজীর নিকটে পত্র লেখেন। গান্ধীজী অতি যত্নের সহিত এরূপ সামান্য এক যুবকের ব্যক্তিগত পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি জানাইলেন যে, যদি যুবকটির মনে কোন সংশয় না থাকে তবে তাঁহার পক্ষে বিবেকের নির্দেশ মানিয়া চলাই উচিত। সেজন্য যে-কোন ক্ষতি স্বীকার করাও কর্তব্য। কিন্তু যদি মনে সংশয় থাকে, তবে পিতামাতার ইচ্ছা বা উপদেশ মান্য করা উচিত।

Dear Friend,

I have carefully gone through your letter. It is difficult to advise you without coming in personal contact with you. But generally I can say that if you have the clear voice of conscience you should follow it at any cost.

If you have the slightest doubt, you should obey your parent's wishes.

Yours sincerely,
M. K. Gandhi.

নোয়াখালি জেলায় শ্রীরামপুর গ্রামে থাকার সময়ে একটি চিঠির কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে। কয়েকদিন ধরিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা চলিতেছিল, আমাদের ক্ষুদ্র শিবিরের

হাওয়াও যেন তাহার ফলে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বহুবিধ চিঠিপত্র আসিত, কোনটি কটু সমালোচনায় ভরা, কোনটিতে বা দাঙ্গার ফলে অতিশয় করুণ মর্মবেদনার কাহিনী লিপিবদ্ধ থাকিত। এরূপ অবস্থার মধ্যে অকস্মাৎ এক যুবকের লেখা দীর্ঘ পত্র গান্ধীজীর নামে আসিয়া পৌছায়। ফুলস্ক্যাপ কাগজের প্রায় ৬।৭ পৃষ্ঠা পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম যে, যুবকটি কোন যুবতীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছেন, বিবাহের ইচ্ছা তীব্র, কিন্তু পথে দুইটি অন্তরায় দেখা দিয়াছে। জাতি এবং কুলের বাধা আছে, তাহা ছাড়া যুবকের পিতা একেবারে বাঁকিয়া বসিয়াছেন। পত্রলেখকের অপটু ইংরেজীতে লেখা কাব্যভাবে পরিপূর্ণ চিঠি পড়িয়া আমার নিজের মনেব গুমোট ভাব অনেকাংশে কাটিয়া গেল, এবং কৌতুকেব বুদ্ধিতে ভাবিলাম, আজ উহা গান্ধীজীকে পডিয়া শুনাইতে হইবে।

গান্ধীজী যখন স্নানের পব আহারে বসিলেন, তখন সেই চিঠিখানি তাঁহার নিকটে উপস্থিত কবিলাম। অবশ্য সকল পাতাগুলি পডি নাই, বাছিয়া বাছিযা পডিতে লাগিলাম। এক জায়গায় যুবকটি লিখিয়াছিলেন, যদি তাঁহার বিবাহ না হয়, তাহা হইলে জীবন বিফল হইয়া যাইবে ইত্যাদি। সমস্ত ভাষাটি মনে নাই, কিন্তু এক জায়গায় লেখা ছিল, "If we are united......" ইত্যাদি। পডার সময়ে ঐখানে পৌছিলে পব গান্ধীজী খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, উস্‌কে বাদ কেয়া লিখা হ্যয়? Divided we fall? আমি একা মনে মনে খুব হাসিয়া যথাসম্ভব গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া বলিলাম, হাঁ, ওই ভাবেরই কথা লিখিয়াছে বটে।

চিঠিখানি পড়া শেষ হইলে আমি উহা সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেই গান্ধীজী বাঁ হাত বাড়াইয়া উহা চাহিয়া লইলেন, এবং আমি

দেখিলাম তিনি সেটিকে যত্নের সঙ্গে নিজের চিঠির তাড়ার মধ্যে রাখিয়া দিলেন। অর্থাৎ রাজকুমারী অমৃত কাউর, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রভৃতির পত্র যেস্থানে থাকিত, এই যুবকটির চিঠিও সেইখানে স্থান পাইল। পরে সেদিন যখন তিনি নিজের লেখা চিঠি ডাকে পাঠাইবার জন্য দিলেন তখন দেখি, সেই চিঠিখানিরও একটি ছোট উত্তর লিখিয়া তিনি খামে ভরিয়া রাখিয়াছেন। পড়িয়া দেখিলাম, তাহাকে উপদেশ দিয়াছেন, জাতিকুলের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছ বলিয়া বিচলিত হইও না। কিন্তু তোমার প্রেম খাঁটি কি না তাহা যাচাই করিয়া লইও। তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা কর। রোজগার করিয়া যখন স্বাবলম্বী হইতে পারিবে, তখনও যদি তোমার প্রেম অমলিন থাকে, তবে বিবাহ করিও। এইরূপ তপশ্চর্যার দ্বারা নিজের প্রেমের শুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া লও।

ছোট্ট চিঠি। গান্ধীজীর ইংরেজী ভাষাটি আমি টুকিয়া রাখি নাই, তাই স্মৃতিপট হইতেই তাহার মর্ম উদ্ধৃত করিলাম। পরে নিজের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি এরূপ চিঠির উত্তর দিলেন কেন? মনে আছে, তিনি বলিয়াছিলেন, যুবকটি কত দুঃখ ও বেদনার আবেগে চিঠি লিখিয়াছে, তাহা তুমি ভাবিয়া দেখ। আমার সামান্য সময় দিয়াও যদি তাহাকে সাহায্য করিতে পারি, তবে সেটুকু আমার করাই উচিত। আমি বিস্মিত হইয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কেন বিভিন্ন দেশের অগণিত মানুষ নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও গান্ধীজীর নিকটে ছুটিয়া আসে। তাহারা এই বিশ্বাসে অগ্রসর হয় যে, এখানে অন্তত একটু আশ্রয় পাইবে; দুঃখের নিবৃত্তি না ঘটিলেও অন্তত সমবেদনার কোমল স্পর্শে হৃদয়ে স্বস্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।

গান্ধীজীর চিঠির ভাষা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইত, এবং সাধারণ চিঠির মধ্যেও তিনি এত সহজে গভীর বিষয় আলোচনা করিতেন যে ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। একবার ত্রিপুরা জেলা হইতে জনেক কর্মী অহিংস উপায়ে আত্মরক্ষা শিক্ষা দিবার জন্য একজন শিক্ষক প্রেরণের জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। উত্তরে গান্ধীজী তাঁহাকে জানান যে, অহিংসপন্থায় আত্মরক্ষার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু যদি হিংসার পথে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা হয়, তবে বর্তমান ক্ষেত্রে তাহা আত্মহত্যার সমতুল্য হইবে। তিনি ১-২-১৯৪৭ তারিখে লিখিয়াছিলেন—

Dear —Babu,

I have no such trainer you ask for. My work lies in the opposite direction. Non-violent defence is the supreme self-defence, being infallible. No trainer is required for the purpose. And in this part of the country, self-defence through training in some kind of arms is suicide. Anyway I am the wrong person to look to for the purpose.

Yours sincerely,
M. K. Gandhi.

কোন কোন চিঠির উত্তর না দিয়া গান্ধীজী হয়তো বা একটি প্রবন্ধ বা বিবৃতিই লিখিয়া বসিতেন। অর্থাৎ সেই প্রশ্নের উত্তর শুধু একজনকে না দিয়া সমগ্র দেশবাসীর নিকট শোনানো তিনি প্রয়োজন অনুভব করিতেন। একবার এইরূপ প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে তিনি অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছাড়িয়া দেন ; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

"Anger is short madness"

I have received two angry telegrams one anonymous from Bombay, the other with the sender's name from Bihar. The purport of both is that my low diet with the threat of fast is wholly uncalled for and that I should not have sought to interrupt

the course of events in Bihar which were all to the good. Bihar's anger was fully justified.

I must dissent from the view expressed by the two correspondents. They are angry. In their madness they have forgotten the true interests of their country and their religion. Madness answered with madness simply deepens it never dispels it. Hinduism will be sorry stuff, if it has to exist on cowardly vengeance that pursues those who can offer no effective resistance.

The correspondents seem to think that B...

"ক্রোধ উন্মত্ততারই লঘু সংস্করণ"

আমার নিকটে দুইটি ক্রোধপূর্ণ টেলিগ্রাম পৌঁছিয়াছে। একটি বোম্বাই হইতে কেহ নাম না দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন; অপরটি বিহার হইতে, তাহাতে প্রেরকের নাম দেওয়া আছে। উভয়েরই মর্ম হইল, আমি বিহারের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অল্পাহার করিবার যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি এবং প্রয়োজন হইলে অনশনের যে ভয় দেখাইয়াছি, তাহার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বিহারে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ঠিকই হইয়াছে, তাহার বিরোধিতা করা আমার পক্ষে উচিত হয় নাই। বিহারের ক্রোধ ও প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং স্বাভাবিক।

পত্রপ্রেরকগণের মত আমি স্বীকার করিতে পারি না। উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। ক্রোধের মত্ততায় তাঁহারা স্বীয় দেশের এবং স্বীয় ধর্মের প্রকৃত মঙ্গলের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। উন্মত্ততার উত্তর উন্মত্ততা দিয়া দিলে মত্ততাকে দূর করা যায় না, তাহার আসন আরও সুদৃঢ় করা হয় মাত্র। যদি হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার জন্ত হত্যার প্রয়োজন হয়, যে হত্যাকাণ্ডে কাপুরুষের প্রতিহিংসার মত এমন মানুষকে মারা যায় যাহারা কার্যকরীভাবে বাধা দিতে অক্ষম, তাহা হইলে সে হিন্দুধর্মে গৌরবের কিছু থাকিবে না।

পত্রপেরকগণ মনে করেন যে বি(হার)……

সর্বশেষে গান্ধীজী টেলিগ্রামে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত ইংরেজী রচনার একটি নমুনা দিয়া বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। ১৯৪৭ সালে মার্চ মাসের ১২ তারিখে তিনি ইংলণ্ডের 'ক্যাভ্যাল্‌কেড' নামক এক পত্রিকার পক্ষ হইতে টেলিগ্রাম পাইয়া স্বীয় রাজনৈতিক মতামত জ্ঞাপন করিয়া যে উত্তর প্রেরণ করেন, তাহার প্রতিলিপি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে পাঠক গান্ধীজীর সংক্ষিপ্ত লেখার সম্যক্ পরিচয় পাইবেন।

Received wire x Regard decision withdrawal British Power as perfectly sound x No organic peace possible without complete independence including withdrawal of British troops and influence from India x Imposed peace disturbed human relations x Hence establishment of organic peace in India inevitably involves senseless strife as in Bengal Bihar and now Punjab x This will end quicker when no party is able to look to British Power for protection x Forced emasculation of a great nation was bound to have this sad result x No doubt much will depend upon Indian wisdom for minimising mischief, x While connection (dissolves ?) honesty and sagacity of British residents in India equally necessary x Must regretfully say that distrust of British statements and promises has gone too deep and that perhaps legitimately x Therefore British dealings have to be strictly frank and above suspicion at this critical moment x Given these conditions expect no difficulty about healthy economic and cultural relations between two countries x Please regard this as my individual opinion. Ends. Gandhi.

দেখাসাক্ষাৎ

দুপুরে বিশ্রাম ও সূতা-কাটার পর গান্ধীজীর সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তার সময় হইত।

গান্ধীজী হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলিলেও লক্ষ্য করিতাম, গুজরাটী

ভাষায় আলাপ করিতে বেশি ভাল বাসিতেন। শ্রীযুক্ত পিয়ারেলাল নায়ার এবং তাঁহার ভগ্নী ডাক্তার সুশীলা নায়ার পঞ্জাবের গুজরাট জেলার অধিবাসী। আভা গান্ধীর নিবাস বাংলা দেশের বরিশাল জেলায়। ইঁহারা সকলেই আপন মাতৃভাষার মত সহজে গুজরাটীতে কথোপকথন করিতে পারিতেন। যাঁহারা গুজরাটী বলিতে পারিতেন না, তাঁহাদের সঙ্গে হিন্দুস্থানীতে কথাবার্তা চলিত।

গান্ধীজী ইদানীং পারতপক্ষে ইংরেজী ব্যবহার করিতেন না। ১৯৪৫ সালের শেষভাগে সোদপুর খাদি-প্রতিষ্ঠানে একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটে। জনৈক পরিচিতা মহিলা গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ইংরেজীতে কথা বলিতে আরম্ভ করেন, তাহার কারণ, পূর্বে যখন তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে অন্যত্র দেখা করিয়াছিলেন, তখন ইংরেজীতেই আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। এবার কিন্তু ইংরেজী বলামাত্র গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইংরেজীতে কেন? মহিলা অপ্রতিভ হইয়া যখন তাঁহাকে পূর্ববারের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, তখন গান্ধীজী বলিলেন, তবে চীনা ভাষাতেই না হয় বল, ইংরেজীতে নয়। সময়ে সময়ে তিনি অপরকে বাংলা ভাষায় কথা বলিতে অনুরোধ করিতেন এবং নিজে তাহার উত্তর হিন্দুস্থানীতে দিয়া যাইতেন। বাংলা কোন শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিলে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন।

কিন্তু গান্ধীজীর কোনও প্রকার গোঁড়ামি আছে বলিয়া আমার মনে হয় নাই। আমি তাঁহার সঙ্গে ঘরোয়া কথাবার্তা হিন্দুস্থানীতেই চালাইতাম, কিন্তু কোনও জটিল বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে ইংরেজীর আশ্রয় লইতাম, গান্ধীজীও ইংরেজীতেই উত্তর দিতেন। একবার মৌন-দিবসে আমাকে হিন্দীতে কোনও নির্দেশ লিখিয়া দেন। তাঁহার লেখা পড়িতে অনেক সময় লাগিতেছে দেখিয়া তিনি বলেন,

এ ভাবে সময়ের অপচয় আমি পছন্দ করি না। এবং সেই হইতে বরাবর আমাকে ইংরেজীতেই লিখিয়া দিতেন। আমাকে চিঠি লিখিতে হইলে ইংরেজী ভাষায় চিঠি লেখা সত্ত্বেও উপরে "চিঃ নির্মল," অর্থাৎ "চিরজীবেষু নির্মল" ও শেষে "বাপুর আশীর্বাদ" কখনও দেবনাগরীতে কখনও বা বাংলায় লিখিয়া দিতেন।

গান্ধীজীর হিন্দী খুব ভাল ছিল না। অর্থাৎ কাশী-এলাহাবাদ অথবা লখ্নৌ-দিল্লীর হিন্দুস্থানী বা উর্দুর মত লালিত্যপূর্ণ ছিল না। তিনি অবশ্য শুদ্ধ হিন্দুস্থানী বলিতেন, তবে তাহা গুজরাটী বাগ্ধারার প্রভাবে ঈষৎ বিকৃত হইয়া যাইত। কিন্তু গান্ধীজী যখন ইংরেজীতে কথা বলিতেন, তখন মনে হইত প্রত্যেক বাক্য এবং প্রত্যেক শব্দটি যেন কুঁদিয়া পরিপাটিভাবে রচিত হইতেছে। অত্যন্ত গুরুতর কোনও বিষয়ে আলোচনাকালে লক্ষ্য করিতাম, তিনি আর শ্রোতার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন না ; অন্য দিকে, সচরাচর নিম্নাভিমুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া উত্তর দিয়া যাইতেন। তাঁহার এইরূপ আত্মস্থ অবস্থার মধ্যেই ইংরেজী বাক্যগুলি শব্দচয়নেব গুণে এবং সুসম বিন্যাসের ফলে যেন ঝলমল করিয়া উঠিত।

যাঁহারা গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন, তাঁহারা নানা কারণে আসিতেন। কেহ হয়তো জটিল রাজনৈতিক প্রশ্ন আলোচনা করিবার জন্য আসিতেন, কেহবা একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আসিয়া উপদেশ প্রার্থনা করিতেন। কখনও কখনও আধ্যাত্মিক বিষয়েও আলোচনা হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে আমার মনে হইতে যে, প্রশ্নকর্তা শুধু একবার গান্ধীজীকে দর্শন এবং তাঁহার সহিত কথা বলিবার লোভেই উপস্থিত হইয়াছেন। আবার এমন মানুষও দেখিয়াছি, যাঁহারা কোনও বিশেষ সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করিতে আসিয়া

আপিসে বসিয়া গান্ধীজীর লেখা কোনও চিঠির নকল হইতে স্বীয় সমাধান পাইয়া গেলেন এবং গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের সময় আর না চাহিয়া শুধু তাঁহাকে দর্শন এবং প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আপিসের উল্লেখ করিলাম বটে, কিন্তু আপিস বলিতে দুই-একখানি স্টীল-ট্রাঙ্ক এবং সঙ্গের দুই-একজন কর্মীকে বুঝাইত। যিনিই দেখা করিতে আসুন না কেন, তিনি প্রথমে আমাদিগকে সংবাদ দিতেন। পরিচিত ব্যক্তি হইলে আমরা সেদিনকার সাক্ষাতের তালিকা দেখিয়া তাঁহার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করিয়া দিতাম। অথবা ব্যস্ততা থাকিলে গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতাম, তিনি কখন সময় দিতে পারিবেন। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে গান্ধীজী কলিকাতায় থাকার সময়ে নির্দেশ দিয়াছিলেন, বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যা ভিন্ন অপর বিষয়ে আলাপ যেন যথাসম্ভব কম করা হয়। জনৈক অধ্যাপক সে সময়ে বয়স্ক-শিক্ষা সম্বন্ধে আলাপের জন্য সময় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর নির্দেশমত আমরা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, তিনি এখন অত্যধিক ব্যস্ত রহিয়াছেন, দিল্লী হইতে ফিরিয়া নোয়াখালি যাইবার পথে অধ্যাপক মহোদয়ের সঙ্গে ভবিষ্যতে সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে সাক্ষাৎ আর হইয়া উঠে নাই। কারণ গান্ধীজী আর দিল্লী হইতে ফিরিতে পারেন নাই।

গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের নিয়ন্ত্রণভার এইরূপে আমাদের উপরে ন্যস্ত ছিল। ইহার জন্য সময়ে সময়ে অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটিত। বেলেঘাটায় অবস্থানকালে একদিন এক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরনে সাধারণ কাপড়, মুখে বসন্তের দাগ, গায়ের রঙ ময়লা এবং মাথায় বাবরি-কাটা চুল। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে তখনই দেখা করিবার জন্য সময় চাহিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

আপনি কোন্ বিষয়ে আলোচনা করিতে চান যদি জানান, বড় ভাল হয়। তিনি উত্তর দিতে অস্বীকার করিলেন, উপরন্তু বলিলেন, প্রয়োজন তাঁহার নহে, প্রয়োজন গান্ধীজীর। বারম্বার প্রশ্ন করিয়াও যখন তাঁহার পরিচয় অথবা উদ্দেশ্য জানা গেল না, তখন আমি সাক্ষাতের জন্য সময় দিতে অস্বীকার করিলাম। ভদ্রলোক বিদায় লইবার পূর্বে একখণ্ড কাগজ চাহিয়া তাহাতে স্বীয় পরিচয় লিখিয়া দিলেন, এবং আমার পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত হইতে তাহা ছিনাইয়া লইয়া হনহন শব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কাগজখানিতে লেখা ছিল, আমিই সেই নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। এই রকম এক-আধ জন রসিক ব্যক্তি মাঝে মাঝে আসিতেন বলিয়া আমাদের নিরবচ্ছিন্ন কর্মস্রোতের মধ্যে ছেদ পড়িত, এবং আমরাও একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতাম।

সাক্ষাতের জন্য সময় বাঁধিয়া দেওয়া হইত। কাহারও জন্য পনর মিনিট, কাহারও আধ ঘণ্টা, কাহারও বা মাত্র পাঁচ মিনিট। সেদিন যাঁহার যাঁহার সহিত দেখা হইবে, তাহার তালিকা পূর্বাহ্নে গান্ধীজীর নিকটে দিয়া আসিতাম। এবং পূর্বে যদি দেখা হইয়া থাকে, সেদিন কি কথা হইয়াছিল, আজ কোন্ বিষয়ে আলোচনা করিতে আসিয়াছেন, সে সকল সংবাদ ঠিক দেখা হইবার পূর্বে যথাসম্ভব আমি জানাইয়া আসিতাম। ইহার ফলে গান্ধীজীর সময় এবং খাটুনি বাঁচিয়া যাইত। সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে গান্ধীজী সাক্ষাৎকারীকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেন। একদিন জনৈক আমেরিকান মহিলা নোয়াখালি ও ত্রিপুরার বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্যে লিপ্ত থাকার সময়ে তাঁহার নিকটে কিছু পরামর্শের জন্য আসিয়াছিলেন। আলোচনা শেষ হইয়া গিয়াছিল, তবু তিনি যেন বিদায় লইতে একটু বিলম্ব করিতেছিলেন। সেই অবস্থায়

তিনি গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আপনার বর্তমান শান্তিপ্রচেষ্টায় কি ভাবে সাহায্য করিতে পারি ? গান্ধীজী উত্তর দিলেন, আমার সময়ের প্রতি মিনিট বাঁচাইয়া।

Q. **How can I help in your mission ?**

A. **By saving me every minute of my time.**

মহিলাটি গান্ধীজীর ইঙ্গিত মানিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পূর্বে গান্ধীজী কথাবার্তায় যতটা কঠিন নিয়মবদ্ধভাবে চলিতেন, ইদানীং, অর্থাৎ তাঁহার শেষ বয়সে, যেন তাহাতে কিছু ঢিলা পড়িয়াছিল। নোয়াখালি ও ত্রিপুরা পরিক্রমার মধ্যে আমরা তখন বোধ হয় চর-শোলাদি গ্রামে উপস্থিত হইয়াছি। আমি একখানি কাপড়ের তাঁবুর মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছিলাম। দুপুরে এক নেপালী বৈরাগী আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল, সে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেই। প্রয়োজন কি, জিজ্ঞাস্য কি, তাহা বলিবে না, অথচ আধ ঘণ্টার কম সময় হইলেও চলিবে না। ব্যক্তিটির মাথায় কিছু ছিট ছিল ; অবশ্য আমাদের অনেকের মাথাতেই থাকে। আমি অনেক দর কষাকষি করিয়া এক মিনিট সময়ে তাহাকে রাজী করাইলাম। সঙ্গে লইয়া গান্ধীজীর কুটিরে তাহাকে উপস্থিত করিলাম। গান্ধীজী তখন কুটিরের দরজায় রোদের দিকে পিঠ করিয়া চরকায় সূতা কাটিতেছিলেন। বৈরাগীকে পৌঁছাইয়া দিয়া বলিলাম, দেখ ভাই, এক মিনিট মাত্র কথা বলিবে, নয়তো তোমায় আছাড় দিব (নতো তুমকো পটক দুঙ্গা)। গান্ধীজী শুনিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি ? আমি বলিলাম, ও কিছু নয়, আপনার শোনার দরকার নাই। ইনি কেবল আপনার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলিবেন, আমি ঘড়ি লইয়া দাঁড়াইয়া আছি। নেপালী বৈরাগীটি তখন গান্ধীজীকে প্রণাম করিয়া

গভীর বেদনাভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্তরে তাঁহার শান্তি নাই, কেমন করিয়া শান্তিলাভ হইবে ? হয়তো সত্যই বেচারীর হৃদয় দুঃখের ভারে পীড়িত হইয়া ছিল, তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। আমিও অবনত হৃদয়ে নিজের শিবিরে ফিরিয়া গেলাম। গান্ধীজী তাহার সহিত এক মিনিট নয়, অনেক মিনিট কথা বলিয়া তবে বিদায় দিলেন।

এ রকম ব্যতিক্রম যে ঘটিত না, তাহা নহে। কিন্তু পূর্বে ইহা বিরল ছিল, ইদানীং হয়তো ইহার মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে সময়ে সময়ে আমাদিগকে রূঢ় হইতে হইত। গান্ধীজী বাংলা দেশ হইতে যখন শেষবার বিদায় লন, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, তখন এক-দিন বেলেঘাটায় জনৈক বিখ্যাত মাড়ওয়ারী পরিবারের সভ্য আমাদের লঙ্ঘন করিয়া সরাসরি গান্ধীজীর ঘরে প্রবেশ করিয়া গেলেন। গান্ধীজী সে সময়ে একটি প্রয়োজনীয় লেখায় ব্যস্ত ছিলেন, সেই দিনই তাহা সমাপ্ত করিয়া ডাকে আহমদাবাদ পাঠাইবার কথা। আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার লেখা স্থগিত হইয়া গিয়াছে এবং আগন্তুক ভদ্রলোক যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা নিতান্ত মামুলী কথা। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মিলন কি করিয়া হইবে, ব্যবসা-বাণিজ্য আবার কবে সহজভাবে চলিবে—এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় তখন গান্ধীজীর ছিল না, অন্তত আমাদের পক্ষে তাহা লইয়া গান্ধীজীকে ব্যস্ত করার অধিকার ছিল না। প্রথমত না জানাইয়া, দ্বিতীয়ত দ্বারপালকে লঙ্ঘন করিয়া ভদ্রলোক সস্ত্রীক ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছিল। অতএব আমি গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার লেখা শেষ করিতে আর কত বিলম্ব হইবে ? তিনি বলিলেন, একটু দেরি হইতে পারে, ইঁহারা কথা বলিতেছেন। আমি বলিলাম, কিন্তু আপনার লেখা তো শেষ করিতেই হইবে। ইঁহারা

না হয় পাঁচ মিনিট আলোচনা করুন, আমি ঘড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছি। পাঁচ মিনিট পরে তিনি আগন্তুককে বলিলেন, হাঁ, এইবার ভাই উঠিয়া যাও। এ তো আর বসিতে দিবে না। অর্থাৎ আমার দ্বারপালত্বের অধিকারে তিনি নিজেও হস্তক্ষেপ করিতেন না। শ্রীযুক্ত ঠক্কর বাপা অথবা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দের কথা স্বতন্ত্র; অপর কেহ সরাসরি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি সময় নির্ধারণের জন্য সেরূপ ব্যক্তিকে দ্বারপালের নিকটে পাঠাইয়া দিতেন।

গান্ধীজীর আলাপ-আলোচনার সময়ে সম্ভব হইলে আমরা উপস্থিত থাকিতাম এবং প্রশ্নোত্তরের সারাংশ লিখিয়া রাখিতাম। পরে তাহা লিখিয়া গান্ধীজীর কাছে সংশোধন করাইয়া লওয়া হইত। কোন রিপোর্ট প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ হইত, কোনটি বা প্রকাশিত হইত না।

গান্ধীজীর আলোচনার মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহার মধ্যে আমাদের সকলেরই শিক্ষণীয় বস্তু ছিল। তিনি প্রশ্নকর্তার কথা একমনে শুনিয়া যাইতেন, মাঝখানে কোন প্রশ্ন বা মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না। প্রশ্নকর্তা থামিলে হয়তো সময়ে সময়ে কোনও কথা পরিষ্কার করার জন্য দুই-একটি প্রশ্ন করিতেন। কিন্তু তাহা শুধু প্রশ্নটিকে স্পষ্টতর করিবার জন্য; তিনি প্রতিবাদ বা সংশোধনাত্মক কিছুই বলিতেন না। বক্তার বক্তব্য সমাপ্ত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, শেষ হইয়াছে কি না? বক্তা 'হাঁ' বলিলে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেন, তবে এবার কি আমি আরম্ভ করিতে পারি?—**Have you finished? Then, may I begin?** এরূপ ঘটনা আমি একাধিক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দুই-এক ক্ষেত্রে, যেখানে হয়তো বক্তার দোষে তাঁহার প্রশ্নই স্পষ্ট হয় নাই, অথবা তিনি শুধু প্রশ্নের পরিবর্তে নিজের মতামত প্রকাশ করিয়া সে বিষয়ে গান্ধীজীর মন্তব্য শুনিতে চান, সেরূপ অস্পষ্ট অবস্থায়

গান্ধীজীকে এমনও বলিতে শুনিয়াছি, আচ্ছা, আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি ; দেখুন তো আমি আপনার বক্তব্য ঠিকমত বুঝিয়াছি কি না ?—**Let me repeat what you have said and see if I have understood you rightly**। তিনি কখনও ইঙ্গিতে বা আভাসেও অপর পক্ষকে বেকায়দায় ফেলিবার চেষ্টা করিতেন না, বরং তাঁহাকে স্বীয় পক্ষ সমর্থনের ব্যাপারে সাহায্যই করিতেন।

আরও আশ্চর্যের বিষয় হইল এই যে, নিজের প্রতিকূল কোন সত্যের আভাস পাইলে শুধু যে স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না, তাহা নয় ; বরং আগ্রহভরে তাহা স্বীকার করিবার জন্যই যেন ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। একদিন মনে আছে, অত্যন্ত গুরুতর রাজনৈতিক কোনও প্রশ্নেব আলোচনাকালে জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি গান্ধীজীকে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কি মনে করেন, হৃদয়ের কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে ? গান্ধীজী বিন্দুমাত্র দ্বিধা না কবিয়া উত্তর দিলেন, অতি তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে আমি মনে করি, হৃদয়ের পরিবর্তন সাধিত হয় নাই ; কিন্তু আমার মনে হয়, কর্মধারাব পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

> *Q.* **Do you think there has been a change of heart ?**
> *A.* **Through bitter experience I feel there has been no change of heart, but I think there has been a change of plan.**

এ জাতীয় সত্য স্বীকার করিতে তাঁহার কখনও বিলম্ব ঘটিতে দেখি নাই। এবং এই কারণেই তিনি চিঠিপত্রের মধ্যে যেখানেই সমালোচনামূলক মন্তব্য পাইতেন, তাহা অতি যত্নসহকারে পড়িয়া স্বীয় মতের সত্যতা-অসত্যতা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেন। বাইবেলে বর্ণিত

"Agree readily with thine enemy"—এই নীতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিতেন।

কিন্তু ইহার ফলে কেহ যেন মনে না করেন যে, গান্ধীজীকে স্বীয় আসন হইতে বিচ্যুত করা সহজ ছিল। বস্তুত তাঁহার বিশেষত্ব ছিল যে, নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অথবা বিভিন্ন বিরুদ্ধ ভাব-স্রোতের প্লাবনের মধ্যেও তিনি পাথরের মত অটল থাকিতে পারিতেন। আমার বক্তব্য হইল, স্বীয় সত্যে অটল থাকিয়াও সেই সত্যকে যাচাই করিবার ব্যাপারে তাঁহার কখনও শিথিলতা অবলোকন করি নাই। প্রতিপক্ষের সকল কথা শুনিয়া, সকল সমালোচনার যথাযথ মূল্য দিয়া তিনি অবশেষে বলিতেন, আমি আপনার বক্তব্য বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু আমি যে মূলত অন্য ধাতুতে গড়া।—**I understand your point of view ; but you see, I am made in a different way**।

ব্যক্তিগতভাবে আমার নিকট সকলের চেয়ে আশ্চর্য লাগিত, তিনি আলোচনার মধ্যে বিরুদ্ধ মতকে একবারও খণ্ডনের চেষ্টা করিতেন না। প্রতিপক্ষের যুক্তির মধ্যে দুর্বলতা থাকিলে তাহার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ না করিয়া বরং নিজের মতের সপক্ষে যুক্তির পর যুক্তি মেলিয়া ধরিতেন। ফলে মতানৈক্য শেষ পর্যন্ত বজায় থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে কোনও তিক্ততার সঞ্চার হইত না।

একবার, তিনি নোয়াখালিতে নিজেকে আবদ্ধ রাখিতেছেন কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলিয়াছিলেন (২৬-১১-১৯৪৬), অনেক বীজ ছড়াইয়া বোনার চেয়ে একটি বীজ হইতে যাহাতে ভালভাবে চারা বাহির হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করাই প্রয়োজন। ২৭-২-১৯৪৭ তারিখে হাইমচর নামক গ্রামে বাংলার পূর্বতন প্রধান

মন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব তাঁহাকে বলেন, আপনি ভারতের এক প্রান্তে হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের চিত্তকে শোধিত করিয়া শান্তির বুনিয়াদ রচনা করিতেছেন, তাহার চেয়ে দিল্লীতে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বোঝাপড়ার চেষ্টা করুন, নয়তো সারা ভারত রক্তের ধারায় প্লাবিত হইয়া যাইবে। উত্তরে গান্ধীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার কাজ দিল্লীতে নয়। এখানে জনসাধারণের চিত্তে তিনি ঐক্যের যে বীজ বপন করিতেছেন, সে বৃক্ষে ফল ধরিলে সারা ভারতের জনগণের মধ্যে তাহার প্রভাব বিকীর্ণ হইবে। জনসাধারণ পরিবর্তিত হইলে তাহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ নেতৃবর্গের মধ্যেও ঐক্যসাধন সম্ভব হইয়া উঠিবে। দিল্লীর কাজ তাঁহার নহে; কিন্তু যদি দিল্লীবাসীরা প্রয়োজন অনুভব করেন, তবে তিনি পরামর্শ দিবার জন্য সেখানে যাইতে পারেন। কিন্তু আসলে তাঁহার কাজ অন্যত্র, সাধারণ মানুষের মধ্যে। গান্ধীজীর যুক্তি শুনিয়াও হক সাহেব যখন পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন তখন তিনি বলিলেন, আমি যে অন্য ধাতুতে গড়া—I am made differently। অপর পক্ষকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি বরং নিজের পথে আরও ভালভাবে কি করিয়া চলিতে পারেন, অবিরত তাহারই সন্ধান করিতেন।

গান্ধীজীর আলাপ-আলোচনার বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমার অনেক সময়ে নারদীয় ভক্তিসূত্রের অন্তর্গত একটি সূত্রের কথা স্মরণ হইত :

ওঁ তস্মিন্নন্যতা তদ্বিরোধীষূদাসীনতা চ ॥ ২।৯

অর্থাৎ যে আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া সাধক চলেন, তাহা ত্যাগ না করিয়া, বিরোধী আশ্রয়সমূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব পোষণ করিলে তবেই সাধনায় দৃঢ়তা জন্মে, এবং সাধনায় দৃঢ়তা জন্মিলে ভাবেরও গভীরতা বৃদ্ধি পায়।

গান্ধীজীর মধ্যে এই আচরণ বহু বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

সান্ধ্য প্রার্থনা

নোয়াখালিতে গান্ধীজী বিকাল সাড়ে চারটার সময়ে দিনের শেষ আহারে বসিতেন। খাওয়া শেষ করিতে আধ ঘণ্টার মত সময় লাগিত; কারণ তাহার পরেই সান্ধ্য প্রার্থনার সময়। এই প্রার্থনা সমবেতভাবে হইত, এবং গান্ধীজী জনসাধারণের নিকটে যাহা-কিছু বলিতে চাহিতেন, ইদানীং প্রার্থনার অন্তে বক্তৃতার সময়ে তাহা বলিতেন।

শৃঙ্খলা

গান্ধীজী নিজে যেমন নিয়ম ও শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতেন তেমনই সকলে সকল কাজকর্ম সুশৃঙ্খলভাবে করুক, ইহাও চাহিতেন। প্রার্থনা-সভায় অন্যান্য শিক্ষার মধ্যে এই শিক্ষাটি তিনি বিশেষভাবে দিবার চেষ্টা করিতেন। ১৯৪৫ সালের শেষভাগে যখন তিনি মেদিনীপুর জেলা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন তখন সেখানকার সম্পূর্ণ সংযত, অথচ বিপুল জনতার আচরণে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আসামে যাইবার সময়ে জনতা কিছু বিশৃঙ্খল ছিল, কিন্তু ফিরিবার পথে তিনি শৃঙ্খলা দেখিয়া খুশি হইয়াছিলেন। বিপদ ঘটিয়াছিল আমাদের বিহার প্রদেশে। সেখানকার গ্রামবাসীগণ যখন গান্ধীজীকে দর্শন করিতে আসিত, যখন তাঁহাকে স্পর্শ করিবার লোভে সমবেত জনতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রাণপণ প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করিয়া বন্যার মত ঠেলিয়া আসিত, তখন গান্ধীজীকে ভিড়ের চাপ হইতে বাঁচাইবার চেষ্টায় আমরা সকলে প্রাণান্ত হইতাম। ভক্ত বিহারী গ্রামবাসী তাঁহাকে স্পর্শ করিবেই, আর আমরাও কিছুতে তাহাদের আগাইতে দিব না। সামনের জনতা যদিবা কথা মানিত, কিন্তু পিছনের স্পর্শনেচ্ছু জনতার চাপে তাহারাও বিকল হইয়া পড়িত।

একবার পাটনা শহরে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে এই রকম ঘটনা ঘটে। তাহার উপরে জনতা আবার "মহাত্মা গান্ধীজীকি জয়" এমন উচ্চৈঃস্বরে করিতে লাগিল যে, গান্ধীজী দুই কানে দুই আঙুল দিয়া চাপিয়া হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরদিন প্রস্তাব করা হইল, প্রার্থনা-সভা নিকটে হইলেও তাঁহাকে মোটরে লইয়া যাওয়া হইবে। গান্ধীজী শুধু যে রাজী হইলেন না তাহা নয়, বরং কংগ্রেসকর্মীগণ যাহাতে জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সুশৃঙ্খল ব্যবহাব করিতে শেখান, তাহারই জন্য বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। সুখের বিষয়, স্বর্গগত অধ্যাপক অবদুল বারি এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের সারাদিনব্যাপী চেষ্টার ফলে সান্ধ্য প্রার্থনায় যাইবার সময়ে গান্ধীজীকে সেদিন অথবা ভবিষ্যতে বাঁকিপুর ময়দানে আর কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। সকলে অত্যন্ত সংযতভাবে সম্ভ্রমসহকারে নীরবে পথের দুই পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। কিন্তু পাটনা শহর ছাড়িয়া যেদিন হইতে প্রত্যহ এক এক নূতন গ্রামে প্রার্থনা-সভার ব্যবস্থা হইল, সেদিন হইতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা আবার প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

এরূপ অবস্থায় আমি গান্ধীজীর দৃষ্টি এবং মুখের ভাব সময়ে সময়ে নিরীক্ষণ করিতাম। ভাবোন্মত্ত উচ্ছ্বাসবহুল জনতা তাঁহার নিকটে সুপরিচিত ছিল। মানুষমাত্রের প্রতি তাঁহার যে প্রেম ছিল, তাহার ফলে তিনি রাগ করিতেন না। কেবল যত্নসহকারে জনতাকে সংযত ব্যবহার শেখানোর জন্য বারংবার চেষ্টা করিতেন। প্রার্থনা-সভায় শৃঙ্খলার অভাব ঘটিলে অথবা জনতা নীরব হইতে বিলম্ব হইলে তিনি রামধুন গানের আদেশ দিতেন। লাউড স্পীকারের মারফৎ রামধুন গান শুনিয়া জনতা তালে তালে হাততালি দিতে আরম্ভ করিত এবং

অল্পক্ষণের মধ্যেই সকল অব্যবস্থা দূর হইয়া যাইত। এরূপ ঘটনার কিছুক্ষণ পরে গান্ধীজী সকলকে নীরব হইতে বলিতেন। রামধূন বন্ধ হওয়ার পরেই সভাও মন্ত্রস্পৃষ্টবৎ নীরব হইয়া যাইত এবং তখন প্রার্থনার কাজ যথারীতি আরম্ভ হইত।

এ বিষয়ে তিনি বহুদিন পূর্বে ইয়ং ইণ্ডিয়া এবং হরিজনে যাহা লিখিয়াছিলেন, পাঠকের অবগতির জন্য তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

সঙ্গীতের মর্ম হইল ছন্দ, শৃঙ্খলা। মন্ত্রস্পর্শের মত ইহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। ইহা ক্ষণেকের মধ্যে শান্ত করিয়া দেয়। দুঃখের বিষয়, আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ যেমন অল্পসংখ্যক লোকের আয়ত্তে রহিয়াছে, সঙ্গীতবিদ্যাও তেমনই অল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। ইহা সর্বজনের অধিকারে আসে নাই। আমার যদি বয়স্কাউট অথবা সেবা-সমিতিগুলির উপরে কোনও প্রভাব থাকিত, তবে আমি সমবেতভাবে এবং সঠিক সুরে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বাধ্যতামূলক করিয়া দিতাম। এবং এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কংগ্রেস এবং কনফারেন্সে বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞদের নিমন্ত্রণ করিয়া বৃহৎ জনতাকে সমবেত সঙ্গীত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতাম।

Music means rhythm, order. Its effect is electrical. It immediately soothes. Unfortunately like our *shastras*, music has been the prerogative of the few. It has never become nationalized in the modern sense. If I had any influence with volunteer boy scouts and Seva Samiti organizations, I would make compulsory a proper singing in company of national song. And to that end I should have great musicians attending every Congress or Conference and teaching mass music.—*Selections from Gandhi*, no. 754.

পণ্ডিত খারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাপ্রসূত মত হইল এই যে, সঙ্গীতকে প্রাথমিক শিক্ষার একটি অঙ্গহিসাবে পরিণত করা উচিত। আমি

সর্বান্তঃকরণে এ প্রস্তাব সমর্থন করি। হাতের নৈপুণ্য অভ্যাস করা যেমন প্রয়োজন, গলার সুর নিয়ন্ত্রণ করিতে শেখা তেমনই আবশ্যক। ড্রিল, হাতের কাজ, ছবি আঁকা ও সঙ্গীত একসঙ্গে শিখাইলে তবেই ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা সম্যক্ বিকাশ লাভ করিতে পারে, তাহারাও তখন লেখাপড়ার প্রতি সত্যকার আকর্ষণ অনুভব করিবে।

ইহা স্বীকার করি যে, উপরোক্ত নীতি অনুসরণ করিলে চলতি শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে বিপ্লবসাধন করিতে হইবে। যদি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নাগরিকের জীবন দৃঢ় বুনিয়াদের উপরে গড়িয়া তুলিবার বাসনা থাকে, তবে শিক্ষার মধ্যে উপরোক্ত চারটি অঙ্গ আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলি পরিদর্শন করিলেই আমরা আলস্য, বিশৃঙ্খলা এবং ছন্দোবিহীন কথাবার্তার আশ্চর্যরকম নমুনা দেখিতে পাইব।

In Pandit Khare's opinion, based upon wide experience, music should form part of the syllabus of primary education. I heartily endorse the proposition. The modulation of the voice is as necessary as the training of the hand. Physical drill, handicrafts, drawing and music should go hand in hand in order to draw the best out of the boys and girls and create in them a real interest in their tuition.

That this means a revolution in the system of training is admitted. If the future citizens of the state are to build a sure foundation for life's work, these four things are necessary. One has only to visit any primary school to have a striking demonstration of slovenliness, disorderliness and discordant speech. —*Selections from Gandhi*, no. 755.

জনতার অসংযম দূর করিয়া শৃঙ্খলা বিস্তার করিবার জন্য গান্ধীজী আর একটি উপায় অবলম্বন করিতেন। তাঁহার উপদেশ অনুসারে

আমরা মাইক্রোফোনের সাহায্যে বলিতাম যে, সভাস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি যেন অপর কাহাকেও শান্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া নিজে নীরব এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকেন। কারণ অনেক সময়ে পরস্পরকে বকিয়া বা শান্ত করিবার চেষ্টায় পৃথকভাবে আমরা এমন কাণ্ড করিয়া বসি যে, তাহার সমবেত ফলস্বরূপ বিপুল গোলমালের সৃষ্টি হয়। এইরূপ উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী অনেক সময়ে ডান হাতের তর্জনী তুলিয়া নিজের ঠোঁটের উপর চাপিয়া প্রত্যেককে নীরব হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেন। ইহার ফলে জনতা অল্পক্ষণের মধ্যে শান্ত হইয়া যাইত।

সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনায় অনেকে যোগ দিতেন। প্রার্থনায় প্রথমে উপনিষদ হইতে শ্লোকমালা উচ্চারিত হইলে কোর-আন শরীফ এবং জেন্দ-আবেস্তা হইতে কয়েকটি শ্লোক পড়া হইত। এগুলি ভোরের প্রার্থনায় পড়া হইত না। এই সময়ে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণসমূহও পাঠ করা হইত। বাংলা দেশে থাকিবার সময়ে নিয়মিতভাবে প্রার্থনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কোনও গান গাওয়া হইত। কদাচিৎ অন্য কাহারও গান গাওয়া হইত। প্রার্থনার অন্তে রামধুনের ব্যবস্থা ছিল। রামধুনের সময়ে গান্ধীজী চাদরের ভিতরে হাতে তালি দিতেন। কখনও বা কোলের উপরে হাত রাখিয়া বাহিরেই তালি বাজাইতেন। তালি দিবার সময়ে কয়েকবার লক্ষ্য করিয়াছি, তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জনতার দিকে তাকাইয়া সকলের হাত ঠিক তালে তালে পড়িতেছে কি না তাহা পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। সুর কাটিয়া গেলে অথবা তালের অসঙ্গতি ঘটিলে তিনি প্রার্থনান্তিক ভাষণে সকলকে সতর্ক করিয়া বলিতেন, যদি কাহারও পক্ষে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গান গাওয়া বা তালে তালে তালি দেওয়া সম্ভব না

হয়, তবে তিনি যেন নিজে নীরব থাকেন, বিরুদ্ধ সুর এবং তালের দ্বারা অপরের ছন্দ ভঙ্গ না করেন।

রামধূন সমাপ্ত হইলে গান্ধীজী হিন্দুস্থানী ভাষায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিতেন। এমন বিষয় ছিল না যাহা লইয়া তিনি এই সময়ে আলোচনা না করিতেন। কোনও দিন হয়তো ভারত-ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচনা করিতেন, কখনও পরমতসহিষ্ণুতার বিষয়ে উপদেশ দিতেন, কখনও বা স্থানীয় অবস্থা অনুসারে পুকুর পরিষ্কার, রাস্তা নির্মাণের সহজ উপায় সম্বন্ধে, অথবা পথে ঘাটে থুতু ফেলা হইতে আরম্ভ করিয়া মাঠ-গুলিকে যেভাবে আমরা অপরিষ্কার করিয়া রাখি তাহার উল্লেখ করিয়া ভদ্র ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের বিষয়ে উপদেশ দিতেন। এক-আধদিন আবার নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেন। যাঁহারা প্রার্থনা-সভায় কেবল ঈশ্বর বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারের আলোচনা শুনিতে আসিতেন, তাঁহারা গান্ধীজীর রাজনৈতিক ভাষণে সন্তুষ্ট হইতেন না। এরূপ অভিযোগেব উত্তরে গান্ধীজী জানাইয়াছিলেন যে, জীবনের কোন অংশ অথবা কোন সমস্যাই তাঁহার নিকট প্রার্থনা-সভায় আলোচনার বহিভূর্ত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, তাঁহার নিকট ধর্ম জীবনের কোনও বিশেষ অংশে গণ্ডীবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। জীবনকে সর্বতোভাবে উধ্বর্মুখী করাই ধর্মের লক্ষ্য। অতএব যে ধর্ম দৈনন্দিন জীবনকে আরও উন্নত করিতে পাবে না, তাহাকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন।

এ বিষয়ে তাঁহার পুরাতন লেখা হইতে কোন কোন উক্তি উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

> আধ্যাত্মিক শাসন যে জীবনের কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে, ইহা আমি স্বীকার করি না। বরং ইহা প্রতি

দিবসের সাধারণ কাজের মধ্য দিয়া প্রতিভাত হয়, ইহাই আমি স্বীকার করি। অতএব ইহা মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

আমার জীবনে সব কিছুই তোমাদের পরীক্ষা করা উচিত। আমি কি ভাবে থাকি, খাই, বসি, কথা বলি, আমার সমগ্র আচরণই বা কি রকম, তাহা নিরীক্ষণ করা উচিত। ইহাদের সমষ্টি করিলে যাহা দাঁড়ায়, তাহা হইতে আমার ধর্মের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কোন কোন বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন যে, রাজনীতি অথবা সাংসারিক ব্যাপারে সত্য ও অহিংসার স্থান নাই। আমি এই মত স্বীকার করিতে পারি নাই। ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য আমার সত্য ও অহিংসার প্রয়োজন নাই। প্রতিদিনের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্যই আমি সত্য ও অহিংসার প্রয়োগ নিরবচ্ছিন্নভাবে করিয়া আসিতেছি।

সত্য এবং অহিংসা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আচরণের মধ্যে আবদ্ধ রাখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বহুজন, এমন কি সমগ্র জাতি সমবেত-ভাবে যাহাতে এই দুইটিকে আশ্রয় করিয়া চলে, ইহার জন্য আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। অন্তত ইহাই হইল আমার আদর্শ। এই আদর্শ উপলব্ধি করার চেষ্টায় আমি বাঁচিয়া আছি এবং প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত আছি। আমার বিশ্বাসের শক্তি আছে বলিয়া আমি প্রতিনিয়ত নূতন নূতন সত্যের সন্ধান লাভ করিয়া থাকি। অহিংসা মানুষের আত্মার স্বভাব, অতএব জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাহার অভ্যাস করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। যদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ সম্ভব না হয়, তবে উহার কোনও কার্যকরী মূল্য নাই।

সাংসারিক বিষয়ে অহিংসার প্রয়োগ করিতে পারিলে তবেই ইহার সম্যক্ মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ইহার দ্বারাই ধরণীকে স্বর্গভূমিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। পরলোক বলিয়া কিছু নাই। সকল ভুবনই এক ভুবনের অন্তর্গত, 'এখান' ও 'সেখান' বলিয়া কোনও ব্যবধান রচনা করা চলে না। বৈজ্ঞানিক জীন্স প্রমাণ করিয়াছেন যে, দূরতম নক্ষত্রকে লইয়া যে বিশ্বভুবন রহিয়াছে, যাহার সীমা আমরা সর্বোত্তম দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের দ্বারাও ধরিতে পারি না, তাহা একটি অণুর অন্তরের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। এই কারণেই আমি মনে করি, অহিংসার ব্যবহার যদি শুধু গুহাশ্রয়ী সাধকগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, অথবা পরলোকে কোনও সুবিধাজনক আসন লাভ করিবার উদ্দেশে পুণ্য অর্জন করিবার জন্য ইহার প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে অন্যায় হইবে। যে পুণ্য জীবনের প্রতি ক্ষেত্রকে প্রভাবান্বিত না করে, তাহার কোনও প্রয়োজন নাই।

I do not believe that the spiritual law works on a field of its own. On the contrary, it expresses itself only through the ordinary activities of life. It thus affects the economic, the social and the political fields.—*Selections from Gandhi*, no. 82.

You must watch my life, how I live, eat, sit, talk, behave in general. The sum total of all those in me is my religion. —*Harijan*, 22-9-46, p. 321.

Some friends have told me that truth and non-violence have no place in politics and worldly affairs. I do not agree. I have no use for them as a means of individual salvation. Their introduction and application in everyday life has been my experiment all along.—*Selections from Gandhi*, no. 127.

We have to make truth and non-violence, not matters for mere individual practice, but for practice by groups and communities and nations. That at any rate is my dream. I shall live and die in trying to realize it. My faith helps me to discover new truths every day. *Ahimsa* is the attribute of the soul, and

therefore, to be practised by everybody in all the affairs of life. If it cannot be practised in all departments, it has no practical value.—*ibid*, no. 128.

To practise non-violence in mundane matters is to know its true value. It is to bring heaven upon earth. There is no such thing as the other world. All worlds are one. There is no 'here' and no 'there'. As Jeans has demonstrated, the whole universe including the most distant stars, invisible even through the most powerful telescope in the world, is compressed in an atom. I hold it therefore to be wrong to limit the use of non-violence to cave-dwellers and for acquiring merit for a favoured position in the other world. All virtue ceases to have use if it serves no purpose in every walk of life.—*ibid*, no. 631.

গান্ধীজীর জীবনে ইহাই বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর দৈনন্দিন ঘটনাকেও শুদ্ধতার মহিমায় মণ্ডিত করিতেন। তাঁহার প্রার্থনার মধ্যেও সেই জন্য ব্যক্তি ও সমাজের প্রাত্যহিক জীবনকে আরও দোষশূন্য, সমগ্র মানবকুলের কল্যাণের আধাররূপে পরিণত করিবার নিরলস চেষ্টা থাকিত। সকল ভূমিকে তিনি যজ্ঞভূমি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ইহাকেই তিনি দিব্যজীবনের সাধনা, অথবা সংসারকে ঈশ্বরের আসনে রূপান্তরিত করিবার, অথবা তাঁহার ভাষায়, রামরাজ্যে পরিণত করিবার সাধনা বলিয়া মনে করিতেন।

বাংলা দেশে গান্ধীজীর ভাষণ শেষ হইলে বাংলা ভাষায় তাহা অনুবাদ করার রীতি ছিল। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ই এ কাজ যোগ্য অধিকারী-রূপে সম্পাদন করিতেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমাকে সে কাজ করিতে হইত। অনুবাদের সময়ে গান্ধীজী বাংলা বই পড়িতেন অথবা হাতের লেখা অভ্যাস করিতেন। গান্ধীজী যখন নোয়াখালি পরিক্রমায় বাহির হন, সে সময়কে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক

ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। বহু গুরুতর সমস্যার বিষয়ে তাঁহাকে তখন আলোচনা করিতে হইত এবং কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষও অনবরত তাঁহার নিকট পরামর্শের জন্য উপস্থিত হইতেন। যে সকল আলোচনা বা সমস্যা রাজনৈতিক মহলে চলিত, গান্ধীজী প্রত্যহ প্রার্থনা-সভায় তাহারই কোন না কোন অংশ উত্থাপন করিয়া, যুক্তিসহকারে নিজের মতামত জ্ঞাপন করিতেন এবং জনসাধারণকে এক বিশেষ রাজনৈতিক ধারায় পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেন। বহুদিনের সাধনার ফলে গান্ধীজীর ভাষা অত্যন্ত সোজা, কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য তাঁহার বক্তৃতার অনুলিপি করা কঠিন ছিল। সংবাদপত্রের রিপোর্টে সামান্য এদিক-ওদিক হইলেই অর্থের মারাত্মক প্রভেদ দাঁড়াইয়া যাইত। এই দুই কারণে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসের শেষভাগে আমি প্রস্তাব করি, তিনি নিজেই যেন সংবাদপত্রের জন্য রিপোর্ট লিখিয়া দেন। ফলে তিনি ঐ সময় হইতে প্রার্থনান্তিক ভাষণের অনুবাদের সময়ে বাংলা পড়া ছাড়িয়া ইংরেজী ভাষায় স্বীয় বক্তৃতার সারমর্ম লিখিয়া দিতেন। আমরা রাত্রে শিবিরে ফিরিয়া সেই লেখা টাইপ করিয়া দিতাম এবং পরদিন প্রভাতে সংবাদপত্রে তাহাই প্রকাশিত হইত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। আমরা যখন শ্রীরামপুর গ্রামে ছিলাম, তখন একদিন (১২-১২-১৯৪৬ তারিখে) তিনি ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকা পরিচালনার বিষয়ে বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, লেখকদের তিনি একটি মাত্র উপদেশ দিতেন, আরও সংক্ষেপ—আরও সংক্ষেপ কর। তাহার ফলে চিন্তার স্পষ্টতা বৃদ্ধি পাইত এবং অপরের পক্ষেও গ্রহণ করা আরও সহজ হইয়া যাইত। "Boil down". "Boil down". "Boil it down again".

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার সময়ে সময়ে মনে হইত, গান্ধীজী এত সংক্ষেপে ও সূত্রাকারে লিখিতেন যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে, অর্থাৎ যিনি একান্ত মনোনিবেশ সহকারে না পড়েন, তাঁহার পক্ষে গান্ধীজীর বক্তব্য কিছু কিছু ছাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ঘটিত। যাঁহারা একাগ্র চিন্তা করেন, তাঁহাদের ভাষাও যখন সমতালে চলিতে থাকে, তখন এরূপ দুর্ঘটনা হয়তো অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়।

বাংলা অনুবাদ শেষ হওয়ার পর সভার কাজ সমাপ্ত হইত। কোন কোন দিন দেখা যাইত, রিপোর্ট লেখা শেষ হয় নাই, কিছু বাকি থাকিয়া গিয়াছে। কখনও বা গান্ধীজী সন্ধ্যায় শেষাংশ লিখিয়া দিতেন। কখনও বলিয়া যাইতেন, আমরা লিখিয়া লইতাম; কখনও বা নিতান্ত সামান্য অংশ বাকি থাকিলে আমাদের উপর সেটুকু পূরণ করিবার ভার দিতেন। কলিকাতায় প্রার্থনা-সভা হইতে মোটরে ফিরিবার সময়ে অসমাপ্ত রিপোর্ট মোটরের ভিতরের আলোতেও কোন কোন দিন লিখিয়া ফেলিতেন। চলন্ত গাড়ির মধ্যে লেখা বলিয়া লেখা অত্যন্ত কাঁপিয়া যাইত। তবু অক্ষর খুব বড থাকায় এবং আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল বলিয়া আমরা পড়িয়া লইতাম।

সন্ধ্যা ও রাত্রি

প্রার্থনার পরে গান্ধীজীর সান্ধ্যভ্রমণের সময় ছিল। সে সময়ে প্রত্যহ তিনি আধ ঘণ্টার উপর বেড়াইতেন। নোয়াখালি ত্রিপুরা, এমন কি বিহারে থাকার সময়ে বাঁকিপুরে ডাক্তার সৈয়দ মহমুদের গঙ্গাতীরবর্তী বাসভবনে তাঁহার কোনও অসুবিধা ঘটে নাই। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্থানাভাবের জন্য, অথবা জনতার চাপে

তাঁহার বেড়ানো কঠিন হইত। সেরূপ অবস্থায়, অথবা হয়তো বৃষ্টি-বাদলের জন্য, তিনি ঘরের মধ্যেই এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আধ ঘণ্টা পায়চারি করিয়া লইতেন।

সান্ধ্যভ্রমণ শেষ হইলে গান্ধীজী ঘরে ফিরিয়া যাইতেন এবং শয্যাগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত চিঠিপত্র অথবা হরিজনের জন্য প্রবন্ধ লিখিতেন। কখনও কখনও কাকা কালেলকার, ঠক্কর বাপা প্রভৃতির মত অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের সহিত আলাপ-আলোচনাও করিতেন। নোয়াখালিতে রাত্রি সাড়ে নয়টার সময়ে গান্ধীজী শুইয়া পড়িতেন। শুইবার পূর্বে তাঁহার শৌচের অভ্যাস ছিল। তিনি যখন শৌচাগারে প্রবেশ করিতেন, আমরা ততক্ষণে তাঁহার বিছানা পাতিয়া মশারি খাটাইয়া রাখিতাম।

সকল কাজের মত গান্ধীজীর বিছানা পাতাও একেবারে নিখুঁত-ভাবে করিতে হইত। গান্ধীজী শীতের সময়ে লেপের পরিবর্তে দুই-তিন খানি সাদা রঙের কাশ্মীরী তুষ ব্যবহার করিতেন। পাতিবার জন্য তোষক ও চাদর এবং মাথার বালিশ ছিল। তুষগুলিকে পর পর বিছাইয়া, আন্দাজে প্রায় গান্ধীজীর বুক পর্যন্ত মেলিয়া বিছানার সঙ্গে, ধারে গুঁজিয়া দেওয়া হইত। অবশিষ্ট অংশটুকু বুকের কাছাকাছি পরিপাটীভাবে ভাঁজ করিয়া রাখা হইত। গান্ধীজী শৌচাগার হইতে আসিয়া মাথার বালিশের সামনে বসিতেন এবং ঢাকা অংশে নিজের পা মেলিয়া শুইয়া পড়িতেন, তাহার পরে বুকের নিকটে জড়ো করা অংশ গায়ে ঢাকা দিয়া ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিতেন।

নিকটে রাত্রে ব্যবহারের জন্য প্রস্রাবদান থাকিত এবং ভোরে প্রয়োজনের জন্য দাঁতন জল প্রভৃতি সাজাইয়া রাখা হইত। মাথার বালিশের নীচে ট্যাঁকঘড়িতে অ্যালার্মের জন্য দম দিয়া, খাটের নিকটে একটি লণ্ঠনে খুব অল্প আলোর ব্যবস্থা করিয়া আমি অন্য ঘরে

চলিয়া যাইতাম। পরশুরাম গান্ধীজীর কাছে অপর একটি খাটে শুইতেন।

গান্ধীজী আমাকেও তাঁহার সঙ্গে এক ঘরে শুইতে বলিতেন। প্রথম প্রথম সেইরূপই করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রায়ই বেশি কাজের জন্য আমাকে রাত জাগিতে হইত, তাহা ছাড়া একা শোওয়া আমি ভালও বাসিতাম। সেইজন্য শ্রীরামপুর হইতেই অন্য ঘরে শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত পিয়ারেলাল, কাকা কালেলকার, ঠক্কর বাপা প্রভৃতি সহকর্মীগণ যখন সাক্ষাতের জন্য আসিতেন, তখন গান্ধীজীর ঘরেই তাঁহাদের শুইবার ব্যবস্থা হইত। মনু, আভা, ডাক্তার সুশীলা নায়ার, শ্রীমতী সুশীলা পাঙ্গ, শ্রীমতী প্রেমাবেন কণ্টক প্রভৃতি যখন আসিতেন, তখন কেহ মাটিতে বিছানা করিয়া শুইতেন, কেহ বা গান্ধীজীর পাশে, একই খাটে মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িতেন। এক-একদিন দুই-তিন জন একত্র হইলে কেহ হয়তো গান্ধীজীর পায়ের তলায় ফাঁকা জায়গায় কুঁকড়ি মারিয়া শুইতেন, কেহ তাঁহার পাশে, হয়তো বা গরম আলোয়ানে ভাগ বসাইয়া শুইয়া পড়িতেন।

শুইবার পরেই গান্ধীজী ঘুমাইয়া পড়িতেন। কিন্তু নোয়াখালিতে তাঁহার মনের উপর দিয়া যে প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছিল, তাহার ফলে কোনও কোনও দিন গভীর রাত্রে তাঁহাকে জাগিয়া চিঠি লিখিতেও দেখিয়াছি। ৮-২-১৯৪৭ তারিখে রাত ২টার সময়ে উঠিয়া তিনি স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে শরণার্থী-শিবির বন্ধ করার বিরুদ্ধে এইরূপে একখানি পত্র লেখেন। আবার ৩০-১২-১৯৪৬ তারিখে রাত ২-৪৫ মিনিটে উঠিয়া আচার্য কৃপালানির জন্য কংগ্রেসের পরিচালনা সম্পর্কে নির্দেশ রচনা করিয়াছিলেন। ২০-১২-১৯৪৬ তারিখে কল্যাণীয়া মনু গান্ধী গান্ধীজীর কাছে শুইয়াছিলেন। তিনি পূর্বদিন আসিয়া শ্রীরামপুর

শিবিরে পৌঁছাইয়াছিলেন। গান্ধীজী গভীর রাত্রে জাগিয়া তাহাকে বিবিধ বিষয়ে উপদেশ দিতে থাকেন। গান্ধীজীর জীবনে নোয়াখালি হইতে যে সম্পূর্ণ নূতন এক অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বলেন। এবং যদি মনু নূতন জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, পূর্বের জীবনকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে কি কি করিতে হইবে সে-বিষয়ে উপদেশ দেন। নরনারী যেখানে প্রাণের ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, সেখানে নূতন নারীর কি কর্তব্য, সে কেমনভাবে চলিবে, ফিরিবে, কি পোশাক পরিবে, কর্মী-নারীদের বিবাহ করা উচিত কি না, বিবাহিতা নারীদের কেমন ভাবে চলা উচিত, এ সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দীর্ঘ উপদেশ দিতে থাকেন। কারণ, ভোর চারিটার সময়ে তাঁহার ঘরে গিয়া বুঝিতে পারিলাম, তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া মনুর সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছেন। অবশ্য মনুকে গান্ধীজী যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম আমাকে স্বয়ং পরে কথা-প্রসঙ্গে জানাইয়াছিলেন।

এরূপ আকস্মিক ব্যতিক্রম না ঘটিলে গান্ধীজী গভীর নিদ্রার পর ঘড়িতে নির্ধারিত সময়ে ঘণ্টা বাজিবার সামান্য পূর্বেই জাগিয়া উঠিতেন এবং মশারির বাহিরে হাত বাড়াইয়া লণ্ঠনের পলিতা উস্‌কাইয়া নিত্য-কর্মের আয়োজন করিতেন।

ব্রহ্মচর্য

রাত্রে গান্ধীজীর কাছে মধ্যে মধ্যে মেয়েরা শুইতেন, ইহা শেষ অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার অনাবৃত দেহে তেল মাখাইবার সময়ে অসঙ্কোচে পিয়ারেলালজী অথবা অপর কেহ আসিয়া প্রয়োজনীয় পরামর্শ লইয়া যাইতেন, তাহাও বলা হইয়াছে। তেল মাখানোর ভার পুরুষদের উপরে ন্যস্ত থাকিলেও কোন বিশেষ কারণবশত সাময়িক-ভাবে মেয়েরা মাখাইলেও তিনি আপত্তি করিতেন না, ইহারও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

একদিন স্নান সারিবার পর গান্ধীজী শুকনা খদ্দরের তোয়ালে জড়াইয়া উঠান পার হইয়া ঘরে যাইবেন, এমন সময়ে দেখা গেল, ভুল করিয়া বড় তোয়ালের পরিবর্তে একখানি ছোট তোয়ালে আনা হইয়াছে। আমি দৌড়াইয়া সেটি আনিতে যাইতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, গান্ধীজী সেই ছোট তোয়ালেখানি কোন মতে জড়াইয়া স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। পরে ঘরে ঢুকিয়া তিনি তোয়ালেটি ফেলিয়া দিলেন এবং হাতে কাপড় দিবার পর পরিতে আরম্ভ করিলেন। উঠানে এবং ঘরের পাশে কয়েকজন ভদ্রলোক তখন সাক্ষাতের অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। তাঁহাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও গান্ধীজীর আচরণে কোনও বিকারের ভাব লক্ষ্য করিলাম না। দেহ সম্বন্ধে তাঁহার বোধ, আমাদের প্রচলিত বোধের মত ছিল না, ইহা বলাই আমার উদ্দেশ্য।

পূর্বের ইতিহাস

কিন্তু আশ্রমের নারী-কর্মীদের সম্পর্কে গান্ধীজীর ব্যবহার লইয়া নোয়াখালিতে আসিবার বহু বৎসর পূর্বে একবার বিরুদ্ধ সমালোচনা

হইয়াছিল। তিনি বেড়াইতে যাইবার সময়ে মেয়েদের কাঁধে ভর দিয়া চলিতেন বলিয়া বোধ হয় সংবাদপত্রে কোনও বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। কারণ ২১-৯-১৯৩৫ তারিখের হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজী A Renunciation নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কোনও এক যুবক তাহার মহিলা-বন্ধুর সঙ্গে যেরূপ অবাধ বা অসংযত মেলামেশা করিতেছিলেন, সে বিষয়ে শুনিয়া গান্ধীজী চিন্তান্বিত হইয়া উক্ত প্রবন্ধে মেয়েদের কাঁধে ভর দিয়া বেড়ানোর অভ্যাস পবিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন। গান্ধীজী লিখিয়াছিলেন—

আমার বর্তমান অভ্যাসের মধ্যে, অথবা তাহার ফলস্বরূপ, আমার মনের মধ্যে কখনও কোন অপবিত্র ভাব জাগে নাই। আমার আচরণের মধ্যে কখনও কোন গোপনতা নাই। পিতার নিকট কন্যা যেভাবে স্বচ্ছন্দে মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারে, যে সকল বালিকা আমার তত্ত্বাবধানে আমার শাসন মানিয়া চলে, তাহারাও সেইরূপ বিশ্বাসে আমার নিকটে সব বিষয় ব্যক্ত করিতে পাবে। এরূপ বিশ্বাসের পাত্র হওয়া অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। যে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিবার জন্য নারীজাতির স্পর্শের বিরুদ্ধে দেওয়াল গাঁথিয়া দিতে হয়, অন্যথা সামান্য আঘাতেই যাহা ভাঙিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে, সেরূপ ব্রহ্মচর্যে আমি বিশ্বাস করি না।

আমার আচরণ যতই নির্দোষ হউক না কেন, উল্লিখিত যুবকের আচরণের বিষয় আমি যখন জানিতে পারিলাম, তখন আমার পক্ষে মেয়েদের কাঁধে ভর দিয়া বেড়ানোর অভ্যাস পরিত্যাগ করা কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলাম। আমার প্রত্যেক কর্ম সহস্র সহস্র নরনারী যত্নের সহিত বিচার করিয়া থাকেন। কারণ, আমি জীবনের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষায় লিপ্ত আছি, তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন সতর্কতার প্রয়োজন।

অতএব যে কর্মকে সমর্থন করিবার জন্য যুক্তিতর্কের সহায়তার প্রয়োজন হইতে পারে, সেরূপ কর্ম না করাই ভাল। আমার আচরণ যে কেহ ইচ্ছা করিলেই অনুকরণ করিতে পারিবে, এরূপ কল্পনা আমি কখনও করি নাই। যুবকটির সম্পর্কিত ঘটনা আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে।

Never has an impure thought entered my being during or owing to the practice. My act has always been open. I believe that my act was that of a parent and had enabled the numerous girls under my guidance and wardship to give their confidences which perhaps no one else has enjoyed in the same measure. Whilst I do not believe in a brahmacharya which ever requires a wall of protection against the touch of the opposite sex and will fail if exposed to the least temptation, I am not unaware oj the dangers attendant upon the freedom I have taken.

The discovery quoted by me has therefore, prompted me to renounce the practice, however pure it may have been in itself. Every act of mine is scrutinized by thousands of men and women, as I am conducting an experiment requiring ceaseless vigilance. I must avoid doing things which may require a reasoned defence. My example was never meant to be followed by all and sundry. The young man's case has come upon me as a warning —*Harijan*, 21-9-35, p. 252.

এইরূপে অপরকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি স্বীয় পুরাতন অভ্যাস পরিহার করিলেন এবং প্রয়োজন হইলে দীর্ঘ যষ্টি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইদানীং গান্ধীজীর পক্ষে খাড়াভাবে চলিবার অসুবিধা হইত, কারণ বয়সের জন্য তিনি একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। ১৯৩৫ সাল হইতে এই নিয়ম কতদিন অনুসৃত হইয়াছিল জানি না; কারণ যখন জেলখানা হইতে মুক্তিলাভ করার পর ১৯৪৫ সালের শেষভাগে তিনি সোদপুরে আসেন, তখন লাঠির পরিবর্তে কাহারও

কাঁধে ভর দিয়াই আবার আমরা তাঁহাকে বেড়াইতে দেখি। কোনদিন সতীশবাবুর দৌহিত্রী, আবার কোনদিন বা দিদিকে সরাইয়া দিয়া তাহার ছোট্ট ভাইটি ঐ স্থান অধিকার করিত। গান্ধীজীকে সেদিন বালখিল্য ঋষিকে অবলম্বন করিয়া অন্তত কিছুক্ষণ বেড়াইতে হইত; কারণ তাহাকে স্বস্থানচ্যুত করা অপরের সাধ্যের বহির্ভূত ছিল।

মেয়েদের সম্পর্কে ব্যবহারের যে সমালোচনার সূচনা আমরা ১৯৩৫ সালে দেখিতে পাই, ১৯৩৯ সালে তাহা আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। এবারে কিন্তু তাঁহার নৈতিক চরিত্রের বিরুদ্ধেই আক্রমণ পরিচালিত হয়। পূর্বের মত এবারেও গান্ধীজী ৪-১১-১৯৩৯ তারিখের হরিজন পত্রিকায় My Life নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে মন্তব্য প্রকাশ করেন—

> আমার ধারণা, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অভিযান আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এই জাতীয় অভিযোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যখন কংগ্রেসের কার্যতালিকায় অস্পৃশ্যতা বর্জন স্থান পাইল এবং জনসভায় প্রচারকার্য চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও সভা-সমিতির মধ্যে এবং আশ্রমে হরিজনদের স্থান দেওয়ার জন্য জিদ ধরিলাম, তখন হইতে এইরূপ আক্রমণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে আমার কাজে বন্ধুর মত সহায়তা করিতেন, এমন কয়েকজন সনাতনী সেই সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিন্দাবাদ আরম্ভ করেন। পরে, অত্যন্ত উচ্চপদস্থ জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক ঐ সুরে সুর মেলান। মেয়েদের সহিত আমার অসঙ্কোচ আচরণকে তিনি আমার 'সাধুতা'র পরিবর্তে 'পাপবুদ্ধি'র প্রমাণ বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন।
>
> যদি স্ত্রীজাতির প্রতি আমার যৌন আকর্ষণই থাকিত, তাহা

হইলে, এ বয়সেও বহু-বিবাহ করিবার মত সাহসের অভাব আমার হইত না। গোপনই হউক অথবা প্রকাশ্যই হউক, আমি অবাধ প্রেমে বিশ্বাস করি না। প্রকাশ্য এবং অবাধ প্রেমকে আমি কুকুরের প্রেম বলিয়া গণ্য করি। গোপন প্রেম তদুপরি কাপুরুষতাদোষে দুষ্ট।

The charges to my knowledge began with my active campaign against untouchability. This was when it was included in the Congress programme and I began to address crowds on the subject and insisted on having Harijans at meetings and in the Ashram. It was then that some Sanatanists, who used to help and befriend me, broke with me and began a campaign of vilification. Later, a very high-placed Englishman joined the chorus. He picked out my freedom with women and showed up my 'saintliness' as sinfulness.

If I were sexually attracted towards women, I have courage enough, even at this time of life, to become a polygamist. I do not believe in free love—secret or open. Free open love I have looked upon as dog's love. Secret love is besides cowardly.—*Harijan*, 4-11-39, p. 325.

এসব লেখা আমি পূর্বেই পড়িয়াছিলাম। কিন্তু নোয়াখালিতে যেদিন হইতে ঘনিষ্ঠভাবে গান্ধীজীর সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য ঘটিল, সেই দিন হইতে ব্যক্তিগতভাবে যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহাই পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব। নোয়াখালিতে গান্ধীজীর সন্নিকটে স্থান পাইবার পর আমি তাঁহার অন্তরঙ্গগোষ্ঠীর প্রকৃত পরিচয় লাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম। অনেকের চরিত্র গান্ধীজীর সঙ্গলাভের গুণে কি অপূর্বভাবে বিকাশলাভ করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া বিস্মিত এবং মুগ্ধ হইয়াছিলাম। গান্ধীজীর প্রতি কত গভীর প্রেম এবং ভক্তি ডাক্তার সুশীলা নায়ার অথবা অমতুস সলাম, কিংবা কানু ও আভা গান্ধী এবং পিয়ারেলালজীর মধ্যে প্রকাশ পাইত তাহা বলিতে পারি না।

গান্ধীজী অমতুস সলামকে একটি গ্রামে কাজের জন্য বসাইয়া রাখিয়াছেন, সেখানে দেখা দিতেছেন না, এমন অবস্থায় অমতুস সলাম স্বধর্মাবলম্বী মুসলমানগণের হৃদয় পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে হেলায় আমরণ অনশনব্রত গ্রহণ করিলেন। বিশ দিন উপবাস যাইতে না যাইতে স্থানীয় মুসলমান-সমাজ ব্যস্ত হইয়া তাঁহার দাবি মিটাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; উপরন্তু গান্ধীজীও পরিক্রমার মধ্যে সেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত অমতুস সলামের মিলন দেখিয়া আমার মনে হইল, যেন ক্ষণিকের মধ্যে গান্ধীজীর মঙ্গলস্পর্শে অমতুস সলামের সকল তাপ জুড়াইয়া গেল; শবরী রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। রাওয়ালপিণ্ডির সন্নিকটে ভারতের মুক্তি-লাভের পর যখন নরমেধযজ্ঞ চলিতেছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষ ঝঞ্ঝাবিতাড়িত শুষ্কপত্রের মত যখন ভারতবর্ষের অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছিল, তখন গান্ধীজী সেই মরণযজ্ঞে আত্মাহুতি দিবার জন্য, এবং সম্ভব হইলে আঘাতজীর্ণ শরণার্থীদিগকে সেবা করিবার জন্য ডাক্তার সুশীলা নায়ারকে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কি প্রচণ্ড বীর্য লইয়াই যে এই রমণী আটক জেলায় ওয়া নামক স্থানে শরণার্থী-শিবিরের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও জানি। এবং এইরূপ পরিণতি শুধু গান্ধীজীর পার্শ্ববিহারীগণের মধ্যেই নয়, একলব্যের মত যাহারা দূরে থাকিয়া তাঁহার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও দেখিয়াছি বলিয়া গান্ধীজীর প্রতি প্রেম মানুষকে কোন্ উচ্চশিখরে উন্নীত করিতে পারে তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

ইহা সত্ত্বেও যখন গান্ধীজীর বিরুদ্ধে সমালোচনা হইত, আমি তাহার বিষয়ে এবং তাহার কারণের সম্বন্ধে চিন্তা করিতাম বটে; কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার কোন প্রয়োজন আমার পক্ষ হইতে ঘটে নাই, কারণ

এ বিষয়ে আলোচনা আমার নিকটে নিতান্ত অবান্তর বলিয়া মনে হইত। কিন্তু ঘটনাচক্রে গান্ধীজী স্বয়ং একদিন এ বিষয়ে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন তাঁহার নিকটে সবিনয়ে আমার মতামত নিবেদন করিলাম। সে কথা পরে বলিব। কিন্তু তাহার পূর্বে নোয়াখালিতে অবস্থানকালে যে-সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা উত্থিত হইয়াছিল, সেগুলির উল্লেখ করিব। এবং প্রত্যেক বিরুদ্ধ মতের সম্পর্কে গান্ধীজী স্বয়ং কি মনে করিতেন, তাহা যথাসাধ্য ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিব। এইরূপে গান্ধীজীর ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে মতামত, এবং তাঁহার চরিত্রের সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হইবে।

প্রথম সমালোচনা

বন্ধুবর পরশুরাম নোয়াখালিতে আসিবার পূর্বে মাত্র দুই বৎসর গান্ধীজীর নিকটে ছিলেন। যে সমালোচনার বিষয়ে হরিজন পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি আংশিকভাবে তাহার পুনরাবৃত্তি করেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, গান্ধীজী জাতির শীর্ষে যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন, কেহ যদি সঙ্গতভাবে অথবা অসঙ্গতভাবেই হউক, তাঁহার নিন্দা করে, তবে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিবেন না। দ্বিতীয়ত, যাঁহারা গান্ধীজীর পার্শ্বে অবস্থান করেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিষয়ে চিন্তা করিয়া, শিবিরের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার মধ্যে তিনি কোন কোন পরিবর্তনের দাবি জানান, এবং ইহাও বলেন যে, যদি উল্লিখিত দাবি পূরণ করা সম্ভব না হয়, তবে কাহাকেও কোন কারণ না জানাইয়া তিনি স্বেচ্ছায় এবং নীরবে নোয়াখালি পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন।

পরশুরামের পত্রের উত্তরে গান্ধীজী যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

তোমার চিঠি আমি বিশেষ যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছি। আমি রাত্রি ৩টায় উহা আরম্ভ করিয়া ৪টায় শেষ করিলাম।...

তোমার দাবিগুলি আমি পূরণ করিতে পারি না।...

আমার মতামত তুমি জান, এবং যেখানে আদর্শের সংঘাত ঘটিতেছে, এবং তুমি নিজেই ছুটি লইতে চাও, সে ক্ষেত্রে তোমার পক্ষে আজই যাওয়া উচিত। এরূপ আচরণ সম্মানজনক এবং সত্যসম্মত হইবে। তোমার সাহস এবং অকপট আচরণ আমার ভাল লাগিয়াছে।

তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার সর্বদাই ঔৎসুক্য থাকিবে এবং যখনই লেখার ইচ্ছা হইবে তুমি চিঠি লিখিলে আমি খুশি হইব। ইহাও আমি তোমাকে বলিতে চাই যে আমার আচরণে বা আমার সহচরগণের আচরণের মধ্যে তুমি যদি কোন দোষ লক্ষ্য করিয়া থাক তবে তাহা প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা তোমার রহিল। এ কথা বলা বাহুল্য যে খরচের জন্ত যাহা আবশ্যক, সে অর্থ তুমি লইও।

2-1-1947

I have read your letter with great care. I began at 3 A. M. finished reading it at 4 A.M....

I cannot concede your demands....

Since such is my opinion and there is a conflict of ideals and you yourself wish to be relieved. you are at liberty to leave me to-day. That will be honourable and truthful. I like your frankness and boldness....

I shall always be interested in your future and shall be glad to hear from you when you feel like writing to me. Finally let me tell you that you are at liberty to publish whatever wrong

you have noticed in me and my surroundings. Needless to say you can take what money you need to cover your expenses,

Yours Bapu.

এই ঘটনার পর গান্ধীজী অন্তরঙ্গ মিত্রগণকে স্বীয় আচরণের সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া পাঠান। যাঁহাদের নিকটে তিনি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনের নাম দিতেছি। রাজকুমারী অমৃত কাউর, ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আচার্য কৃপালানি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি। অধ্যাপক হরেস আলেকজণ্ডারের সহিত তিনি এ বিষয়ে মৌখিকভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া আমিষাপাড়া নামক গ্রামে ১-২-১৯৪৭ তারিখে প্রার্থনাসভাতেও এই বিষয়ে জনসাধারণের সমালোচনা আহ্বান করেন; কিন্তু আমি ভাষণের সে অংশ অবান্তর বিবেচনা করায় অনুবাদকালে প্রকাশ করি নাই। গান্ধীজী এই কারণে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া আমাকে সে সময়ে লিখিয়াছিলেন (৭-২-১৯৪৭)—

আমি বিশেষভাবে ইহা কামনা করি যে, ব্যক্তিগত অথবা সর্বজনীন অহিংস আচরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির চরিত্র এবং তাহার সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা তুমি যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে পার। মানুষের চরিত্রের বিচারকালে তুমি উদারতার পরিচয় দিতে পার, কিন্তু ব্যক্তির জীবনে উপযুক্ত আচরণ হইতে বিচ্যুতিকে (ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া) উপেক্ষা করা চলে না।

I do wish you could see that in non-violent conduct whether individual or universal, there is an indissoluble connection between private, personal life and public You may be as generous and charitable as you like in judging men, but you cannot overlook private deflections from the right conduct.

যে-সকল পত্র গান্ধীজী সে সময়ে লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত মনোভাবের পরিচয় দিতেছি। ১-২-১৯৪৭ তারিখে লেখা একখানি চিঠিতে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার পর তিনি লেখেন—

> এইবার আমি আপনার নিকট একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি। একটি বালিকা (১৯ বৎসর), সম্পর্কে আমার পৌত্রী হয়, আমার সহিত এক বিছানায় শোয়। কোনও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নয়, কিন্তু (আমার মতে) সঙ্গত নৈতিক প্রয়োজনের বশে সে আমার নিকটে শুইয়া থাকে। তাহার বিশ্বাস, সে কামদোষমুক্ত ; উপরন্তু আমিও ব্রহ্মচর্য ব্রতে অভ্যস্ত। আপনি কি এই আচরণের মধ্যে কোনও দোষ দেখিতে পান ? এরূপ প্রশ্ন করার কারণ হইল, আমার অন্তরঙ্গ সহচরগণ ইহাকে সমর্থনের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করি।
>
> **And now I put before you a poser. A young girl (19) who is in the place of grand-daughter to me by relation shares the same bed with me, not for any animal satisfaction but for (to me) valid moral reasons. She claims to be free from the passion that a girl of her age generally has and I claim to be a practised *brahmachari*. Do you see anything bad or unjustifiable in this juxtaposition ? I ask the question because some of my intimate associates hold it to be wholly unjustifiable and even a breach of *brahmacharya*. I hold a totally opposite view.**

মনুকে কেন কাছে লইয়া শুইতেন, তাহাকে কি শিক্ষা দিতেন, তাহার বিষয়ে বিশদভাবে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষভাগে বর্ণনা করা হইয়াছে। গান্ধীজী ভারতবর্ষের নারীজাতির নিকট মুক্তির এক নূতন বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন। নারী কর্মীগণকে তিনি নিরলসভাবে সেই শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেন। সারাদিনের মধ্যে, মনুকে শিক্ষা

দিবার অবসর তাঁহার কম মিলিত বলিয়া ভোররাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া তাহাকে নূতন নীতি এবং জীবনযাত্রার নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিতেন।

গান্ধীজী এমন কথাও হয়তো মনে ভাবিতেন যে, যদি তাঁহার নিজের মন সম্পূর্ণ কামদোষশূন্য না হয়, তবে মেয়েদের মধ্যে কাজ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়, উচিতও নয়। মনের অগোচরে যদি কামনার লেশমাত্র রহিয়া যায়, তবে তাহার ফলে সহকর্মী নারীদের মনের মধ্যে নিশ্চয়ই কামনার মলিন ছায়া প্রতিবিম্বিত হইবে। যাহারা তাঁহার নিকটে শয়ন করিত, তাহাদের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি বুঝিবার চেষ্টা করিতেন, তাঁহার নিজের মনের মধ্যে কোথাও কামনার কণামাত্র অবশিষ্ট আছে কি না! অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যব্রত পালনে ইহা তাঁহার নিকটে আত্মপরীক্ষার স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় আপত্তি

কিন্তু গান্ধীজীর পক্ষে এরূপ আত্মপরীক্ষার আদৌ প্রয়োজন আছে কি না, কোন কোন সহকর্মী এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। বন্ধুবর পরশুরাম গান্ধীজীকে দোষী মনে করেন নাই ; অপরের উপরে তাঁহার আচরণের প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় যে আপত্তির বিষয়ে বর্তমানে আলোচনা করিতেছি, তাহা অন্যবিধ ছিল। ১৯৩৯ সালে লেখা My Life নামক প্রবন্ধে গান্ধীজী তাহার বিষয়ে পূর্বেই সমালোচনা করিয়াছিলেন।

অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ আপত্তি জানাইয়া চিঠিপত্র তো লিখিতেনই। দুই জন এ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য সুদূর বোম্বাই প্রদেশ হইতে

পূর্বাঞ্চলে আগমন পর্যন্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যুক্তির সারাংশ এইরূপ ছিল।

জৈন তীর্থঙ্করগণ শরীরের সর্ববিধ সংস্কারকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিযা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তাঁহারা শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা কাম-ক্রোধ প্রভৃতি সর্ববিধ বন্ধনপাশকে ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা শুনিতে পাই। অতএব সেরূপ ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক সর্ববিধ অনুশাসন সম্পর্কে উদাসীন হইয়া চলেন, তবে আমাদের মত মানুষের মানদণ্ড লইয়া তাঁহাদিগকে বিচার করা চলে না। তাঁহারা প্রস্তরবৎ হইয়া যান; পরমযোগী হওয়ার ফলে সকলের প্রণম্য হন। কিন্তু গান্ধীজী সেরূপ নহেন। সে ক্ষেত্রে তাঁহার পক্ষে মহাযোগীগণের আচরণ অনুকরণ করিবার অধিকার কোথায়? আত্মপরীক্ষার প্রয়োজনই বা কি? মানুষের সংস্কারের বীজ যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার মধ্যে নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া না যাইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার পক্ষে এমন ব্যবহার করা উচিত নয় যাহা আমাদের দেশের অন্ধবিশ্বাসী জনসাধারণের পক্ষে ভ্রান্তির কারণ হইতে পারে। কে বলিতে পারে, তাঁহার বর্তমান আচরণের পিছনে কোনও অদগ্ধ সংস্কারের বীজ বর্তমান আছে কি না?

এই সমালোচনার উত্তরে গান্ধীজী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সবটুকু আমার জানা নাই। কেবল ইহা জানিতাম, তিনি একটি প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। তাঁহার পক্ষে আত্মপরীক্ষার প্রয়োজন আছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর অন্তরঙ্গ বন্ধু দুইজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। গান্ধীজীর সহিত আলোচনার পর আমি তাঁহাদের নিকট এই সংবাদ শুনিয়াছিলাম।

আদর্শ নেতার পক্ষে কিরূপ আচরণ যোগ্য হয়, সমাজে পুরুষ এবং

নারীর মধ্যে মেলামেশায় কোন্‌খানে সীমানির্দেশ করা উচিত, যখন অন্তরঙ্গগণের সহিত এইরূপ নানা বিষয় লইয়া আলোচনা চলিতেছিল, তখন গান্ধীজী পূর্বের মত 'হরিজন' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ, কোন সমস্যাকেই তিনি সাধারণের সম্মুখে আলোচনার বহির্ভূত বলিয়া বিবেচনা করিতেন না।

যে প্রবন্ধ ১৯৪৭ সালে তিনি নূতন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে স্বীয় আদর্শের উচ্চতা, অথচ তাহার উদারতার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল, আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্যব্রতের সহিত তাহার প্রভেদের বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিলেন।

> ব্রহ্মচর্য কি? যে জীবনচর্যা আমাদিগকে ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বরের অভিমুখে লইয়া যায়, তাহাই ব্রহ্মচর্য। পতঞ্জলি যোগের অঙ্গস্বরূপ পঞ্চ যমের নির্দেশ দিয়াছেন। ইহার কোনটিকে অপরগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অভ্যাস করা যায় না। বর্তমান যুগে পঞ্চ যমকে বিস্তারিত করিয়া একাদশ মহাব্রতে পরিণত করা হইয়াছে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, শরীরশ্রম, অস্বাদ, অভয়, সর্ব ধর্মে সমানত্ব, স্বদেশী এবং অস্পৃশ্যতা বর্জন।
>
> আমাদের মনে রাখা উচিত যে, যমসমূহের মধ্যে গুরুত্ব অনুসারে কোন তারতম্য করা যায় না। একটিকে লঙ্ঘন করিলে অপরগুলিকেও লঙ্ঘন করা হয়। আমরা বোধ হয় সচরাচর এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকি যে, সত্য অথবা অহিংসা হইতে বিচ্যুতিকে মার্জনা করা যায়। অস্তেয় এবং অপরিগ্রহের বিষয়ে কেহ কদাচিৎ উল্লেখ করিয়া থাকেন; সেগুলি যে পালন করা আবশ্যক, ইহা অধিকাংশ লোকে স্বীকার করেন না বলিলেই চলে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য হইতে স্খলনের সন্দেহ হওয়ামাত্র মানুষ ক্রুদ্ধ হয়, বা তদপেক্ষা

গর্হিত কিছু করে। যে সমাজে বিভিন্ন ইষ্টের (values) ওজনে সমতা নাই,—কোনটিকে অত্যধিক মর্যাদা দেওয়া হয়, কোনটিকে বা কম, সেরূপ সমাজ কঠিন রোগগ্রস্ত না হইয়া যায় না। উপরন্তু, ব্রহ্মচর্য শব্দটিকে কোন এক বিশেষ সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিলে ইহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়। ফলত, ব্রতটিকে যথাযথভাবে পালন করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। অন্যান্য ব্রত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহা পালনের চেষ্টা করিলে সাধককে অসম্ভব অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। অতএব সমস্ত ব্রতকে একত্র পালন করাই উচিত। শুধু সেই অবস্থায় সাধক ব্রহ্মচর্যের প্রকৃত ও পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

ভারতবর্ষে ব্রহ্মচর্য সাধনার জন্য কয়েকটি বিধিনিষেধ প্রচলিত আছে। সাধক স্ত্রীজাতি অথবা জীবজন্তু এবং নপুংসকদের সংসর্গে আসিতে পারিবেন না; তিনি কেবল নারীকে, এক বা একাধিক হউক, শিক্ষা দিতে পারিবেন না; একাসনে স্ত্রীলোকের সহিত বসিতে পারিবেন না; স্ত্রীদেহের কোন অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিবেন না। তাঁহার খাদ্যের মধ্যে দুগ্ধ, দধি, ঘি অথবা স্নেহজাতীয় পদার্থ নিষিদ্ধ; তৈলমর্দন করিয়া স্নানও নিষিদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে আমি উপরোক্ত বিধি-নিষেধের সম্বন্ধে পাঠ করিয়াছিলাম। সেখানে এমন কয়েকজন নরনারীর সহিত একত্র বাস করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করিতেন বটে, কিন্তু উপরোক্ত বিধিনিষেধগুলির সম্বন্ধে সংবাদ রাখিতেন না। আমিও নিষেধগুলি মানিয়া চলিতাম না, এবং তাহার জন্য কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই। দুধ, ঘি এবং অপর জান্তব খাদ্য আমি পরিহার করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এ কারণে নয়।

পরিপূর্ণ এবং সিদ্ধ ব্রহ্মচারীর কখনও রেতঃপাত হয় না। তাঁহার

শরীরে উহা উত্তরোত্তর সংগৃহীত হইতে থাকে। ফলত তিনি কখনও জরাগ্রস্ত হন না এবং তাঁহার ধীশক্তি অম্লান থাকে।

আমার বিশ্বাস ব্রহ্মচর্যব্রত পালনেচ্ছু সাধকের পক্ষে উল্লিখিত বিধিনিষেধগুলি অপরিহার্য নয়। বাহ্য সংযমের দ্বারা ব্রহ্মচর্যে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি নারীর সহিত প্রয়োজনীয় সাক্ষাৎও করে না, নারীকে দেখিবামাত্র স্পর্শের ভয়ে পলাইয়া যায়, সে ব্রহ্মচর্যের পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।

কিন্তু পাঠক যেন ক্ষণেকের জন্যও ভুল করিয়া কল্পনা না করেন যে, আমি প্রকৃত সংযমের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছি। সাধক নিজের শক্তি অনুযায়ী চেষ্টা করিতে থাকিবেন, কখনও মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিবেন না।

স্বেচ্ছাচার এবং মিথ্যাচারকে পাপজ্ঞানে দূরে রাখা কর্তব্য।

প্রকৃত ব্রহ্মচারী মিথ্যা সংযমের বাঁধন স্বীকার করিবেন না। নিজের শক্তির সীমা অনুযায়ী তাঁহাকে বিশেষ বিশেষ বিধিনিষেধের শাসন সৃজন করিয়া লইতে হইবে। যখন কোনও একটি বিশেষ বাঁধনের আবশ্যকতা থাকিবে না, তখন উহা পরিহার করা কর্তব্য। সর্বপ্রধান প্রয়োজন হইল, প্রকৃত ব্রহ্মচর্য কি সে সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করা। দ্বিতীয়ত, ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা বা মূল্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করা, এবং সর্বশেষে এই অমূল্য ব্রতের জন্য সাধনায় অগ্রসর হওয়া।

আমি বিশ্বাস করি যে, দেশের প্রকৃত সেবা করিতে হইলে, সেবকের পক্ষে ব্রহ্মচর্যব্রত অপরিহার্য।

What is *Brahmacharya*? It is the way of life which leads us to Brahma (God)...Patanjali has described five disciplines. It is not possible to isolate any one of these and practise it.

For this age the five have been expanded into eleven. They are non-violence, truth, non-stealing, *brahmacharya*, non-possession, bread labour, control of the palate, fearlessness, equal regard of all religions, *swadeshi* and removal of untouchability.

It is well to bear in mind that all the disciplines are of equal importance. If one is broken all are. There seems to be a popular belief amongst us that breach of truth or non-violence is pardonable. Non-stealing and non-possession are rarely mentioned. We hardly recognize the necessity of observing them. But a fancied breach of *brahmacharya* excites wrath and worse. There must be something seriously wrong with a society in which values are exaggerated and underestimated. Moreover to use the word *brahmacharya* in a narrow sense is to detract from its value. Such detraction increases the difficulty of proper observance. When it is isolated even the elementary observance becomes difficult, if not impossible. Therefore, it is essential that all the disciplines should be taken as one. This enables one to realize the full meaning and significance of *brahmacharya*.—*Harijan*, 8-6-47, p. 180.

There are certain rules laid down in India for the would-be *brahmachari*. Thus he may not live among women, animals and eunuchs, he may not teach a woman only or even a group, he may not sit on the same mat as a woman, he may not look at any part of a woman's body, he may not take milk, curds, *ghee* or any fatty substance nor indulge in baths and oily massage. I read about these when I was in South Africa. There I came in touch with some men and women who, while they observed *brahmacharya*, never knew that any of the above-named restraints were necessary. Nor did I observe them and I was none the worse for the non-observance. I did give up milk, *ghee* and other animal substances but for different reasons.

A perfect *brahmachari* never loses his vital fluid. On the contrary, he is able to increase it day by day and, what is more, he conserves it; he will, therefore, never become old in the accepted sense and his intellect will never be dimmed.

It appears to me that even the true aspirant does not need the above-mentioned restraints. *Brahmacharya* is not a virtue that can be cultivated by outward restraints. He who runs away from a necessary contact with a woman does not understand the full meaning of *brahmacharya*.

Let not the reader imagine for one moment that what I have written is to serve as the slightest encouragement to life without the law of real restraint. Nor is there room in any honest attempt for hypocrisy.

Self-indulgence and hypocrisy are sins to be avoided.

The true *Brahmachari* will shun false restraints. He must create his own fences according to his limitations, breaking them down when he feels that they are unnecessary. The first thing is to know what true *brahmacharya* is, then to realize its value and lastly to try to cultivate this priceless virtue. I hold that true service of the country demands this observance.—*Harijan*, 15-6-47, p. 192.

তৃতীয় সমালোচনা

ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনদিন প্রথম এবং দ্বিতীয় সমালোচনাকে পুরাপুরি সমর্থন করিতে পারি নাই। গান্ধীজী মনুকে নিজের কাছে শোওয়াইয়া দিনের পর দিন শিক্ষা দিতেন, ইহা আমার নিকটে একবারও সমালোচনার যোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। বরং গান্ধীজীর শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে কোনও ত্রুটি চোখে পড়িলে আমি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বিলম্ব করিতাম না। আমার ৯-৩-১৯৪৭ তারিখের ডায়েরিতে লেখা আছে, "গান্ধীজীর মধ্যে একটা জিনিস খারাপ লাগে। পুরানো মাস্টারদের মত ব'কে ব'কে মানুষকে শোধরানোর দিকে ঝোঁক বেশি। অপরাধ, অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত, এই সব ওঁর মাথায় বেশি খেলে।

এগুলো সেকেলে ধরনের ব'লে পছন্দ করতে পারি না।" একদিন নূতন জগতের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহাকে এক বক্তৃতাই দিয়া বসিলাম। মনু সে সংবাদ জানিত না। পর-দিবস মনু হঠাৎ আসিয়া আমাকে বলিল, বাপুর যেন কি হইয়াছে। সব কথা আজ এত মিষ্টি করিয়া বলিতেছেন, নিজেই কাজকর্ম করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। আমি তাহাকে ভিতরের রহস্য প্রকাশ করিয়া বলার পর আমরা দুইজনে এই মজার ব্যাপার লইয়া খানিকক্ষণ হাসাহাসি করিলাম। এইরূপে মনুর শোওয়ার ব্যাপারে আমি কোনও দোষ দেখিতে পাই নাই।

এইবার দ্বিতীয় সমালোচনার সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিব। যদি কোনও কারণবশত গান্ধীজীর আত্মপরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা হয়, এবং কোনও মহিলা যদি গান্ধীজীর প্রশ্নের উত্তরে নিজের অন্তর পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে জানান, তাঁহাব মনে কামনার ছায়া উদিত হইতেছে কি না, তবে এরূপ প্রশ্নে, অথবা নারীটির পক্ষে স্বেচ্ছায় গান্ধীজীর আত্মপরীক্ষার উপকরণস্বরূপ ব্যবহৃত হওয়াতেও আমি দোষের কিছু খুঁজিয়া পাই না।

স্বামী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনীর মধ্যেই বোধ হয় এক সময়ে পডিয়াছিলাম, তাঁহার গুরু স্বীয় শিষ্যের মনে অতৃপ্ত কামনার সংবাদ পাইয়া, এবং তদ্দ্বারা সাধনার বিঘ্ন ঘটিতেছে অনুভব কবিয়া, তাঁহাকে স্বগ্রামে ফিরিয়া যাইবার উপদেশ দিয়াছিলেন। অবশেষে উপভোগের দ্বারা মনের ক্ষুধা প্রশমিত হইলে, অথবা তাহার ফলে মনে বৈরাগ্যের উদয় হইলে, তিনি পুনরায় তাঁহাকে কঠিন সাধনায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ইহাকে যখন আমি সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া মনে করি, তখন গান্ধীজীর আচরণের বিরুদ্ধে উল্লিখিত সমালোচনাকে সমর্থন করিতে পারিব না, ইহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু আমার নিজেরও কোন কোন বিষয়ে আপত্তি ছিল। সে বিষয়ে এইবার ব্যক্ত করিব। প্রারম্ভেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, তাহার মধ্যে গান্ধীজীর ব্রহ্মচর্যব্রতের পালন সম্পর্কে কোনও বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, আভাষেও এরূপ কোন আপত্তি ছিল না। ব্রহ্মচর্য বা কামনার সম্পূর্ণ নিরোধ সম্পর্কে আমি নিজে কিছুই বুঝি না, ও বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহও নাই। আমার যাহা আপত্তি ছিল, তাহা গান্ধীজীর কৃচ্ছ্র ধর্মের প্রতি আসক্তির বিরুদ্ধে, এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাহারা সেই ধর্মের অভ্যাসে আসক্ত হইত তাহাদের কাহারও কাহারও দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে। এই আপত্তি নর এবং নারীদের সম্পর্কে অপক্ষপাতে প্রযুক্ত হইত, এবং যাহারা নিকটে থাকিত অথবা দূরে থাকিয়া গান্ধীজীর আচরিত আদর্শ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিত, তাহাদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযুক্ত হইত।

গান্ধীজীর সহকর্মীগণের মধ্যে চরিত্রের অপরূপ উন্নতির বিষয়ে আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু সময়ে সময়ে আমার মনে হইত, এই সকল পরম সাহসিকতার মধ্যে আমিত্ব নিঃশেষে মরিয়া যায় নাই। ইহা না হওয়াই অবশ্য স্বাভাবিক; কেন না আমরা মানুষ, এবং বহু সংস্কারের বন্ধনজালকে ছিন্ন করিয়া তবে ঊর্ধ্বগামী হইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। গান্ধীজীর প্রতি প্রেম অথবা তাঁহার প্রদর্শিত নীতির প্রতি আনুগত্য সকল সময়ে আমাদের পশুজীবন হইতে উদ্ভূত সংস্কারকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করিতে পারে না; এবং কোন্‌টি অবশিষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার মধ্যেও ক্ষেত্রবিশেষে যথেষ্ট তারতম্য লক্ষিত হয়। আশ্রমবাসী কর্মীদের মধ্যে সময়ে সময়ে গান্ধীজীর প্রীতিলাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আমার ভাল লাগে নাই। তেমনই আবার

কয়েকজনের চরিত্রে একটি বিশেষ পরিণতিও আমার নিকট অপরিহার্য বলিয়া মনে হয় নাই।

এক ব্যক্তির বিবাহেব কথা চলিতেছিল। তিনি বলিয়া বসিলেন, বিবাহ আমি করিব, কিন্তু সংসারধর্ম পালন করিব না। আমার মনে প্রশ্ন জাগিত, তবে বিবাহেরই ইচ্ছা হয় কেন? আর একজনের ক্ষেত্রে অনুভব করিতাম, গ্রামের সেবা যেন ঠিক তাঁহার সহিতেছে না। সৈনিকের মতন যতটুকু করেন, ততটুকু ভালভাবেই করেন। কিন্তু তাঁহার মনের অপর নানাবিধ খোরাকের প্রয়োজন হয়, এবং সে বিষয়ে অভাব ঘটিলেই গ্রামের কাজে আর মন বসে না, মন ছটফট করিতে থাকে। আমার মনে হইত, এরূপ পাতলা মানবপ্রেমের বশে সেবাধর্মে আত্মনিয়োগ করা অপেক্ষা বিবাহের পর তাঁহার দ্বারা পরার্থে যতটুকু সম্ভব ততটুকু কাজ করিলেই যেন ভাল হইত। আর যদি দেশের পক্ষে তাঁহার সেবা অপরিহার্যই হয়, তবে ত্যাগস্বীকারটুকু গলায় না আটকাইয়া ঢোঁক দিয়া গিলিয়া ফেলিলেই ভাল হইত। অন্তত সাধনার ক্ষেত্রে আগাছাগুলি দূর হইলে তাঁহার অভীপ্সিত সেবাধর্ম বা মানবপ্রেমের চারা হয়তো তখন আরও সুস্থভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ফুলে ফলে সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিত।

গান্ধীজীর সহিত এ সকল বিষয়ে আলোচনার কারণ ছিল না। কিন্তু ৩১-১২-১৯৪৬ তারিখে যখন পরশুরাম তাঁহাব সম্মুখে মৌখিক আলোচনা করিয়াছিলেন, সেদিন তিনি আমাকে ডাকিয়া আমার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। সন্ধ্যার সময়ে বেড়াইয়া আসিবার পর আমার বক্তব্য তিনি দেড় ঘণ্টা ধরিয়া মনোযোগ সহকাবে শ্রবণ করিলেন। প্রথমে হিন্দীভাষাতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ভাষার দিকে বেশি মনোযোগ দিতে হইতেছে অনুভব করিয়া গান্ধীজীর নিকুটে অনুমতি

চাহিয়া ইংরেজীতে কথা বলিতে আরম্ভ করি। আমার সেই রাত্রের ডায়েরি হইতে অংশবিশেষ, সংশোধনের পর, পাঠকগণের সম্মুখে নিবেদন করিতেছি।

"গান্ধীজীকে বললাম, আমি আপনাকে অন্য দিক থেকে ভক্তি করি। মানুষে মানুষে যখন স্বার্থের লড়াই হয়, তখন হিংসার অস্ত্রই সচরাচর ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ফল ব্যর্থ হয়ে যায়, মানুষ যা চায়, তা পায় না। আপনি সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সমবেত অহিংসার যে নূতন উপায় নিয়ে পরীক্ষা করছেন, তার দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছি। সেই পথের মহত্ত্ব বোঝবার চেষ্টা করেছি, এবং সেই উদ্দেশ্যে আপনার লেখা যত্নের সঙ্গে পড়েছি, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ইতিহাস অধ্যয়ন করার চেষ্টা করেছি।

এই চেষ্টার মধ্যে চোখে পড়েছে যে, যারা আপনার নাম নিয়ে চলে, তাদের অনেকের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে অনুকরণ করার দিকে যেন ঝোঁক বেশি। কেহ বা আপনার কৃচ্ছ্র সাধনার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন, কারুর মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রধান হওয়ার ফলে স্বাধীনতা-যুদ্ধে আপনার প্রতি আনুগত্য জন্মেছে। কিন্তু যে নূতন সমবেত রণ-কৌশলের প্রবর্তন আপনি করছেন, তার প্রতি আকর্ষণ অনেকের কম। সেইজন্য আপনি যেখানে পথ দেখাবার জন্য নেই, সে সকল সমস্যার সমাধানে তাদের চিন্তাশক্তি স্ফুরিত হয় না, তারা আনুষ্ঠানিকভাবে চরকা কাটা ইত্যাদির গর্তে আশ্রয় নেয়, এবং সামাজিক পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অকর্মণ্য হয়ে যায়। নিগ্রহের দ্বারা বা আনুষ্ঠানিক প্রচেষ্টার দ্বারা আত্মতৃপ্তি লাভ করা ছাড়া, অথবা আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা ছাড়া তাদের আর কিছু

থাকে না। আপনার অবর্তমানে সত্যাগ্রহের দায়িত্ব এজাতীয় নেতার উপরে থাকলে সত্যাগ্রহ টিঁকবে কি না সন্দেহ।

এই সব ব্যাপার আমি বাংলা দেশের মধ্যে বহুদিন থেকে লক্ষ্য করেছি, কিন্তু কারণ বুঝতে পারি নি। আপনার সঙ্গে গত দেড় মাস একান্তে থাকার ফলে বুঝতে পারছি, আপনার মধ্যেই নিগ্রহের প্রতি একটু আসক্তি আছে। যারা নিগ্রহের অভ্যাস করে, তাদের আপনি একটু মমতার চোখে দেখেন। ফলে যাদের মানবপ্রেম পাতলা, তারা আপনার প্রেমটুকু অনুকরণ না ক'রে আরও সহজ পথ নেয়; কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা আপনার প্রিয়পাত্র হবার চেষ্টা করে।

এর দ্বারা ক্ষতি কোন্‌খানে হয় তা বলছি। সত্যাগ্রহের ভবিষ্যৎ সন্দেহজনক হওয়া ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে তাদের চরিত্রে দোষ জন্মায়। কেহ কেহ দাম্ভিক অথবা প্রশংসাপ্রিয় হয়ে যায়; কারণ চিত্তের এক দিককার অভাব অন্য দিক দিয়ে তারা পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করে। সাধারণ সংসারী মানুষ যেখানে ভদ্র ব্যবহারের সীমা লঙ্ঘন করতে ইতস্তত করে, তাদের সেখানে বাধে না। তক্‌মার জোরে তারা নিজের ব্যবহারকে সমর্থন করতে চায়।

এই গেল অপরের কথা। আপনার নিজের বেলায়, আমি এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেখেছি, আপনি রাগ করেন, ভুল বোঝেন, বিরক্ত হন। ফলে আপনাকে আরও কাছের মানুষ ব'লে মনে হয়েছে। সম্পূর্ণ ক্রোধশূন্য মানুষ ব'লে জানলে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর মত আপনাকে ভক্তি করতাম, আপনার মহত্ত্বে অভিভূত হয়ে যেতাম, হয়তো অন্তরে অধিক শক্তি পেতাম; কিন্তু কাছের মানুষের মত আপনাকে ভালবাসতে পারতাম না।

আপনি মেয়ে বা পুরুষদের সঙ্গে যেভাবে মেশেন, পরশুরাম আপনার আচরণের সম্বন্ধে যা বলেছেন, আমি সে সকল ঘটনা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু তাঁর মত অভিযোগের পর্যায়ে ফেলি নি। আপনার নিজের পক্ষে এরূপ আচরণকে আমি ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর মত অবধূতগণের পর্যায়ে না ফেলে খেলার মত মনে করি। আপনি নিরবচ্ছিন্নভাবে কঠিন সাধনার মধ্যে, রণক্ষেত্রের মহাভয়ঙ্কর রূপের মধ্যে পীড়িত হয়ে যদি ভাবের রাশকে একটু ঢিলে দেন, সে জিনিসকে আমি ভুল বুঝবো না। বরং এই ভাববো যে, আপনার জীবনের পাতা যখন বাহিরের আঁচে তপ্ত হয়ে ওঠে, তখন আপনি এমনি ভাবে মাটির নীচে, নরলোকের সঙ্গ হতে রসের সন্ধান ক'রে নিজেকে শীতল রাখেন।"

এ বিষয়ে গান্ধীজীর সহিত পরেও আমার বিস্তারিতভাবে আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আশ্রিত, তাঁহার দ্বারা পরিচালিত কর্মীগণের মনের গতি সম্পর্কে আমি যে বিশ্লেষণ করিতাম, তিনি কোনদিনই তাহা স্বীকার করিতে পারেন নাই; বরং বলিয়াছিলেন, আমি অনেক সময়ে অবিমৃষ্যকারির মত সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। ১৮-৩-৪৭ তারিখে তিনি আমাকে লিখিলেন—

> **I simply drew your attention to what appeared to be hasty decisions and that too in order to see as much perfection in you as possible. 'Haste is waste.'**

পর-দিবস আবার বলিলেন—

> **I do want to emphasise my impression that you jump to hasty conclusions.**

কিন্তু আমি সাবধানে চলিবার চেষ্টা করিতাম, এবং কি কারণে গান্ধীজীর সমালোচনা স্বীকার করিতে পারি নাই তাহা ৭-২-১৯৪৭ তারিখে লিখিত গান্ধীজীর একখানি পত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিবার

চেষ্টা করিব। আমার পরিচিত জনৈক ব্যক্তির পারিবারিক ঘটনার বিষয়ে একবার গান্ধীজীর নির্দেশেই তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তখন তিনি লেখেন—

ক-এর প্রেমের মধ্যে কামের লেশমাত্র নাই। আমি উহাকে কাব্যের সঙ্গে তুলনা করিয়াছি। বিশেষণের চয়নটি ভাল হয় নাই স্বীকার করি, কিন্তু অপর কোনও উপযুক্ত শব্দ খুঁজিয়া পাইলাম না। এই প্রেমের মূলে পরোপকার প্রবৃত্তি রহিয়াছে। তুমি এই প্রেমের সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা কর। ক বলিতেছেন, খ যদি তাঁহার বর্তমান মনোভাব পরিবর্তন না করেন, তবে খ-কে তিনি ভগ্নী অথবা কন্যার মত বিবেচনা করিবেন ; এবং অন্য কোনও ভাবে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবেন না। খ ইহা বিশ্বাস করেন; কিন্তু তাঁহার আপত্তি হইল, ক কেন ঘন ঘন তাঁহার পিছনে ঘোরেন।

A's love is wholly free from animal passion. I have called it poetic. It is not a perfect adjective but I can find no better ...[it is] philanthropic,

Now mark the beauty of it. A says so long as B does not change her mind she will be as sister or daughter to him and he would never make any other advance to her. B believes this assuarance. What she objects to is his shadowing her as she calls it.

এরূপ মতামত পোষণ করিতে দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হইত, বহুদিন নিগ্রহ ও তপস্যার ফলে গান্ধীজী আমাদের মত মানুষের মনের সুখ-দুঃখ, টানা-পোড়েন আর বুঝিতে পারেন না। একবার জনৈক বন্ধুর সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি আমায় লিখিলেন—

তুমি উহাদের বিষয়ে আরও বুঝিবার চেষ্টা কর, তুমি উহাদের প্রতি অবিচার করিতেছ।

You ought to know the three more fully. You are not just to them.

আলোচনা করা নিষ্ফল। কারণ উল্লিখিত ব্যক্তি নিজেই নিজের মনের গহনের সংবাদ রাখিবেন না। আমি তাঁহার প্রতিদিনের আচরণের বহু ক্ষুদ্র টুকরা একত্র করিয়া বর্তমান সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলাম। ফ্রয়েডের নামোল্লেখ করিয়া গান্ধীজীকে বলিলাম, আমার নিজের মনের বিশ্লেষণে ফ্রয়েড প্রবর্তিত উপায়ের দ্বারা অসীম সহায়তা লাভ করিয়াছি। নিজের আচরণের বিভিন্ন রূপ এবং তাহাদের মূলগত বহুমুখী বিভিন্ন তৃষ্ণাব সন্ধান জানি বলিয়া তুলনায় অপরের মনের গহনের অবস্থাও অনুমান করিতে পারি। আপনি তাহা পারেন না। সেবাব্রতের একমুখী প্রয়োজনে, নিজেকে শূন্যে পরিণত করিবার চেষ্টায়, আপনি যদিও নিগ্রহের অভ্যাস করিয়াছেন, তবুও সেবাধর্মেব সত্য আপনাকে মঙ্গল-কবচের মত রক্ষা করিয়াছে। আপনি মনের সরসতা হাবান নাই, মানুষের প্রতি প্রেম আপনার ক্ষেত্রে গভীরতর হইয়াছে। নিজেকে কেন্দ্র করিয়া আপনি কোনদিন ঘুরিয়া ফেরেন নাই। কিন্তু নিগ্রহের ফলে সচরাচর যে দৃষ্টিক্ষীণতা জন্মায়, সে দাম তো আপনাকে দিতে হইয়াছে। একেবারে ঊর্ধ্বে উঠিলে সেই দৃষ্টিশক্তি সিদ্ধপুরুষগণের ক্ষেত্রে আবার ফিরিয়া আসে কি না জানি না; কারণ তেমন মানুষের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আজ পর্যন্ত আমার হয় নাই।

কিন্তু আপনার বেলায় যে নিগ্রহ সত্য, অনেকের ক্ষেত্রে তাহা সত্য নয়। অগভীর মানবপ্রেমের বশে সাধনা আরম্ভ করিয়া অবশেষে অনেকে নিগ্রহের শৃঙ্খলপাশে স্বেচ্ছায় বাঁধা পড়িয়াছে, মানবের প্রতি প্রেম তাহাদের অন্তরে বৃদ্ধি পায় নাই। তাহাদের কয়েদী মনের সংবাদ আপনি বুঝিবেন কেমন করিয়া?

আমার কেবল এই দুঃখ যে, ইহার জন্য আপনি পরোক্ষভাবে দায়ী ; নিগ্রহের প্রতি আপনার আংশিক আসক্তি ইহার জন্য কতকটা দায়ী।"

আশ্চর্যের বিষয়, গান্ধীজী ১৯-৩-১৯৪৭ তারিখে আমাকে পত্রে লিখিলেন—

> ফ্রয়েডীয় দর্শন কি ? আমি তাঁহার কোন লেখা পড়ি নাই। জনৈক অধ্যাপক বন্ধু ফ্রয়েডের অনুগামী ছিলেন। তিনি ক্ষণেকের জন্য ফ্রয়েডের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। আর তুমি দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাহার নিকটে ফ্রয়েডীয় মতের বিষয়ে শুনিতেছি।

অতঃপর তিনি ফ্রয়েডীয় দর্শন সম্বন্ধে পাঠ দিবার জন্য আমাকে আদেশ করিলেন। কারণ

> তুমি ক-কে লিখিত চিঠিতে যে মত প্রকাশ করিয়াছ, তাহা যদি এখনও পোষণ কর তবে তোমার মত আমাকে বোঝানো তোমার কর্তব্য ; আমি নিজেকে যাহাতে আরও বুঝিতে পারি সে বিষয়ে তোমার সাহায্য করা উচিত।

> **What is Freudian philosophy? I have not read any writing of his. One friend himself a Professor and follower of Freud discussed his writings for a brief moment. You are the second.**
>
> **If you hold on to the view you have expressed in your letter to K, you do owe it to me to explain your standpoint and enable me to understand myself more fully than I do.**

দুই মাস পরে, ১৯৪৭ সালে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে গান্ধীজী, প্রধান মন্ত্রী সুহরাবর্দি সাহেব এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের মধ্যে নোয়াখালির অবস্থা লইয়া বাদানুবাদের মীমাংসার জন্য দিল্লী হইতে সোদপুরে আগমন করেন। তখন একদিন সকালে বেড়াইবার সময়ে অকস্মাৎ অপর সকলকে সরাইয়া আমাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন,

কই, তুমি তো ফ্রয়েডের সম্পর্কে আমাকে কিছু লিখিলে না! আমি বলিলাম, আপনি সমগ্র ভারতবর্ষের যে সকল দুরন্ত প্রশ্নের মীমাংসায় ব্যস্ত আছেন, তাহার মধ্যে আর ও-বিষয়ে আপনাকে লিখিতে মন হয় নাই। তিনি তবু বলিলেন, আমি যেন ফ্রয়েডীয় দর্শন সম্বন্ধে লিখিতে অবহেলা না করি।

"অপরাধ" স্বীকার

গান্ধীজীর আর একটি বিচিত্র অভ্যাস ছিল। তাঁহার ব্রহ্মচর্য বিষয়ে নিষ্ঠা প্রাচীনপন্থীদের আদর্শ হইতে তিলমাত্র ন্যূন না হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রচলিত বাহ্য বিধিনিষেধগুলি মানিয়া চলিতেন না বটে, কিন্তু পুরাতন একটি অভ্যাস তাঁহার নিকটে প্রিয় ছিল। ব্রহ্মচর্য সম্পর্কিত কোন প্রশ্নের উদয় হইলে তিনি যেমন পত্রিকায় অথবা অন্তরঙ্গগণের নিকট পত্র লিখিয়া সমালোচনা আহ্বান করিতেন বা স্বীয় মত ব্যক্ত করিতেন, তেমনই আবার নিজের মনের মধ্যে যদি সত্যই কোন বিকারের আবির্ভাব হইত, তখন তিনি ক্যাথলিক মতাবলম্বী সাধকগণের মত কোনও বিশ্বাসভাজন পাত্রের নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া তবে মনের মধ্যে শান্তি ফিরিয়া পাইতেন। শুধু ব্যক্তিবিশেষের নিকটে নয়, তিনি সর্বজনসমক্ষে দোষীর বেশ পরিধান করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতে ইতস্তত করিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার আচরণ ভারতীয় সাধকগণের অনুবর্তী না হইয়া বরং খ্রীষ্টীয় সাধকগণের অনুবর্তী ছিল। সর্বজনসমক্ষে অপরাধস্বীকার করার কারণ ইহাই ছিল যে, তিনি বিশ্বাস করিতেন, অহিংস সাধনপদ্ধতির মধ্যে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক আচরণে কোনও ভেদাভেদ করা যায় না। ৭-২-১৯৪৭ তারিখের চিঠিতে তিনি লেখেন—

I do wish you could see that in non-violent conduct whether individual or universal, there is an indissoluble connection between private personal life and public. You may be as generous and charitable as you like in judging men but you cannot overlook private deflections from the right conduct.

১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে কোন ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া গান্ধীজীকে একবার সর্বজনসমক্ষে অপরাধ স্বীকার করিতে হইয়াছিল; তাহার উল্লেখ করিয়া বর্তমান অধ্যায় সমাপ্ত করিব।

রোগের বশে মানুষের শরীর যখন জীর্ণ হইয়া যায়, তখন আমাদের দেহ স্বীয় জৈব ধর্ম অনুসারে বাঁচিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। এবং জীবনস্রোতকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টায় মনের গভীরে মানুষের যে-সকল আদিপ্রবৃত্তি বর্তমান রহিয়াছে, সেগুলি স্বভাবত উদ্ধতভাবে আত্মপ্রকাশ করে; কারণ তাহারাই জীবনসংগ্রামে মানুষ-পশুর দীর্ঘদিনের সহচর।

২৯-২-১৯৩৯ তারিখে গান্ধীজী ইংরেজী হরিজনে Nothing without Grace অর্থাৎ 'ঈশ্বরকৃপা ভিন্ন কিছুই সম্ভব নয়' এই শিরোনামা দিয়া এক প্রবন্ধ লেখেন। তাহার শেষাংশে তিনি বলেন—

> আমি ১৮৯৯ সাল হইতে সজ্ঞানে এবং সতর্কভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। আমি ব্রহ্মচর্য বলিতে শুধু শরীরের শুদ্ধি নয়, বাক্য এবং চিন্তার শুদ্ধিকেও বুঝি। একবারমাত্র পদস্খলনের ঘটনা বাদ দিলে বিগত ৩৬ বৎসর নিরন্তর চেষ্টার মধ্যে, আমার মনে এবার অসুখের সময়ে যেরূপ বিকার উপস্থিত হইয়াছিল, সেরূপ বিকার কখনও আসিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। যে মুহূর্তে আমি উহা অনুভব করিলাম, সেই মুহূর্তেই নিজের প্রতি গভীর ঘৃণার ভাব উদয় হইল এবং আমি

শুশ্রূষাকারী বন্ধু ও চিকিৎসকগণকে নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করিলাম। তাঁহারা কোন সাহায্যই দিতে পারিলেন না। আমি সাহায্যের প্রত্যাশাও করি নাই। আমাকে যেভাবে বিশ্রাম লইতে বাধ্য করা হইয়াছিল, আমি তাহার শাসন ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। অন্তরের মধ্যে যে গ্লানি অনুভব করিয়াছিলাম, অনুতাপ এবং অপরাধ স্বীকারের দ্বারা অনেক স্বস্তি লাভ করিলাম। আমার কাঁধের উপর হইতে যেন একটা ভারি বোঝা নামিয়া গেল। কোনও অনিষ্ট ঘটিবার পুর্বেই আমি এইরূপে নিজেকে সংশোধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

কিন্তু গীতার শিক্ষা কোথায় গেল? গীতা স্পষ্ট এবং নির্ভুল শিক্ষাই দিয়া থাকেন। যে মন একবার ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করে, আর কখনও তাহার পতন হয় না। তাহা হইলে আমি আজও ঈশ্বর হইতে কত দূরেই না রহিয়াছি! তিনিই জানেন। অন্তত ঈশ্বরের এইটুকু কৃপা আমার প্রতি রহিয়াছে যে, আমার বহুপ্রচারিত 'মহাত্মা' উপাধি আমাকে কখনও বোকা বানাইতে পারে নাই। রোগের সময়ে আমাকে বাধ্য হইয়া যে বিশ্রামভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার অন্তর্গত অভিজ্ঞতার ফলে আমার মাথা নত হইয়া গিয়াছে। এরূপ আর পূর্বে কখনও ঘটে নাই। আমার অন্তরে যে দুর্বলতা লুকাইয়া ছিল, তাহা সুযোগ পাইয়া বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিল। আমি জনসাধারণের নিকটে ইহা গোপন করিবার চেষ্টা করিলে যতটা লজ্জিত হইতাম, ইহাদের প্রকাশের ফলে তত লজ্জিত হই নাই। গীতার উপদেশের প্রতি আমার বিশ্বাস পূর্বের মতই অবিচল রহিয়াছে। বিশ্বাসের বস্তুকে অন্তরের মধ্যে অভ্রান্ত অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করিতে হইলে নিরবচ্ছিন্ন এবং অক্লান্ত

প্রচেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু গীতা নিঃসংশয়রূপে ইহাও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরকৃপা ভিন্ন সেই অনুভূতি লাভ করা সম্ভব হয় না। যদি ঈশ্বর এই শাসনটুকু না রাখিতেন তাহা হইলে মানুষের অভিমানের আর অন্ত থাকিত না।

I have been trying to follow *Brahmacharya* consciously and deliberately since 1899. My definition of it is purity not merely of body but of both speech and thought also. With the exception of what must be regarded as one lapse, I can recall no instance during more than thirtysix years' constant and conscious effort, of mental disturbance such as I experienced during this illness. I was disgusted with myself. The moment the feeling came I acquainted my attendants and the medical friends about my condition. They could give me no help. I expected none. I broke loose after the experience from the rigid rest that was imposed upon me. It enabled me to pull myself together before any harm could be done. But what of the Gita? Its teaching is clear and precise A mind that is once hooked to the Star of Stars becomes incorruptible. How far I must be from him. He alone knows. Thank God my much vaunted Mahatmaship has never fooled me. But this enforced rest has humbled me as never before. It has brought to the surface my limitations and imperfections. But I am not so much ashamed of them, as I should be of hiding them from the public. My faith in the message of the Gita is as bright as ever Unwearied ceaseless effort is the price that must be paid for turning that faith into rich infallible experience. But the same Gita says without an equivocation that the experience is not to be had without divine grace. We should develop swelled heads if divinity had not made that ample reservation—*Harijan*, 29-2-39, p. 20.

অসঙ্গ

গীতায় সঙ্গ শব্দ আসক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গহীনতা বলিলে যেমন অনাসক্ত ভাব বুঝায়, অপর দিক দিয়া তেমনই মানুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী, গৃহহীন, অনিকেতন অবস্থাকেও বুঝায়। গান্ধীজী শুধু অনাসক্তি নয়, সঙ্গহীনতার সাধনাও অভ্যাস করিতেন। সেই বিষয়ে এবার আলোচনা করিব।

একটি নিতান্ত ব্যক্তিগত ঘটনা লইয়াই আরম্ভ করি। বিষয়টি আমার পক্ষে লজ্জার হইলেও তাহার মধ্যে শিক্ষণীয় বস্তু আছে বলিয়া সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া উল্লেখ করিতেছি। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস, তারিখ ১৭। গান্ধীজী তখন নোয়াখালি পরিক্রমার পর বিহারে উপস্থিত হইয়াছেন। সেদিন আমরা সকলে পাটনা-গয়া লাইনে তারেগনা স্টেশনে নামিয়া দাঙ্গা-বিধ্বস্ত মসৌড়ি নামে একটি স্থান দেখিতে চলিয়াছি। পথে প্রচণ্ড ভিড়। প্রতি স্টেশনে, এমন কি স্টেশনের বাহিরেও বিপুল জনতা হাতে পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা-সহকারে গান্ধীজীকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। গাড়ির পাদানিতে দর্শনাকাঙ্ক্ষী লোকের ভিড বারংবার জমিয়া উঠিতেছে; গান্ধীজী জানালার পাশে বসিয়া চিঠি লিখিতেছেন, মাঝে মাঝে জনতার দিকে ফিরিয়া নমস্কার করিতেছেন। গ্রামের লোক সাজ-গোজ করিয়াও যেমন আসিয়াছে, তেমনই আবার মাঠের চাষীও ধূলাপায়ে সোজা পাশের মাঠ হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে।

আমার নিজের একটি ব্যক্তিগত অভ্যাস আছে। প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সম্পাদনের জন্য মাঠে যাইতে হইলে আমি মাটিতে

গর্ত করিয়া থাকি, এবং মাটি খুঁড়িবার জন্য কোন ছোট অস্ত্র ব্যবহার করি। এরূপ কাজের জন্য কি অস্ত্র লইলে সুবিধা হয়, অথচ যাহা পুঁটুলির ভিতরে সহজে বাঁধিয়া লওয়া যায়, ইহা লইয়া মাঝে মাঝে গবেষণা করিয়াছি ও একটির পর একটি অস্ত্রের পরীক্ষাও করিয়াছি, কিছুতেই যেন সন্তোষ লাভ করিতে পারি নাই। যখন আমরা তারেগনার জন্য রেলে চলিয়াছি, এমন সময়ে একটি স্টেশনে জনতার মধ্যে, অকস্মাৎ একজন চাষীর হাতের একখানি সাধারণ খুরপির উপরে নজর পড়িল। প্রচণ্ড ভিড় এবং কোলাহলের মধ্যে তাহাকে ডাকিয়া খুরপিখানি দেখিতে চাহিলাম। মনে হইল, ইহার দ্বারা কাজ হইবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এটি আমাকে দিবে? পয়সা দিতেছি, এইরূপ আর একটি খরিদ করিয়া লইও। সে ব্যক্তি ইতস্তত করিতে লাগিল। আমি জিনিসটি ফিরাইয়া দিতে চাহিলাম; কিন্তু পাশের জনতা সমবেত হইয়া তাহাকে বলিল, গান্ধীজীর সঙ্গের লোক, এই সামান্য জিনিস চাহিতেছেন, ইহার দাম লইও না, এমনিই দিয়া দাও। লোকটি হট্টগোলের মধ্যে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া রাজি হইয়া গেল। জনতার মধ্যে পতাকাধারী কংগ্রেসকর্মী হাঁকিয়া বলিলেন, আমরা উহার ব্যবস্থা করিয়া দিব, আপনি খুরপিটি লউন। ইত্যবসরে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। আমি খুরপিখানি আজও রাখিয়া দিয়াছি, কোনদিন ব্যবহার করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই।

মাঝে মাঝে এই ঘটনাটির বিষয়ে চিন্তা করিয়াছি। গান্ধীজীর পার্শ্বচর। ত্যাগী মহাপুরুষের পার্শ্বচর; অতএব ত্যাগের প্রতিফলিত বিভূতির দ্বারা মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছি। কিন্তু সেই বিভূতির সুযোগ লইয়া একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য নয়, অর্ধাবশ্যক দ্রব্যকে স্বচ্ছন্দে আত্মসাৎ

করিতে পারিলাম। তাহাও জনসাধারণের কোন প্রয়োজনে নয়, একান্ত ব্যক্তিগত কারণে। ইহার গ্লানি আমার পরিপূর্ণভাবে দূর হয় নাই, এবং আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে, যেন কোনও ঐশ্বর্যকে ভাঙাইয়া না খাই। কিন্তু ত্যাগ বা মহিমালব্ধ ঐশ্বর্যকে ভাঙাইয়া খাইবার প্রলোভন যে কি তীব্র আকার ধারণ করিতে পারে, তাহা নিজের জীবনে এবং বন্ধুদের জীবনেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহার আকস্মিক ছায়ায় সেবাধর্ম বা অপর কোন মহৎ ধর্মও ক্ষণেকের জন্য রাহুগ্রস্ত হইয়া যায়।

যাঁহারা দীর্ঘ দিন গান্ধীজীর পাশে থাকিয়া বহু তপস্যার মধ্য দিয়া গিয়াছেন, অর্ধাহারে, অনাহারে, শারীরিক শ্রম, মৃত্যুভয় প্রভৃতিও যাঁহাদিগকে সেবাধর্মের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই, তাহাদের মধ্যেও ছোটখাটো ঘটনায় অসাবধানতার পরিচয় পাইয়াছি। সামান্য এক জোড়া জুতা কিনিতে হইবে, তাহার জন্য কোনও ভক্তের প্রকাণ্ড মোটর গাড়িতে চড়িয়া পাঁচ টাকার তেল পুড়াইতে আমরা কুণ্ঠিত হই নাই। ভক্ত গাড়িখানি ব্যবহারের জন্য দিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন, ইহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আমাদের তিন টাকার জুতা কিনিতে গিয়া সস্তার বাহন খোঁজা উচিত ছিল কি না, তাহাও তো বিবেচনার বিষয়।

গান্ধীজীর পার্শ্বচরগণের দশা যাহাই হউক না কেন, তাঁহার নিজের মধ্যে এরূপ সতর্কতার শিথিলতা কখনও অনুভব করি নাই। দরিদ্রতম মানুষের সঙ্গে একাত্মভাব স্থাপন এবং তাহাদের মনুষ্যত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার যে কঠিন ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মনের মধ্যে সেই ভাব কম্পাসের কাঁটার মত সর্বদাই এক দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ

করিত ; সঙ্কেতের দ্বারা তাঁহাকে পথচ্যুতি হইতে রক্ষা করিত। বস্তুত উহা তাঁহার রক্ষাকবচের মত ছিল।

ইহার ফলে গান্ধীজীর দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নিজের জন্য তিনি যথাসম্ভব কম খরচ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯১৬-১৭ সালে যখন চম্পারন সত্যাগ্রহ চলিতেছে, তখন তিনি নিজের আহারের জন্য প্রত্যহ তিন আনার বেশি ব্যয় করিতেন না। কিন্তু পরবর্তী কালে নানা কারণে শরীর দুর্বল হওয়ার ফলে তিনি ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী যাহা আহার করিতেন, তাহার মূল্য তিন আনার অনেক গুণ বেশি ছিল। কিন্তু বেশি হইলেও শরীরের জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজন তিনি তাহার সীমা কিছুতে লঙ্ঘন করিতেন না।

পূর্বে গান্ধীজী ফাউণ্টেন পেন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু একটি কলম হারাইয়া যাওয়ার পর হইতে তিনি সাধারণ নিব-যুক্ত কলমেই লেখার কাজ সারিতেন। রেলে বা মোটরে লিখিবার সময়ে তাঁহাকে আমাদের কাহারও কলম ব্যবহার করিবার জন্য দেওয়া হইত, কিন্তু অপর সকল সময়ে তিনি উহা যথাসাধ্য বাদ দিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। কেহ দামী কলম উপহার দিলে, যত শীঘ্র পারেন তাহা কোনও অভাবী লোকের হাতে তুলিয়া দিয়া তবে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতেন। লিখিবার উপযুক্ত এক টুকরা সাদা কাগজও তাঁহার কাছে ফেলিবার উপায় ছিল না। পুরাতন খাম কাটিয়া, তাহার লেখা অংশের উপরে নূতন কাগজ সাঁটিয়া তিনি চিঠিপত্র পাঠাইতেন। লাট সাহেবের নিকটেও এইরূপ মেরামত-করা খামে চিঠি পাঠানো হইয়াছে, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অর্থাৎ কোন বস্তুর অপচয় তিনি করিতে দিতেন

না, সকল বস্তুর সম্পূর্ণ ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেন। ফলে কখনও কখনও তাঁহাকে কৃপণস্বভাবের বলিয়া মনে হইত।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, যখন কোনও কাজের জন্য বিপুল অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইত, তখন তিনি তাহা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একবার নোয়াখালি হইতে দিল্লীতে পণ্ডিত জওহরলালের নিকট অত্যন্ত জরুরী চিঠি পাঠাইবার প্রয়োজন হয়। ডাকেও তাড়াতাড়ি হয়তো পাঠানো যাইত। কিন্তু পূর্বে দুই-একখানি চিঠি ডাকে পাঠানোর ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কোনও উপায়ে তাহার মর্ম অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া সেবার গান্ধীজীর আদেশ অনুসারে প্রথমে ট্যাক্সি-যোগে ফেণী পর্যন্ত, ফেণী হইতে কলিকাতা পর্যন্ত বিশেষ এরোপ্লেনের সাহায্যে, এবং কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্যন্ত সাধারণ প্লেনে লোক মারফত চিঠিখানি পাঠানো হইল। ফলে একখানি চিঠির পিছনে কয়েক শত টাকা খরচ হইয়া গেল।

এ বিষয়ে গান্ধীজী যে নীতি অনুসরণ করিতেন, তাহা বহুদিন পূর্বে লেখা একটি প্রবন্ধের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল।

> কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে যথেষ্ট টাকা আছে বলিয়া যেমন-তেমন করিয়া শেষ পাই-পয়সা পর্যন্ত তাহাকে খরচ করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। খরচের সম্বন্ধে সকলের চেয়ে ভাল নীতি হইল, যদি এক কোটি টাকা খরচ করা অনিবার্য হয়, তবে সে টাকা চাহিতে বা ব্যয় করিতে ইতস্তত করা উচিত নয়। আর যদি তাহা না হয়, তবে হাতে এক কোটি টাকা থাকিলেও প্রতি পাই-পয়সা পর্যন্ত যক্ষের ধনের মত রক্ষা করা উচিত।

> **Because an institution happens to have plenty of funds it does not mean that it should anyhow spend away every pie that it possesses. The golden rule is not to hesitate to ask for or**

spend even a crore when it is absolutely necessary, and when it is not, to hoard up every pie though one may have a crore of rupees at one's disposal.—*Young India*, 21-5-31, p. 118.

টাকা বা কোন বস্তুর প্রতি গান্ধীজীর আসক্তি ছিল না, বিদ্বেষও ছিল না। স্বাস্থ্য বা শরীর সম্বন্ধেও তাই। স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার যত্নের অভাব ছিল না; অথচ প্রয়োজন হইলে শরীরকে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিবার জন্য তিনি যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। অত্যন্ত নিয়মিতভাবে চলিয়া, পরিমিত সু-সম আহার করিয়া যে দেহযন্ত্রকে সেবাধর্মের উপকরণ স্বরূপ তিনি রক্ষা করিতেন, আবার মানুষের মনে শুভবুদ্ধি জাগাইবার জন্য সেই দুর্বল শরীরে পদব্রজে নোয়াখালি পরিক্রমার সঙ্কল্প লইতে অথবা কলিকাতায় আমরণ উপবাসের ব্রত গ্রহণ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। মাঝে মাঝে তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, "আমি চিকিৎসকদের চেষ্টায় ঔষধ খাইয়া শুধু দেহধারণ করিয়া পঙ্গু অবস্থায় বাঁচিতে চাই না। আমার দেহ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সজীব জড়পিণ্ডের মত পড়িয়া থাকিবে, ইহা আমার নিকট অসহ্য মনে হয়। কাজ করিতে করিতে দেহপাত ঘটুক, ইহাই আমি প্রার্থনা করি।"

টাকা এবং স্বাস্থ্যের সম্পর্কে তিনি যে উদাসীনতার পরিচয় দিতেন, নিজের গড়া প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কেও সেই বৈরাগ্য প্রকাশ পাইত। মানুষ অনেক সময়ে নিজের চেয়ে নিজের ছেলেকে বেশি ভালবাসে। নিজের মৃত্যু কামনা করিতে পারে, কিন্তু নিজের রচিত কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি অপরে বিন্দুমাত্র আঘাত করিলে হিংস্র মূর্তি ধারণ করে। কিন্তু বিচিত্র এই যে গান্ধীজীকে এ বিষয়ে মমতাশূন্য দেখিতাম। সবরমতীর আশ্রম, অথবা গান্ধী সেবা-সঙ্ঘ নামক সঙ্ঘকে সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া নূতন রূপ দেওয়ার কাজ যেমন তিনি নির্বিকারভাবে করিয়াছিলেন, একদিন প্রয়োজনবোধে

সেবাগ্রাম পিছনে ফেলিয়া পূর্ববঙ্গের স্থায়ী অধিবাসী হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেও তেমনই তাঁহার কোনও দ্বিধা হয় নাই। পিছনের টান আছে বলিয়া আমরা এরূপ ক্ষেত্রে কখনও অনুভব করিতাম না।

নোয়াখালি পৌঁছিবার কয়েক দিবসের মধ্যে তিনি জানাইলেন যে, এখানে তিনি শুধু ধ্বংসলীলা পর্যবেক্ষণ করিতে বা মানুষকে সান্ত্বনা দিতে আসেন নাই, বরং স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য, বাঙালী হইবার জন্য আসিয়াছেন। প্রথমে ঠিক বুঝা যায় নাই, কতদিন থাকিতে হইবে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন, এখানকার কাজের জন্য কয়েক বর্ষব্যাপী চেষ্টার প্রয়োজন। এবং অনুভবমাত্র সেই কার্যে নিষ্ঠার সঙ্গে নিমজ্জিত হইলেন, পিছনের দাগ যথাসম্ভব মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন।

গান্ধীজী এই কারণেই বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ কারণেই আশ্রম হইতে আগত সহকর্মী পিয়ারেলাল, অমতুস সলাম, সুশীলা নায়ার, সুশীলা পাই, ঠক্কর বাপা প্রভৃতি সকলকে দূরে সরাইয়া একান্ত নিরালম্বভাবে স্থানীয় মুসলমান গ্রামবাসীর মধ্যে বাস করিয়া, সেবার দ্বারা তাহাদের বদ্ধ হৃদয়ের দুয়ারে বারংবার করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং ভয়পঙ্কে নিমগ্ন, অত্যাচারজর্জরিত হিন্দুকে উদ্ধার করিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তদানীন্তন সুহরাবর্দি গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতে চেষ্টার অবধি ছিল না, মুসলিম লীগের কর্মীগণ মুসলমান জনসাধারণের ইমানের উপরে তাঁহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী যে জিন্নাহ সাহেবের পাকিস্তানের দাবিকে সুকৌশলে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, মুসলিম লীগকে উহার মূল্যস্বরূপ ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেসের সহিত ময়দানে নামাইবার জন্য সুযোগের

পর সুযোগ খুঁজিতেছেন, ইহা তাহাদের নিকট বলা হইয়াছিল, এবং সেই জন্যই গান্ধীজীকে সাধারণ মুসলমান পর্যন্ত ইসলামের প্রবলতম শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিত। এই অবস্থায় তাঁহার জীবনের আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল। পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া যে কেহ নোয়াখালিতে ইচ্ছা করিলে গান্ধীজীর দেহান্ত ঘটাইতে পারিত, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া সেই আগুনের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সে সময়ে স্বহস্তে তাঁহাকে পুরাতন বন্ধনগুলি উৎপাটিত করিতে দেখিয়াছি। শুধু সহচরদের বন্ধন নয়, নিজের শারীরিক সুখ-সুবিধার বন্ধনকেও তিনি অনাড়ম্বর ভাবে নূতন জীবনযজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এরূপ বীর্যের এক অমোঘ আকর্ষণ আছে বলিয়া গান্ধীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

আমরা যখন নোয়াখালি হইতে বিহারের অভিমুখে যাত্রা করি, তখন বাঙালী সেবকদের মধ্যে একটি যুবক তাঁহার সেবাকার্যে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল। সেই জন্য তাহাকে বিহারে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করা হইল। কে জানে, সেখানে গিয়া আবার নূতন লোককে এ কাজের জন্য তৈয়ারি করিতে কত দিন সময় লাগিবে? কিন্তু গান্ধীজী দৃঢ়ভাবে বলিলেন, এরূপ একজন কর্মীকে এইখানে কোন গ্রামে কাজের জন্য রাখিয়া যাইতে চাই। ভবিষ্যতে যাহা হইবার তাহা হইবে, আমার কাজ আটকাইয়া থাকিবে না। এরূপ কথা শুনিলে মনে আনন্দ হইত; আবার ভয়ও হইত, এই ভাবিয়া যে, বারংবার পরীক্ষা এবং পরিবর্তনের ভার তাঁহার দুর্বল শরীর কতদিন সহ্য করিবে? নিকেতনহীন মানুষ, কিন্তু নিকেতনের বিকল্পে অন্তত স্থির সেবার একটি আচ্ছাদন তো চাই।

কিন্তু বিহারে অবস্থানকালে গান্ধীজীর চরিত্রের মধ্যে একটি

সংস্কারের আভাস নূতন করিয়া অনুভব করিলাম। ইহার জন্য ততটা প্রস্তুত ছিলাম না। গান্ধীজী নিজের হাতে পুরাতন রজ্জুবন্ধনগুলিকে কাটিয়া ফেলিলেও তাহারা সকলে তো তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না। যে চন্দ্র সূর্যের দীপ্তি লাভ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, সূর্যের পক্ষে তাহার প্রয়োজন না থাকিতে পারে বটে, কিন্তু চন্দ্রের তো সূর্যকে প্রয়োজন হয়; আকাঙ্ক্ষা তো অত সহজে মিটিবার নয়। আমরা সাধারণ মানুষ। প্রতিফলিত আলোক এবং উত্তাপের লোভ সম্বরণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। গান্ধীজী হয়ত ইহা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া, সাময়িকভাবে নোয়াখালি পরিত্যাগ করিবার সময়ে সেবাগ্রাম হইতে আগত সহচরগণকে বলিয়া গেলেন, এবার তোমাদের পরীক্ষার সময়। আমি নিকটে থাকিব না, অথচ হয়ত সারা জীবন তোমাদিগকে এখানেই অতিবাহিত করিতে হইবে; সংবাদপত্রের সহিত সম্পর্ক থাকিবে না; এমন অবস্থায় যে কর্মী অধঃপতিত মনুষ্যত্বের পঙ্কোদ্ধার করিবার জন্য একাগ্র হইয়া থাকিতে পারিবে, সেই সার্থক হইবে। সার্থকতা ভিন্ন তাহার আর কোনও পুরস্কার নাই।

বিহারে গান্ধীজী চলিয়া আসিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে, নোয়াখালি হইতে নয়, অপর প্রান্ত হইতে আশ্রমের পুরাতন সহকর্মীগণের মধ্যে দু-একজন আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এমন এক-আধজন কর্মীর কারণে, ব্যক্তিগত অভ্যাস বা কাজকর্ম করার ধরণের প্রভেদ হেতু, শিবিরের ব্যবস্থায় সামান্য বিপর্যয় ঘটিতে আরম্ভ করিল। যে বিশেষ কর্মীটির কথা এখন স্মরণে আসিতেছে, তাঁহার বিরুদ্ধে কিন্তু আমার পক্ষে উপযাচক হইয়া কিছু বলা সম্ভব ছিল না। একদিন ঘটনাক্রমে গান্ধীজী নিজেই এ বিষয়ে কথা পাড়িলেন। তখন আমি তাঁহাকে

বলিলাম, আপনি নোয়াখালিতে যে দৃঢ়তা দেখাইয়া আসিয়াছেন, এখানে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন?

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে সেবাগ্রাম এবং বোম্বাই অঞ্চলের পুরাতন সহকর্মীগণ গান্ধীজীর নিকটে কঠিন পত্র লিখিতেছেন। ব্রহ্মচর্য প্রবন্ধের প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। গান্ধীজী তখন দৃঢ়কণ্ঠে স্বীয় মত ঘোষণা করিতেছেন এবং আমাদিগকে ডাকিয়া কখন কখন ইহাও বলিতেছেন, একা চলাই আমার ভাগ্যের লিখন। সকলে ছাড়িয়া যদি চলিয়াও যায়, তবু আমি যাহাকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, সে পথ হইতে বিচ্যুত হইতে পারিব না। এরূপ অকুণ্ঠ বীর্যের মধ্যেও যখন ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্কে মমতার দ্বারা তাঁহাকে প্রভাবান্বিত হইতে দেখিতাম, তখন মনে হইত, এত বীর্যের সহিত এইরূপ কোমলতা (বা দুর্বলতাই বলি) স্থান পায় কেন? তাঁহার নিকট হইতে নিঃশব্দে চলিয়া আসিলাম।* তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া জানাইলাম, কাজের অসুবিধা ঘটিতেছে, আপনি কেন দৃঢ় হইবেন না? আপনি যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, আপনার জীবনে পুরাতনের বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, সে শক্তি স্তিমিত হইবে কেন? তিনি দুঃখভরা অন্তঃকরণে আমাকে লিখিয়া উত্তর দিলেন—

> তোমার চিঠিতে কপটতা নাই, তুমি স্পষ্টবাদীর মত লিখিয়াছ।...পড়িয়া আমার অন্তরে ব্যথা অনুভব করিয়াছি। আমি দেখিতেছি যে, তোমার নিকটে আমি জাতিচ্যুত হইয়াছি। কিন্তু স্বপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা আমি কিছুতেই করিতে পারি না। আবার

---

* পাঠকের অবগতি বা সন্দেহভঞ্জনের জন্য বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে বিহার হইতে দিল্লী হইয়া তিনি আবার যখন বাঙ্গলা দেশে আসিলেন, তখন আমি আবার তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলাম।

যদি দেখা হয় এবং যদি তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তুমি আলোচনা করিতে প্রস্তুত থাক, তবে আলোচনা করিব। আমার ধারণা তুমি বড় তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছ। ভালবাসা লইও। বাপু।

Your letter is frank...it makes me sad. I see that I have lost caste with you. I must not defend myself. If we ever meet and if you would discuss what I consider to be your hasty judgement, we shall talk. Love. Bapu.

গান্ধীজী আজ আর নাই। যখন তিনি ছিলেন, তখন তাঁহার নিকটে যে নির্মমতা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, সেবাধর্মের যজ্ঞে সকল বস্তুকে একান্তভাবে আহুতি দিবার যে প্রচণ্ডতা কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহা না পাওয়ায় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। পরমহংসদেব যখন ব্রহ্মসাধনা করিতেছেন, তখন বারংবার কালী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দৃষ্টির পথরোধ করিয়াছিলেন। তিনি যখন অসির আঘাতে সেই মূর্তিকে খণ্ডিত করিতে সমর্থ হইলেন, তখনই মুহূর্তের মধ্যে কালীর সমগ্র কালো পিছনের ব্রহ্মসত্তার সহিত একীভূত হইয়া গেল, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বিকল্প সমাধিসাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

গান্ধীজীর মধ্যে এইরূপ, এই তমিস্রবিদারী অসির শাণিত প্রভা দেখিব, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া গিয়াছিলাম। তাহা যে পাই নাই, এমন কথা বলিব না। ক্ষণে ক্ষণে তাহার দর্শনলাভ ঘটিত; কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে নহে। তাহার অতিরিক্ত, নরসমাজের সংস্কারের অবশেষও গান্ধীজীর মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

গান্ধীজীকে উত্তরোত্তর বিদ্যুৎশিখার পরিবর্তে বরং মহামহীরুহের মত মনে হইতে লাগিল। অনুভব করিলাম, যেন তাহাই তাঁহার যোগ্যতর প্রতীক। মানুষ কত বড় হইতে পারে, অপর মানুষের সহিত সংযোগ রক্ষা করা সত্ত্বেও কেমনভাবে আকাশস্পর্শী হইতে পারে,

তাহারই সাক্ষাৎ পরিচয় গান্ধীচরিত্রের মধ্যে লাভ করিয়াছিলাম। ধরণী হইতে উদ্ভূত বিশাল মহীরুহ শত শত যুগের বৃদ্ধি এবং বেদনার ভার বহন করিয়া জনসমাজের অরণ্যের পরপারে যে গগন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, তাহাকেই যেন চুম্বন করিতেছে, কিন্তু ধরণীর সহিত যোগ তাহার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই। আর শুধু ছিন্ন হয় নাই, তাহা নহে। যে শিকড় মাটির মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে, তাহার শিরায় শিরায় যে সকল মাটির ঢেলা জড়াইয়া রহিয়াছে, যে মৃত্তিকাস্তূপ হইতে, যে অগণিত ক্ষুদ্রতর জীবরাশির দেহপঙ্ক রসাস্বাদনের দ্বারা, মহীরুহ পুষ্টিলাভ করিতেছে, তাহাদের প্রতি, সেই মাটির প্রতি, সেই জীবকণিকাসমূহের প্রতি, তাহার মমতার যেন অবধি নাই। তাহাদের রক্ষা করিতে, নিজের পত্ররাজির আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে আরও সমৃদ্ধ করিতে, বৃদ্ধ মহীরুহের যেন ক্লান্তি নাই, যত্নের শেষ নাই।

বন্ধুবর কানু গান্ধীর নিকটে শুনিয়াছিলাম, গান্ধীজী ইদানীং যেন নরম হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কারাবাসের পূর্বে তাঁহার চরিত্রে অসির প্রভার মত যে তীব্রতা প্রকাশ পাইত, কারাবাসের মধ্যে মহাদেব দেশাই এবং তৎপরে কস্তুরবার মৃত্যুর পর নাকি তাহা হ্রাস পাইয়াছিল। আমি যে অবস্থায় ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সাহচর্যের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা ইহারও পরের ঘটনা। অতএব বিচিত্র নয় যে, মানবের প্রতি কোমলতা, অপরকে রক্ষা করিবার, ধারণ করিবার, পোষণ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চরিত্রে সে সময়ে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিল, পুরুষ মাতৃত্বের মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছিল।

ভারতীয় শিল্পে অর্ধনারীশ্বরের এক অপরূপ কল্পনা একদা কোনও সাধক সৃজন করিয়াছিলেন। পাথরের গড়া মূর্তিতে নয়, মাটির গড়া মানবচরিত্রের মধ্যে তাহারই প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। ধন্য হইয়াছি।

সেনাপতি গান্ধী

হিমালয় পর্বত। তাহার বুকে কত নদীরই না উদ্ভব হইয়াছে! তাহার মধ্যে কোনটি ছোট, কোনটি বা বড়। কোনটি পাহাড়ের কোল হইতে পাথরের খণ্ড বহিয়া বর্ষা ঋতুর সময়ে দুরন্ত বেগে সম্মুখের সকল বাধাকে প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ করিয়া অগ্রসর হয়, পাশের মাটি হইতে গাছপালা ভাসাইয়া লইয়া যায়; আবার বর্ষার অন্তে আয়ু নিঃশেষ হইলে জলহীন শুষ্ক দ্রোণীর আকারে পড়িয়া থাকে। আবার কোন নদী বহু জলধারার সঙ্গমপুষ্ট হইয়া কখন পর্বতমালার সমান্তরাল উপত্যকাকে আশ্রয় করিয়া অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে, কখন বা পর্বতকে ভেদ করিয়া ভৈরবদর্শন গভীর খাড়া খাদের পথে পর্বতশ্রেণীকে অতিক্রম করিয়া যায়। অবশেষে যখন সমতল প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন বক্ষে বালুকা বা কর্দমরাশির ভাণ্ডার ধারণ করিয়া চলিতে থাকে, এবং নিম্নভূমিকে মৃত্তিকাদান এবং রসসিঞ্চনের দ্বারা শ্যামল এবং ফলপুষ্পশোভিত করিয়া তোলে।

তেমনই ভারতবর্ষের ইতিহাস। অগণিত যুগ ধরিয়া হিমালয় পর্বতের মত যে সংস্কৃতি এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার উপরে মেঘের বর্ষণ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল, যাহার বক্ষোধৃত পলিকণা হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলে নিম্নে জনবহুল সমতল প্রদেশ শুষ্ক ধূলায় ধূসর হইয়া উঠিয়াছিল, ভূমির অন্তর হইতে প্রবাহিত প্রস্রবণপুষ্ট নূতন কোনও নদী যেমন সেই শুষ্ক অথচ উর্বর ভূমিতে আবার প্রাণরসের সঞ্চার করিয়া থাকে, গান্ধীজী তাহারই সমতুল্য ছিলেন। তাঁহার জীবনধারা, অর্থাৎ তাঁহার আদর্শ এবং যে-সকল সংস্কারের বসনভূষণ পরিয়া সেই

আদর্শ নরসমাজে প্রকাশিত হইত, তাহার উপাদানসমুচ্চয় ভারতভূমিতে, অর্থাৎ ভারতের অন্তরস্থ সংস্কৃতির ফল্গুনদী হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। মেঘলোক হইতে আগত বারির মত কোন কোন উপাদান হয়তো অন্য সমাজ হইতে আহরিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা ভারতের মৃত্তিকা-স্পর্শে এবং গান্ধীজীর প্রতিভাবলে রূপান্তরিত ও সাধারণের গ্রহণযোগ্য হইয়া গিয়াছিল। গান্ধীজীবনের সেই জল, সেই রস, ভারতপর্বতের অঙ্ক হইতে প্রসৃত হইয়া জনসম্ভারে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষকে শ্যামল এবং নবজীবনপুষ্ট করিবার জন্যই যেন প্রকাশ লাভ করিয়াছিল।

গান্ধীচরিত্রের যে রূপ পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা গান্ধীজীর শেষ বয়সের পরিণত মূর্তি। নদী যেমন শুধু জলসমষ্টি নয়, তাহার আধার এবং জল দুই মিলিয়া নদী হয়, গান্ধীচরিত্রের মধ্যেও তেমনই কিছু অংশ ঊর্ধ্বলোকের দান, এবং কিছু মাটির আধার হইতে সঞ্জাত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে যাহা প্রাণবান, যাহা মহৎ, তাহার অধিকাংশই ভাবরাজ্যের তুষারধবল শিখর হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। আবার মাটির তৈয়ারি মানবলোকের সংস্কারের স্পর্শে নদীজলের স্বচ্ছতা সাময়িক ভাবে ক্ষীণ হইয়া যাইত। আমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত মন হয়তো এই কারণে পীড়া অনুভব করিতে পারে, কিন্তু ইহার অন্যথা হওযাই বরং অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হওয়া উচিত।

গান্ধীচরিত্রের বিশালকায় নদী নরসমাজের মধ্যে কি ভাবে নিজের প্রাণবান স্রোতের পথ করিয়া লইয়াছিল, কেমন করিয়া পার্শ্ববর্তী ভূমিকে সিক্ত এবং সজীব করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, বরং তাহারই আলোচনায় আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। গান্ধীজী কেমন-ভাবে বহু মানুষের সহায়তায় জনসাধারণের মুক্তির সন্ধান করিতেন, এবং দ্বিতীয়ত, তাঁহার চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া বহু মানুষের চরিত্র

কি ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তাহা বিশ্লেষণ করিলে আমাদের যথেষ্ট চিন্তার উপাদান মিলিবে। হয়তো আমরা ভবিষ্যতের জন্য কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিতেও সমর্থ হইব।

সেই উদ্দেশ্যে প্রথমে রাজনীতির ক্ষেত্রে, বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার সহায়তায় গান্ধীজী কিরূপ স্থির এবং অবিচলভাবে গণতন্ত্রের বনিয়াদ রচনা করিতেছিলেন, নোয়াখালির প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া তাহারই ইতিহাসের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিব।

নোয়াখালির পূর্বেকার ইতিহাস

নোয়াখালি দুর্ঘটনা ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সংঘটিত হয়। কিন্তু ইহার পূর্বের ইতিহাস কিছু পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে।

১৯৪৪ সালে ৬ই মে তারিখে জেল হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর, ৯ই হইতে ২৭এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গান্ধীজী জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইতিপূর্বে শ্রীযুত রাজাগোপালাচারি মুসলিম লীগের লাহোর দাবি অনুযায়ী একটি প্রস্তাব রচনা করিয়াছিলেন। রাজাজীর বিশ্বাস ছিল, কংগ্রেস এবং লীগ যদি সেই প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লন, তবে জাতীয় ঐক্যের দ্বারা স্বাধীনতার দাবিকে অনেক পরিপুষ্ট এবং দৃঢ় করা যাইবে। গান্ধী-জিন্নাহ আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ রাজাজীর প্রস্তাবটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

> **ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিস্বরূপ শর্তাবলী। গান্ধীজী এবং মিঃ জিন্নাহ ইহাতে সম্মতিজ্ঞাপন করার পর কংগ্রেস এবং লীগের দ্বারা এই চুক্তি সমর্থন করাইবার জন্য উভয়ে চেষ্টা করিবেন।**

১। নিম্নলিখিত শর্তানুসারে স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র গঠিত হইবে, ইহা মানিয়া লইয়াছে বলিয়া, মুসলিম লীগ এতদ্দ্বারা ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে সমর্থন করিতেছে। সেই উদ্দেশ্যে লীগ কংগ্রেসের সহিত অস্থায়ী অন্তর্বর্তীকালীন গভর্মেণ্টগঠনে সহযোগিতা করিবে।

২। যুদ্ধ শেষ হইলে, উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব-ভারতে যে সকল সংলগ্ন জেলাগুলিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যা অপরাপর সম্প্রদায়ের সংখ্যা অপেক্ষা তুলনায় অনেক বেশি, সেগুলিকে নির্ধারিত করিবার ভার একটি কমিশনের উপরে ন্যস্ত করা হইবে। যে অঞ্চল এইভাবে কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত হইবে, সেখানে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বা অন্য কোনও কার্যকরী ভিত্তির উপরে রচিত ভোটাধিকারের সাহায্যে সমগ্র অধিবাসীবৃন্দের মতিগণনা করা হইবে। ভারতবর্ষ হইতে সেই অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হইতে চায় কি না, সেই প্রশ্নের মীমাংসা এইরূপে স্থিরীকৃত হইবে। যদি অধিকাংশ ব্যক্তি ভারতবর্ষ হইতে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের সপক্ষে ভোট দেয়, তাহা সত্ত্বেও উভয় অঞ্চলের প্রান্তবর্তী জেলাগুলির পক্ষে যে কোন রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হইবার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৩। মতিগণনার পূর্বে সকল পার্টিই অবাধে স্বীয় মত প্রচার করিতে পারিবেন।

৪। যদি ব্যবচ্ছেদ ঘটে, তবে উভয় রাষ্ট্র দেশরক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহন এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় ব্যাপারে সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিবে।

৫। প্রয়োজন হইলে লোকাপসারণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে।

৬। কেবলমাত্র ব্রিটেন কর্তৃক ভারতশাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা এবং দায়িত্ব হস্তান্তরিত করিবার পর, উপরোক্ত শর্তগুলি উভয় পক্ষের উপরে প্রযোজ্য হইবে।

Basis for terms of settlement between the Indian National Congress and All-India Muslim League to which Gandhiji and Mr. Jinnah agree and which they will endeavour respectively to get the Congress and the League to approve :

(1) Subject to the terms set out below as regards the constitution of Free India, the Muslim League endorses the Indian demand for Independence and will co-operate with the Congress in the formation of a provisional interim Government for the transitional period.

(2) After the termination of the war, a commission shall be appointed for demarcating contiguous districts in the north-west and east of India, wherein the Muslim population is in absolute majority. In the areas thus demarcated, a plebiscite of all the inhabitants held on the basis of adult suffrage or other practicable franchise shall ultimately decide the issue of separation from Hindustan. If the majority decide in favour of forming a sovereign State separate from Hindustan, such decision shall be given effect to, without prejudice to the right of districts on the border to choose to join either State.

(3) It will be open to all parties to advocate their points of view before the plebiscite is held.

(4) In the event of separation, mutual agreements shall be entered into for safeguarding defence and commerce and communications and for other essential purposes.

(5) Any transfer of population shall only be on an absolutely voluntary basis.

(6) These terms shall be binding only in case of transfer by Britain of full power and responsibility for the governance of India. (প্রস্তাবের প্রথম রচনাকাল ৮-৪-১৯৪৪)

নোয়াখালিতে গান্ধীজী একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, লীগের দাবিকে মানিবার চেষ্টায় তিনি রাজাজীর প্রস্তাব অপেক্ষা কোনদিন আর অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ভারতের অঞ্চলবিশেষের লোক যদি কার্যত স্বাধীন হইতে চায়, তবে অবশ্য তাহাদের সেই অধিকার স্বীকার করিলেও তিনি উভয় অঞ্চলকে কতকগুলি সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ দেখিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু জিন্নাহ সাহেবের দুই অধিজাতীয়ত্বের দাবিকে কোনদিন, কোন রকমে, তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় যে, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কোনও অঞ্চলের লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেমন তাহাদিগকে ভারতের সঙ্গে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখা অন্যায় হইবে, তেমনই ভারতকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একাধিক রাজ্যে ব্যবচ্ছেদ করাও অন্যায় হইবে। সেই জন্য তিনি এক মধ্যপথ অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও সাময়িক প্রয়োজনবশে তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইযাছিলেন। কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল, স্বাধীনতার ব্যাপারে যদি লীগ এবং কংগ্রেস একযোগে কাজ করে, যদি অহিংস সংগ্রামের দ্বারা জাগ্রত জনশক্তি স্বাধীনতা অর্জন করিতে সক্ষম হয়, তবে উভয় সম্প্রদায়ের মনে বর্তমানে যে ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা অনেকাংশে ঘুচিয়া যাইবে, যে মধ্যবিত্তকুল স্বীয় স্বার্থ-সন্ধানের সংকীর্ণ বুদ্ধির ফলে জনসমূহকে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক রাখার জন্য দায়ী, তাহারা পিছাইয়া পড়িবে, এবং জনসাধারণের শক্তির দ্বারা অর্জিত স্বাধীনতার ভিত্তির উপরে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি হইতে মুক্ত একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হইবে।

বহুকাল পূর্বে, ১৯২০ এবং ১৯২১ সালে তিনি বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন—

আমি আইনজীবী বা উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর উপরেই শুধু অসহযোগের প্রতি ধাপের সাফল্যের জন্য নির্ভর করি না। যতই আমরা অগ্রসর হইব, ততই জনসাধারণের সহযোগিতার উপরে আমাদের নির্ভরশীলতা এবং ভরসা বৃদ্ধি পাইবে।

কিন্তু কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষ সহযোগিতা করুক অথবা না করুক, জাতির অগ্রগতিকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না। অশিক্ষিত কারিগর শ্রেণী, সাধারণ লোক এবং ভারতের নারীজাতি, এবারে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের নিকট পৌঁছিবার জন্য প্রথমে শিক্ষিত শ্রেণীকে ডাক দিতে হইয়াছিল। কে থাকিবে, কে যাইবে, প্রথমে তাহা বাছাই করার প্রয়োজন ছিল। শিক্ষিত শ্রেণীকে এইজন্যই কষ্টিপাথরে ফেলিয়া পরীক্ষা করিতে হইয়াছে। বিপ্লবের আরম্ভ তাহাদের দ্বারা এবং তাহাদের মারফত অনুষ্ঠিত করিতে হইয়াছে।

I do not merely rely upon the lawyer class or highly educated men to enable the Committee to carry out all the stages of non-co-operation. My hope lies more with the masses so far as the latter stages of non-co-operation are concerned.—*Young India*, 18-8-20 in *Selections from Gandhi*, no. 332.

But whether they do or not, the progress of the nation cannot be arrested by any person or class. The uneducated artisans, the women, the men in the street, are taking their share in the movement....The appeal to the educated classes paved the way for them. The goats had to be sifted from the sheep. The educated classes had to be put upon their trial. The beginning had to be made by and through them.—*Selections from Gandhi*, no. 333.

সেনাপতি গান্ধী এইরূপ মনোভাবের বশবর্তী হইয়াই বোধ হয় রাজাজীর প্রস্তাবে প্রথম এবং ষষ্ঠ ধারার উপরে আশা স্থাপন করিয়া

জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ সালে বারংবার চেষ্টা করিয়াও যখন গান্ধীজীকে দিয়া হিন্দু এবং মুসলমান যে দুই অধিজাতি ইহা স্বীকার করানো গেল না, এবং তদনুযায়ী সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত দুইটি রাষ্ট্র গঠনে গান্ধীজী মত দিতে পারিলেন না, তখন উভয়ের আলোচনা নিষ্ফল হওয়ায় সমাপ্ত করিয়া দেওয়া হইল। ২৮এ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ গান্ধীজী সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,

> আমার মতে, উভয় প্রস্তাবে (রাজাজী প্রণীত এবং অপরটি রাজাজী-প্রস্তাবের এক সংশোধিত সংস্করণ) সমগ্র ভারতের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া আমাদের পক্ষে যতদূর যাওয়া সম্ভব আমরা ততদূর অগ্রসর হইয়াছিলাম। (জিন্নাহ সাহেবের সম্পর্কে তিনি ইহাও বলিলেন,) বিগত তিন সপ্তাহের অভিজ্ঞতা হইতে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছে যে, (ব্রিটিশ শাসকরূপ) তৃতীয় দলের অস্তিত্বের কারণেই মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই। যে মন দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ তাহার নিকটে মুক্ত মানুষের আচরণ আশা করা যায় না।

> **In my opinion, either formula gives as such as can reasonably be expected with due regard to the interests of the whole of India.**
>
> **My experience of the precious three weeks confirms me in the view that the presence of the third power hinders the solution. A mind enslaved cannot act as if it were free.**

ইহার প্রতিবাদস্বরূপ জিন্নাহ সাহেব কশাঘাত করিয়া বলিলেন,

> মুসলিম লীগের অধিকার এবং প্রতিনিধিত্বের দাবির বিরুদ্ধে মিঃ গান্ধী প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তিনি আমার বিরুদ্ধে মুসলমানদের উসকানি দিতেছেন।...যে কোন বুদ্ধিমান লোকের নিকটে ইহা স্পষ্ট যে রাজাজী-প্রস্তাব এবং তাঁহার সংশোধিত প্রস্তাবের মধ্যে

কোনও প্রভেদ নাই।...ইহা বাস্তবিক আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি ক্লান্তিজনক ভাবে বারংবার বলিয়া চলিয়াছেন যে তাঁহার প্রস্তাবের দ্বারা লাহোর প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত দাবিকে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা মিথ্যা, অথবা কুটিল বাক্য কল্পনা করা যায় না; এবং মিঃ গান্ধী আপাতত সরল ও অকপটভাবে এই কথা বারংবার বলিয়া চলিয়াছেন।

জনসাধারণকে এভাবে ভ্রান্ত পথে চালিত করিয়া লাভ কি? যে গোলোযোগের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বাড়াইয়া কোন ফল নাই, কেননা প্রস্তাবিত শর্তগুলি স্বীকার করিলে আমাদের ফাঁদে পড়িতে হইবে এবং মৃত্যুপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হইবে। উহার অর্থ দাঁড়াইবে পাকিস্তানকে কবর দেওয়া...

দুঃখের বিষয় মিঃ গান্ধী মনে করেন যে, তৃতীয় দলের অস্তিত্বের কারণেই কোনও নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো যাইতেছে না। তিনি যখন লেখেন, "যে মন দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ তাহার নিকট মুক্ত মানুষের আচরণ আশা করা যায় না", তাহা পড়িয়া আমার কষ্ট হয়। পৃথিবীতে কোন শক্তি মানুষের মন ও আত্মাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারে না; এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিঃ গান্ধী নিজের মনকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে দিবেন না। আমি আশা করি, তিনি তাঁহার এই পুরাতন রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

Apart from challenging the representative and authoritative status of the Muslim League, he is inciting Mussulmans against me...any intelligent man can now see that in substance there is no difference between the two...It is really amazing that he should repeat *ad nauseam* that he has by his offer satisfied the essence or substance of the Lahore Resolution. It would be difficult to conceive of a more disingenuous, tortuous or crooked assertion, which he keeps on repeating naively.

What is the use of misleading people and making confusion worse confounded if we accept these terms, which present us with a veritable trap and a slough of death ? It means the burial of Pakistan...

It is a pity that he thinks that the presence of a third party hinders a solution, and it was very painful to me when he said, "A mind enslaved cannot act as if it were free." No power can enslave the mind and soul of man, and I am sure Mr. Gandhi is the last person to allow his mind to be enslaved. I do hope that he will get over this depression from which he is perpetually suffering.

অনেকে মনে করিয়াছিলেন, গান্ধীজী ভারতব্যবচ্ছেদের দাবি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কারণ তিনি দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি (Sovereign States) মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু জিন্নাহ সাহেব এবং মুসলিম লীগ অনুভব করিলেন যে, যেভাবে উভয় তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রকে দেশরক্ষা-আদি ব্যাপারে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধার প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে সার্বভৌম রাষ্ট্র শুধু নামেই সার্বভৌম থাকিবে, পাকিস্তানকে কার্যত কবরই দেওয়া হইবে। উপরন্তু, পাকিস্তানের দাবির ভিত্তিস্বরূপ হিন্দু এবং মুসলমানের পৃথক-অধিজাতীয়ত্বের ব্যাপারে গান্ধীজীকে কিছুতেই নোয়ানো গেল না।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

অতএব বোধ হয় বহু চিন্তার পর লীগ সম্মুখ-সংগ্রামের সাহায্যে ভারতের হিন্দু-জনসাধারণের দ্বারা পৃথক অধিজাতীয়ত্বের দাবিকে সরাসরি স্বীকার করাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অনেক ঘটার পর, অনেক অগ্নিগর্ভ বাক্যবাণ বর্ষণের পর, ১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ তারিখে মুসলিমলীগ-শাসিত বাংলা দেশের রাজধানী কলিকাতা শহরে

প্রথমে সেই যুদ্ধের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। আক্রমণ অতর্কিত হওয়া সত্ত্বেও অতি অল্পক্ষণের মধ্যে কলিকাতার অমুসলমান অধিবাসী রুখিয়া দাঁড়ায় এবং এক সপ্তাহ তাণ্ডবলীলার পরে জয়-পরাজয় অমীমাংসিত থাকিয়া যায়।

ইহার প্রায় দুই মাস পরে, ১০ই অক্টোবর ১৯৪৬ তারিখে, নোয়াখালি জেলার পশ্চিমভাগে অবস্থিত পাঁচটি থানায় ধ্বংসের লীলা নূতন আকারে দেখা দেয়। নোয়াখালিতে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা আঠার জন; কিন্তু দেশের সম্পদের প্রায় বারো আনা অংশ তাহাদেরই অধিকারে ছিল। চাষী বলিতে মুসলমান এবং নমঃশূদ্র জাতীয় লোকই বুঝাইত; এরূপ অবস্থায় বহুদিন হইতে ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের অসন্তোষ ধূমায়িত হইতেছিল। উপরন্তু দশ বৎসর যাবৎ বাংলায় লীগ শাসনের ফলে ভূমি-স্বত্ব আইনের সংস্কার এবং ঋণসালিশী-বোর্ড প্রতিষ্ঠার দ্বারা জমিদার এবং মহাজন শ্রেণীর হিন্দু ইতিপূর্বে খানিক জখম হইয়া গিয়াছিল। এই সকল অবস্থার সুযোগ লইয়া স্থানীয় মুসলমানগণের মধ্যে উৎসাহী ব্যক্তিবৃন্দ হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিল। প্রায় তিন শত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বাছিয়া বাছিয়া হত্যা করা হয়, ষাট হাজার কুটির লুণ্ঠিত, ভগ্ন বা অগ্নিদগ্ধ হয় এবং অঞ্চলবিশেষে নারীধর্ষণও ঘটে। কিন্তু সকলের চেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হইল এই যে, যে-সকল হিন্দু পলাইতে সক্ষম হয় নাই, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভয়ের বশে ইসলামে ধর্মান্তরিত হইয়াছিল।

১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টোবর নোয়াখালিতে আগুন জ্বলিয়া উঠিলেও সাত দিন পর্যন্ত বাহিরের কেহ সে সংবাদ জানিতে পারে নাই। যেদিন প্রথম সে সংবাদ প্রকাশিত হইল, গান্ধীজী সেই দিনই স্থির করিলেন, তাঁহার স্থান আর দিল্লীতে নয়। কিন্তু নোয়াখালি

যাত্রার পূর্বে তিনি কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সম্মতি লইবার জন্য কয়েক দিবস অপেক্ষা করিলেন। কলিকাতায় পৌঁছিতে ২৯এ অক্টোবর হইল, এবং এখানে কয়েক দিন অতিবাহিত করিবার পর তিনি ৭ই নভেম্বর ১৯৪৬ তারিখে নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত চৌমুহানি শহরে পদার্পণ করেন।

নোয়াখালি দুর্ঘটনার ফলে শুধু বাংলা দেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার রূঢ় আঘাতে হিন্দুর মনে সাম্প্রদায়িকতার ভাব জাগিয়া উঠিল এবং যে জাতীয়তার বোধ ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতেছিল, তাহা ভাসিয়া যাইবার সম্ভাবনার উদয় হইল। উপরন্তু, নিজেদের অসহায় অবস্থা অনুভব করার ফলে কেহ কেহ ইহাও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, ইংরেজ সরকার স্বীয় বাহুবলের দ্বারা মুসলিম জনতার অত্যাচার হইতে সংখ্যালঘু প্রজাকে রক্ষা করুন। অর্থাৎ, ১৯২১ হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত সংগ্রামের পর সংগ্রামকে উপলক্ষ্য করিয়া ভারতবাসীর মনে যে আত্মনির্ভরশীলতার ভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহাও জাতীয়তার সহিত একযোগে বিনষ্ট হইবার উপক্রম ঘটিল। বিদ্যার পরিবর্তে অবিদ্যার জয়জয়কার যেন চতুর্দিকে ঘোষিত হইতে লাগিল।

গান্ধীজীর দ্বারা রোগনির্ণয়

এইরূপ ঘটনা এবং সম্ভাবনাসমূহের সন্ধিক্ষণে গান্ধীজী নোয়াখালি জেলায় পদার্পণ করিলেন। তিনি প্রথমে শুধু স্থানীয় সরকারী এবং বেসরকারী ব্যক্তিগণের সহায়তায় কি ঘটিয়াছে তাহা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অত্যাচার এবং নারীধর্ষণের পশ্চাতে ক্রমশ

তাঁহার দৃষ্টিতে যে মূল সমস্যা প্রকটিত হইল তিনি অনন্যমনা হইয়া সেই রোগেরই প্রতিকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

গান্ধীজী অনুভব করিলেন যে, স্থানীয় উৎসাহী মুসলমান জনতা ভারতের একটি ক্ষুদ্র খণ্ডকে বিচিত্র উপায়ে পাকিস্তানের ভিত্তিতে পরিণত করিতেছে। যেখানে অমুসলমান সংখ্যায় কম, সেখানে তাহাদের সকলকে ইসলামে দীক্ষিত করিয়া তাহারা সম্পূর্ণ মুসলমানের দ্বারাই অধ্যুষিত একটি প্রদেশ রচনা করিতে চায়। যদি সংগ্রাম করিতে হয়, ইহারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতি যুদ্ধমাত্রের উপসর্গস্বরূপ। তাহার দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া রাজনৈতিক লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইলে অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে।

সেইজন্য ২৪এ নভেম্বর ১৯৪৬ তারিখে যখন জনৈক বিশিষ্ট সাংবাদিক গান্ধীজীকে ধর্ষিতা এবং অপহৃতা নারীদের উদ্ধারের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, গান্ধীজী স্থির দৃষ্টি লইয়া বলিলেন, জোর করিয়া ধর্মান্তরিত করাকেই তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ বলিয়া মনে করেন; নোয়াখালিতে অপর যাহা ঘটিয়াছে তাহা ওই মূল রোগের উপসর্গ মাত্র। কিন্তু তাঁহার সকলের চেয়ে দুঃখ হইল এই যে, এখানের অধিবাসীগণ ধর্মান্তরগ্রহণকে অতটা গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি পরের মত সম্বন্ধে সহিষ্ণু, এমন কি তিনি সকল ধর্মকেই সমান মর্যাদা দিয়া থাকেন; কিন্তু বলপ্রয়োগের দ্বারা ধর্মান্তরিত করা তাঁহার নিকট একেবারে অসহ্য বলিয়া মনে হয়। মানুষ যদি অন্তরের মধ্যে পরিবর্তনের ফলে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, তাহাতে দোষের কিছু নাই। কিন্তু এখানে সেরূপ ঘটনা ঘটে নাই। ভয়ের বশে, মানুষ নিজেকে নীচু করিয়াছে, যে ডালের উপরে তাহার আশ্রয় সেই ডালকেই সে কাটিতে বসিয়াছে।

১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ সাল। আমিষাপাড়া নামক গ্রামের কাছে বড় গোবিন্দপুরে ৺ভারত ভৌমিকের বাড়ি দেখিতে গেলাম। সেই বাড়ির জনৈক যুবক পাকা ঘরের দেওয়ালে নিহত পিতার রক্তধারা দেখাইলেন। পর-দিবস সাতঘরিয়া গ্রামে যাত্রা করিবার সময়ে যখন গান্ধীজী সেই লুণ্ঠিত এবং দগ্ধ গৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সেই যুবক এবং পরিবারের অপর কয়েক ব্যক্তি সাশ্রুনয়নে তাঁহার নিকট সান্ত্বনা বাক্যের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু গান্ধীজী অবিচলভাবে তাহাদিগকে বলিলেন, সান্ত্বনার প্রত্যাশা করা ঠিক নহে। তিনি নোয়াখালিতে অন্য ব্রত লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মানুষ যাহাতে পিছনের দিকে না তাকাইয়া বীরের মত ভবিষ্যতের গহনের মধ্যে পথসন্ধান করিতে পারে, সেই শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

১লা মার্চ ১৯৪৭ সাল। হাইমচর প্রার্থনা-সভায় কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিল,

> যাহাদের আপন জন নিহত হইয়াছে, দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের দ্বারা রচিত নীড় যাহাদের নষ্ট হইয়াছে, তাহারা কেমন করিয়া ভুলিয়া যাইবে, কেমন করিয়া ক্ষমা করিবে? দুষ্কৃতিকারীগণ যে সম্প্রদায় হইতে আসিয়াছিল, সেই সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষের পরিবর্তে ভ্রাতৃত্বের ভাব আসিবে কেমন করিয়া?

গান্ধীজী উত্তরে বলিয়াছিলেন,

> ভুলিবার এবং ক্ষমা করিবার একমাত্র উপায় হইল, বিহারে যাহা ঘটিয়াছে তাহা স্মরণ করা। সেখানে নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা অপেক্ষা অনেক জঘন্য ব্যাপার ঘটিয়াছে। সেখানে হিন্দুরা যে অত্যাচার করিয়াছে, মুসলমানেরা তাহার প্রতিশোধ লউক, ইহা

কি কেহ কামনা করে? না, সেরূপ কামনা করা উচিত নয়। অতএব পিছনের ঘটনা ভুলিয়া আমাদিগকে ক্ষমাধর্ম অবলম্বন করিতে হইবে।

Q. Those who have lost their dear ones or the homes which they had built up through years of patient labour, find it extremely difficult to forgive and forget. How can they subdue that feeling and look upon the community from which the miscreants came with a feeling of brotherliness?

A. The one way to forget and forgive was to contemplate Bihar, which had done much worse than Noakhali and Tipperah. Did they want Muslims to take dire vengeance for the Hindu atrocities there? They could not. From this, they should learn to forget and forgive.

কেহ কেহ এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, নোয়াখালির অত্যাচারের পরে কি কাহারও পক্ষে মাথা ঠিক রাখা সম্ভব? তাহার উত্তর গান্ধীজীর ভাষায় না দিয়া অন্য দিক হইতে দিবার চেষ্টা করিব। ফন ক্লাউসেভিৎস বর্তমান জগতে রণশাস্ত্রের মধ্যে একজন আচার্য বলিয়া সম্মানিত হন। তাঁহার প্রিন্সিপল্‌স অফ ওয়ার নামক গ্রন্থে লেখা আছে,

আমাদের শত্রুর হাতে যে পরিমাণ শক্তি এবং তাহার সপক্ষে যে সকল সুযোগ আছে, সংগ্রামের সন্ধিক্ষণে আমরা কি করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তি এবং সুযোগ লাভ করিতে পারিব, যুদ্ধের শাস্ত্র তাহারই সন্ধান করে। সকল ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব হয় না বলিয়া শাস্ত্রে মনের দিকটাও বিবেচনা করা হয়। শত্রুর ভুলের জন্য, অথবা আমাদের দুঃসাহসিক কাজের ফলে, এমন কি আমরা মরিয়া হইয়া যাহা করিতে চাই, সে-সকলের ফলাফলও হিসাবের মধ্যে আনিতে হয়। সমরশাস্ত্রের মধ্যে ইহার একটিকেও বাদ দিলে চলে না;

যুদ্ধের মধ্যে যে কোনও অবস্থা আসিতে পারে, যুক্তিসহযোগে তাহার বিষয়ে চিন্তা করা কর্তব্য। যুদ্ধের মধ্যে আমাদের পক্ষে সবচেয়ে খারাপ কোন্ অবস্থা আসিতে পারে তাহার বিষয়ে বারংবার ধ্যান-ধারণা করা উচিত। ইহার ফলে, সেরূপ অবস্থার উদয় সত্যসত্যই ঘটিলে, তাহা যেন আমাদের নিকট অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে না হয়। এইরূপ অভ্যাস করিলে আমরা সুযোগ বুঝিয়া যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু সাহসে পূর্ণ কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইব। কোন সমালোচকই সেরূপ কর্মের দোষ বাহির করিতে পারিবেন না।

জীবনের সন্ধিক্ষণে, যুদ্ধের ঝঙ্কারের মধ্যে, তুমি একদিন অনুভব করিবে যে যখন সকলের চেয়ে তোমার সহায়তার প্রয়োজন বেশি, তখন উপরোক্ত নীতিই তোমার সহায় হইবে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ হিসাবের তালিকা তখন তোমার কোন কাজে লাগিবে না।

২। আমাদের সপক্ষে শারীরিক অথবা মানসিক শক্তির আধিক্যের বিষয়ে চিন্তা করিবার সময়ে, যুদ্ধকালে আমরা যেন সর্বদা কি উপায়ে জয়লাভ করিতে পারি সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখি। কিন্তু সব সময়ে তো তাহা সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে জয়ের সম্ভাবনা হিসাবমত যদি নাও থাকে, **তখন যদি আর কিছু ভাল করিবার মত আমরা না পাই, তবে সেই সম্ভাবনা সত্ত্বেও, বা তাহার বিরুদ্ধেই** আমাদের নূতন কর্মপন্থা স্থির করিতে হইবে। যদি সেরূপ অবস্থায় আমরা নিরাশ হই, যখন সবই যেন ষড়যন্ত্র করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে চলিয়াছে, তবে যে-সময়ে স্থির বুদ্ধির সকলের চেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেই সময়ে তাহাকে বিসর্জন দেওয়া হইবে।

সেইজন্য, যখন সাফল্যের সম্ভাবনা আমাদের বিরুদ্ধে চলিয়াছে,

তখনও আমাদের কর্মধারাকে যেন আমরা যুক্তিবিরুদ্ধ বা অসম্ভব বলিয়া মনে না করি ; কারণ যদি তাহা অপেক্ষা ভাল কিছু করিবার মত না থাকে, এবং হাতে যে কয়টি বল আছে তাহার যথাযথ ব্যবহার করি, তবে সে কাজকে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে।

যুদ্ধের মধ্যে যে দৃঢ়তা এবং অচঞ্চলভাব রক্ষা করা কঠিন, সে দুইটি ভাবকে বজায় রাখিতেই হইবে। এই দুই গুণ না থাকিলে, মনের যতই প্রতিভা থাকুক না কেন, সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অতএব নিজেদের সম্মান বজায় রাখিয়া যে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করিতেও হইতে পারে, ইহা যেন আমরা মনে মনে ভাবিয়া রাখি। বারম্বার এই সম্ভাবনার বিষয়ে চিন্তা করার ফলে ইহা যেন আমাদের নিকট আর অপ্রত্যাশিত মনে না হয় ; সুপরিচিত হইয়া যায়। ইহা স্থির জানিও যে এই বিষয়ে দৃঢ়তা যদি না থাকে, জয় অথবা পরাজয়ের মধ্যে কোনও বৃহৎ (রাজনৈতিক) উদ্দেশ্য আমরা সিদ্ধ করিতে পারিব না।

৩। যে কোন কাজে, যে কোন অবস্থায়, আমাদের দুইটি সিদ্ধান্তের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হয় : একটি, বহুদিক বিবেচনা করিয়া সতর্কতাপ্রসূত, অপরটি দুঃসাহসিকতাপ্রসূত। কেহ কেহ মনে করেন, সমরশাস্ত্র অনুসারে সতর্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই উচিত। এরূপ বিশ্বাস কিন্তু ঠিক নহে। যদি সমরশাস্ত্র এ বিষয়ে কিছু উপদেশ দেয়, তবে তাহাতে বলিবে যে যুদ্ধের ধর্ম হইল, যে উপায়ে কার্যসিদ্ধি হয়, অর্থাৎ যাহা দুঃসাহসিকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা উচিত। শাস্ত্র এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হয়। সেনাপতি সমর-নীতিসিদ্ধ কর্মপন্থা নির্ধারণ করিবেন। কিন্তু এ

কথা ভুলিও না যে, দুঃসাহসিকতা পরিহার করিয়া কোন সেনাপতি আজ পর্যন্ত বড় সেনাপতি হইতে পারেন নাই।

The theory of warfare tries to discover how we may gain a preponderance of physical forces and material advantages at the decisive point. As this is not always possible, theory also teaches us to calculate moral factors; the likely mistakes of the enemy, the impression created by a daring action...Yes, even our own desperation. None of these things lie outside the realm of the theory and art of war, which is nothing but the result of reasonable reflection on all the possible situations encountered during a war. We should think very frequently of the most dangerous of these situations and familiarise ourselves with it. Only thus shall we reach heroic decisions based on reason, which no critic can ever shake...

In the decisive moments of your life, in the turmoil of battle, you will some day feel that this view alone can help where help is needed most, and where a dry pedantry of figures will forsake you.

2. Whether counting on physical or moral advantages, we should always try, in time of war, to have the probability of victory on our side. But this is not always possible. Often we must act AGAINST this probability, SHOULD THERE BE NOTHING BETTER TO DO. Were we to despair here, we should abandon the use of reason just when it becomes most necessary, when everything seems to be conspiring against us.

Therefore, even when the likelihood of success is against us, we must not think of our undertaking as unreasonable or impossible; for it is always reasonable, if we do not know of anything better to do, and if we make the best use of the few means at our disposal.

We must never lack the calmness and firmness, which are so hard to preserve in time of war. Without them the most brilliant qualities of mind are wasted. We must therefore familiarise ourselves with the thought of an honourable defeat.

We must always nourish this thought within ourselves, and we must get completely used to it. Be convinced that without this firm resolution no great results can be achieved in the most successful war, let alone in the most unsuccessful.

8. In any specific action, in any measure we may undertake, we always have the choice between the most audacious and the most careful solution. Some people think that the theory of war always advises the latter. The assumption is false. If the theory does advise anything, it is the nature of war to advise the most decisive, that is, the most audacious. Theory leaves it to the military leader, however, to act according to this inner force; but never forget that no military leader has ever become great without audacity.

চিকিৎসার ব্যবস্থা ঃ নিয়মতান্ত্রিক উপায়

গান্ধীজী এইরূপে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার লক্ষ্য রহিল নোয়াখালির মুসলমান জনতা যে-ভাবে ধর্মান্তরকরণের দ্বারা একটি অঞ্চলকে অমুসলমান জনশূন্য করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। যে কোন সমস্যার সমাধান নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে করা যায়, আবার হিংসা কিংবা অহিংসামূলক সংগ্রামের দ্বারাও করা যায়। গান্ধীজী অহিংস সংগ্রাম-কৌশলের প্রবর্তক। তিনি কিন্তু এরূপ সংগ্রামের পূর্বে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এবং ধীর, শান্ত শিক্ষার দ্বারা প্রথমে কার্যসিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন। তাহাতে বিফলমনোরথ হইলে শুধু তখনই তিনি সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতেন। এইরূপ প্রচেষ্টার ফলে, এক দিকে যেমন জনসাধারণকে অনেকদূর পর্যন্ত শিক্ষিত ও সংগঠিত করার সুযোগ মিলিত, অপর দিকে তেমনই প্রতিপক্ষকে আত্মসংশোধনের যথেষ্ট অবকাশও দেওয়া হইত। গান্ধীজী স্বীয়

জীবনে 'সত্য'কে যেমন অপরের সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইতেন, সত্যাগ্রহের পূর্বাহ্ণে রণসজ্জায় সজ্জিত দুই পক্ষ যাহাতে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসায় পৌঁছিতে পারে, তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া পরোক্ষভাবে উভয় পক্ষের দাবির ন্যায়ান্যায় যাচাই করিয়া লইতেন।

সেইজন্য নোয়াখালির সম্পর্কে গান্ধীজীর পথ প্রথমে নিয়মতন্ত্র অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছিল।

কলিকাতায় ২৯এ অক্টোবর ১৯৪৬ সালে পৌঁছানোর পরই বাংলার লাট সাহেব গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সে বিষয়ে কয়েক সপ্তাহ পরে গান্ধীজীর নিকটে যে বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম, তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। যতদূর স্মরণ আছে, তিনি বলিয়াছিলেন, লাট সাহেব তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান যে, তিনি জর্জ ল্যান্সবেরি নামক বিখ্যাত শ্রমিক নেতার শিষ্য, এবং যেহেতু গান্ধীজী ল্যান্সবেরি সাহেবকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, সেই হেতু তিনি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ এবং আলাপের সুযোগ খুঁজিতেছেন।

গান্ধীজী মোটরযোগে লাট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে সাধারণ সামাজিক আলাপ-আলোচনান্তে লাট সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নোয়াখালি দুর্ঘটনার পরে দেশে শান্তি এবং শৃঙ্খলা স্থাপনার জন্য তাঁহার পক্ষে কি করা সম্ভব? এ বিষয়ে তিনি গান্ধীজীর মতামত জানিতে ইচ্ছা করেন। গান্ধীজী তখনই তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, উপস্থিত তাঁহার কিছুই করিবার নাই। কারণ ব্রিটিশ গভর্নরের অবস্থা ইংলণ্ডের সম্রাটের অবস্থা হইতে ভিন্ন নয়। দেশের প্রকৃত শাসনভার মন্ত্রীমণ্ডলীর উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে; অতএব সে বিষয়ে যাহা কিছু বলিবার, তিনি প্রধান মন্ত্রীর নিকটেই বলিবেন। তদানীন্তন

ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সমরাধিনায়ক জেনারেল বুশার গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সামরিক সাহায্যদানের প্রস্তাব করেন। গান্ধীজী তাঁহাকেও জানান যে, যদি প্রধান মন্ত্রী প্রয়োজন বোধ করেন তবে অবশ্যই সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিবেন ; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সমর-বিভাগকে অসামরিক শাসনের অধীন থাকিতে হইবে ; শান্তি স্থাপনার দায়িত্ব বিসর্জন দিয়া গণতন্ত্র অনুসারে নির্বাচিত মন্ত্রীমণ্ডলী সমর-বিভাগের হাতে দেশের শাসনভার ছাড়িয়া দিতে পারেন না।

ইহার পরে গান্ধীজীর সহিত তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী সুহরাবর্দি সাহেবের সাক্ষাৎ এবং আলোচনা হয়। এবং সেই সময়ে প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে নানাবিধ গুরুতর অভিযোগও গান্ধীজীর নিকটে আসিয়া পৌঁছায়। কিন্তু গান্ধীজী স্বচক্ষে নোয়াখালি না দেখিয়া গভর্মেণ্টকে সাধারণভাবে দুই-একটি পরামর্শ দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করিলেন না। তিনি কেবল সুহরাবর্দি সাহেবকে বারংবার স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, বাঙালী হিন্দু এবং মুসলমানের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলীর উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে।

২৪এ নভেম্বর ১৯৪৬ সালের ঘটনা। গান্ধীজী তখন মাত্র চারদিন নোয়াখালি জেলায় শ্রীরামপুর গ্রামে হিন্দু মুসলমান জনতার মধ্যে নূতন কর্মপন্থা লইয়া বসিয়াছেন। সেদিন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় এবং বাংলা দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আলোচনাকালে কেহ মত প্রকাশ করিলেন যে, বাংলা দেশে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী জনসাধারণের বিশ্বাস হারাইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিনিধিত্বের দাবি মিথ্যা, অতএব গান্ধীজীর পক্ষে মন্ত্রীমণ্ডলীর অপেক্ষা না রাখিয়া কাজ করা উচিত। গান্ধীজী উত্তর দিতে গিয়া নূতন প্রশ্ন করিলেন,

যে উপদেশ এখানকার সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়কে আপনি দিবেন, তাহা অন্যত্রও কি দেওয়া চলে? বিহারের মুসলমান জনতাকেও কি আপনি স্থানীয় কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অসহযোগ করিতে বলিবেন; কারণ বিহারের গভর্ণমেণ্ট তো মুসলমানদের রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই?

Gandhiji said, his advice would be not to call for military or police aid at all. For "we should be consistent all along the line. Democracy, if it is good in Bihar, ought to be so in Bengal too. I must therefore go to the popularly elected ministers, for they are my military. If they fail, the necessary public opinion must be created against them.

অপর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কি শান্তির সময়, না, যুদ্ধের সময়? বিনা দ্বিধায় গান্ধীজী বলিলেন,

শান্তির জন্যই আমাদের কাজ করিয়া যাইতে হইবে; কিন্তু যদি তাহাতে সার্থক না হই, তখন সংগ্রাম হইতে পারে। তখন পৃথিবীর লোক বুঝিতে পারিবে, অপরাধ কাহার!

Q. Is it yet time for peace or for preparation for war?

A. It is peace for which we should work; but if that failed, there may be war. The world would then know who was in the wrong.

২০-১১-১৯৪৬ তারিখের অপর একটি ঘটনা। গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শান্তি-সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব লইয়া গান্ধীজীর মতামতের আশায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, প্রতি ইউনিয়নে সমসংখ্যক হিন্দু এবং মুসলমান প্রতিনিধি লইয়া এক একটি শান্তি-সমিতি স্থাপনা করা হউক। সরকারী কর্মচারীগণ শান্তি-সমিতির নির্দেশমত অপরাধীকে অনুসন্ধান করিবেন। নোয়াখালি জেলার প্রবীণ কর্মী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী আমন্ত্রিত

হইয়া সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সরকারী প্রতিনিধিবর্গকে বলিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রধান অপরাধীবৃন্দকে দণ্ড দেওয়া না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতে আনীত শান্তিপ্রস্তাবের উপরে আস্থা স্থাপন করা যায় না। প্রতিনিধিবৃন্দ উত্তর দিলেন, শান্তি সমিতির উদ্দেশ্যই তো তাহাই। তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া তবে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, পূর্বাহ্নে কাহাকেও দোষী অনুমান করিয়া গ্রেপ্তার করার দাবি ঠিক নহে।

গান্ধীজী মনোরঞ্জনবাবুকে বুঝাইলেন,

> প্রতিনিধিদের কথায় সুরে প্রস্তাবটি পরীক্ষার যোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে। যদি ভবিষ্যতে শান্তি-সমিতির পরামর্শ উপেক্ষিত হয়, তবে সমিতি পরিত্যাগ করিয়া আসা তো কঠিন নয়। তখন তোমার সততার ফলে যে সাহস অন্তরে লাভ করিবে তাহা কেহই পরাজিত করিতে পারিবে না।
>
> If after a fair trial you find it unworkable, you can come out of it. Your honour will give you a courage which no one can beat.

পর-দিবস মনোরঞ্জনবাবু গান্ধীজীকে প্রশ্ন করিলেন, তিনি কি লীগনেতাদের হৃদয়ের পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করেন? গান্ধীজী উত্তর দিয়াছিলেন, ইহাদের পরিবর্তন ঘটে নাই সত্য, কিন্তু কর্মপন্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

মনোরঞ্জনবাবুর আর একটি আপত্তির কারণ ছিল। প্রস্তাবিত শান্তি-সমিতিগুলিতে সমসংখ্যক হিন্দু এবং মুসলমান প্রতিনিধির স্থান পাইবার কথা। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত, প্রতিপত্তিশালী এবং ধনবান সকলেই দেশে বর্তমান রহিয়াছে; অপর পক্ষে হিন্দুদের মধ্যে সমশ্রেণীর লোক অধিকাংশ দেশত্যাগী হইয়াছে। অবশিষ্ট আছে কেবল

ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, যুগী, নমঃ এবং অল্পসংখ্যক উচ্চবর্ণের শিক্ষিত ভদ্রলোক। এরূপ অবস্থায় অশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে সমিতিতে স্থান দেওয়া ভিন্ন উপায় নাই; এবং তাহাদের পক্ষে কৌশলী স্বসম্প্রদায়ের স্বার্থান্বেষী কোন মুসলমানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব হইবে না। অতএব কোন শান্তি-সমিতি হইতে প্রকৃত অপরাধীর সম্পর্কে সরকারের নিকট সংবাদ পৌঁছাইবে না। মনোরঞ্জনবাবু অভিমত প্রকাশ করিলেন, লীগ-গভর্মেণ্ট এইরূপে তথাকথিত শান্তি-সমিতি স্থাপন করিয়া অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা বা সাজা দেওয়ার দায়িত্ব সুকৌশলে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

গান্ধীজী তাঁহাকে বলিলেন, যে সকল শিক্ষিত বা অর্থবান ব্যক্তি সমাজের দরিদ্র অশিক্ষিত দুর্বল মানুষকে বিপদের মুখে ফেলিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে, তাহাদের প্রতিনিধি হইবার অধিকার কোথায়? বরং অশিক্ষিত যুগী বা ধোপাকেই আজ শান্তি-সমিতিতে আসন দিতে হইবে; এবং যাহাতে তাহারা প্রবল প্রতিপক্ষের নিকটে পরাজয় স্বীকার না করে, তাহার জন্য ক্রমাগত শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ব্রিটিশ জাতির ইতিহাসের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, কত দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়াই না ইংরেজজাতি গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করিয়াছে।

I have always been an admirer of English history.

২৬এ নভেম্বর ১৯৪৬ সাল। নোয়াখালিতে কিছু কিছু শীতের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু গভর্মেণ্ট গৃহহীন শরণার্থীবৃন্দকে দ্রুত শীতবস্ত্র যোগাইতে পারিতেছিলেন না। শ্রীযুক্ত মোহনলাল গোয়েঙ্কা এবং গিরিধারী নামে দুই বন্ধু গোরখপুরের গীতা প্রেসের পক্ষ হইতে আগমন করিয়া জানাইলেন যে, সেখানে এক লক্ষ টাকা দামের কম্বলের

ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; গান্ধীজীর অনুমতি পাইলে শরণার্থী পরিবার-বর্গের জন্য তাহা পাঠানো হইবে। গান্ধীজী কিন্তু সম্মতি না জানাইয়া বরং বলিলেন,

> শরণার্থীগণের পক্ষে গভর্মেণ্টের নিকট স্বীয় দাবি আরও দৃঢ়তার সঙ্গে জানানো উচিত। শীতবস্ত্র এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা গভর্মেণ্টের কর্তব্য। সে কর্তব্য বারংবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত। নোয়াখালিতে এখন শরণার্থীবৃন্দকে প্রতিনিধিমূলক গভর্মেণ্টের নিকট স্বীয় ন্যায্য দাবি পেশ করিবার শিক্ষা দিতে হইবে।

কয়েক দিন পরে, ৮-১২-৪৬ তারিখে, অপর একজন কর্মী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঘর দুয়ার তৈয়ারি করার ব্যাপারে গভর্মেণ্টের দীর্ঘসূত্রতার ফলে যদি শীতের প্রকোপে শিশু বা অপরে পীড়িত হইয়া পড়ে, তখন সেবা-সমিতির পক্ষে কি করা কর্তব্য? গান্ধীজী বলিয়াছিলেন,

> আমার হৃদয়ে দয়া-মায়া নাই (ম্যাঁয় নির্দয় হুঁ)। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যদি কিছু লোকক্ষয়ও হয়, আমি নীরবে সহ্য করিব। আর্তত্রাণের বুদ্ধিতে জনসেবা করিলে চলিবে না। যে সমস্যার মূলে রাজনীতি রহিয়াছে, তাহার উপরের আবরণ খুলিয়া না ফেলিলে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে না।

গান্ধীজী নানা ভাবে গভর্মেণ্ট-কর্মচারীগণকে পরামর্শ দিয়া, শরণার্থীগণকে গভর্মেণ্টের শর্তাবলী পূরণ করিয়া টিঁকিয়া থাকিতে বলিতেন। ৮-২-১৯৪৭ তারিখ নাগাদ গভর্মেণ্ট শরণার্থীশিবিরগুলি বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন। গান্ধীজী রাত্রি দুইটার সময়ে জাগিয়া লণ্ঠনের আলোয় স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে একখানি চিঠি লিখিতে বসিলেন। সেই মূল্যবান পত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি।

কাল আপনি যখন আমার সহিত দেখা করেন, তখন যে পত্র লিখিব বলিয়াছিলাম, তাহাই এখন লিখিতেছি।

এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই যে, হঠাৎ শরণার্থীগণের ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া অন্যায়। বন্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্বে অন্তত এক মাসের নোটিশ দিয়া বলিতে হইবে, যদি তাহারা নিম্নলিখিত কাজ না করে তাহা হইলে আর খাদ্য যোগানো গভর্মেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়। খাদ্যদ্রব্য পর্যাপ্ত হওয়া উচিত এবং চিকিৎসকগণ তাহাকে খাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

কাজের তালিকা :

১। দৈনিক অন্তত দুই ঘণ্টা কাল ধরিয়া পথ নির্মাণ বা পথের সংস্কার। রবিবারে ছুটি থাকিবে।

২। তত্ত্বাবধানের অধীনে থাকিয়া কচুরিপানা পরিষ্কার করা। সময় ১নং-এর মত।

৩। গভর্মেণ্ট কর্তৃক সরবরাহ করা উপকরণ এবং যন্ত্রের সাহায্যে নিজেদের খালি জমির উপরে গৃহনির্মাণ। সময় ১নং-এর মত।

৪। গ্রাম সংস্কার। সময় ১নং-এর মত।

৫। পুষ্করিণী সংস্কার। সময় ১নং-এর মত।

৬। দৈনিক চার ঘণ্টা সুতা কাটা। তুলা, চরকা বা তকলি গভর্মেণ্ট সরবরাহ করিবেন। সুতা কাটার ভিতরে তুলা ছাড়ানো, ধোনা, পাঁজ করা, তুনাই করা, সবই গণ্য হইবে।

৭। তাঁতে কাপড় বোনা। সময় ৬নং-এর মত। যন্ত্রপাতি, সুতা, গভর্মেণ্ট সরবরাহ করিবেন। হাতে-কাটা সুতা হইলে, সুতার পাকাইয়া দেওয়া হইবে।

৮। ঢেঁকিতে ধান ভানা। সময় ১নং-এর মত। গভর্মেণ্ট ঢেঁকি সরবরাহ করিবেন।

৯। নারিকেল বা তৈলবীজ হইতে তৈল নিষ্কাশন। বীজ গভর্মেণ্ট সরবরাহ করিবেন। সময় ৬নং-এর সমান।

১০। অপর কোনও গ্রাম্যশিল্প যাহা গভর্মেণ্ট বাছিয়া দিবেন; অথবা শরণার্থীগণ নির্দ্ধারণ করিবার পর গভর্মেণ্টের দ্বারা সমর্থন করাইয়া লইবেন। সময়, অবস্থাবিবেচনায় ১নং অথবা ৬নং-এর সমান।

সমস্ত পরিকল্পনাটি ভাল ভাবে চালু করিতে হইলে সুচিন্তিত হওয়া উচিত এবং গভর্মেণ্টের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। ইহাকে যেন দুর্ভিক্ষনিবারণের জন্য সাময়িক ব্যবস্থার মত বিবেচনা করা না হয়। ইহার অন্তর্নিহিত নীতি হইল, যে মানুষ খাটে না সে খাইতেও পাইবে না।

অসহায় দুর্ভাগা শরণার্থীদের খাদ্য সরবরাহ যেন কোন কারণেই বন্ধ না হয়; গভর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি অথবা যানবাহনের অসুবিধা ইহার অন্তরায় না হয়।

আমি ইহাও প্রস্তাব করি যে, যাহারা কাজ করিতে অনিচ্ছুক বা কোন কারণে অপারগ, তাহাদের বাঁধা দামে খাদ্য যোগাইতে হইবে।

আগামী ফসলের জন্য চাষ করার সময় দ্রুত ফুরাইয়া যাইতেছে। অতএব চাষের সরঞ্জাম, বলদ, বীজ প্রভৃতি এখনই সরবরাহ করা উচিত, নয়তো দারুণ দুর্দৈবের সম্মুখীন হইতে হইবে।

আমি রাত্রি দুইটার সময়ে এই পত্র আরম্ভ করিয়াছি। খাদিপ্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ইহা দেখেন নাই। আমার

মতে, আপনি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া এ বিষয়ে পরামর্শ করুন। কারণ স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

This is the letter I promised when you were good enough to see me yesterday.

I am quite clear that you should not abruptly stop rations until due notice (at least one month) of their stoppage is given to the refugees that they will be stopped unless one of the specified items of work is done by them against the rations which should be adequate and medically fit for consumption.

The items should include

1. Road-construction or road-repair for at least two hours per day. Sundays excluded.

2. Removal of water-hyacinth for the same period as in (1) under supervision.

3. House-building on their own vacated land for the same period as in (1) with material and tools supplied by the Govt.

4. Village reconstruction for the same period as in (I).

5. Cleaning of tanks for the same period as in (1).

6. Hand-spinning for four hours per day, cotton and wheels or *takli* being supplied by the Govt. Spinning to include ginning, carding or *tunai* or *punai*.

7. Weaving for the same period as in (6) ; tools and accessories and yarn, double-twisted in the case of hand-spun, being supplied by the Govt.

8. Dhenki-husking for same period as in (1) ; dhenkis being supplied by the Govt.

9. Oil-pressing, out of cocoanut or seeds, being supplied by Govt., for the period as in (6).

10. Any other village craft chosen by the Govt. or refugees and approved by the Govt. for the period as in (1) or (6), as the case may be.

Efficient working of the foregoing is wholly dependent upon a well thought-out scheme capably managed by the Govt. This is no famine measure. It is conceived wholly in the spirit of the maxim, no labour no food.

No breakdown in transport or other Govt. machinery should stop the supply of rations to the helpless unfortunate refugees.

I would suggest that refugees who are not willing or otherwise incapable may be supplied rations against payment at fixed rates.

The time for ploughing for the next crop is soon ebbing away. Therefore agricultural implements, bullocks and seeds have to be supplied at once or a disaster may have to be faced.

This was written at 2 a.m., and has not been seen by Shri Satis Chandra Dasgupta of Khadi Pratisthan. I would suggest your seeing and consulting him, since I am wholly ignorant of local conditions.

মুসলমানের প্রতি উপদেশ

এক দিক দিয়া যেমন গান্ধীজী গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী গভর্মেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে লাগিলেন, তাহাদের দেওয়া শর্তগুলি পালন করিয়া হিন্দু শরণার্থীগণকে নোয়াখালিতেই টিকিয়া থাকিতে বলিলেন, তেমনই অপর দিকে তিনি মুসলমান এবং হিন্দু জনসাধারণকে বারম্বার নানা উপদেশের দ্বারা শুদ্ধতর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অহিংসা নামক অধ্যায়ে এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কিছু আলোচিত হইয়াছে। তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এখানে রাজনৈতিক উপদেশের বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা যাউক।

১৮-১-৪৭ তারিখে প্রার্থনার পূর্বে এক মুসলমান ভদ্রলোক গান্ধীজীকে বলেন, জিন্নাহ সাহেব এবং তাঁহার মধ্যে যদি একটা বোঝাপাড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে দেশে অশান্তি থাকিবে না। গান্ধীজী উত্তরে বলিয়াছিলেন,

নিজের সম্বন্ধে বা আমার ক্ষমতার সম্বন্ধে আমি কোনও অলীক ধারণা পোষণ করি না। আমি জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে বহুবার বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিয়াছি, কিন্তু সকলেই জানেন তাহার দ্বারা কোন ফললাভ হয় নাই।

আসল কথা হইল, অনুগামীগণই নেতাকে সৃষ্টি করে। জনসাধারণের অন্তর্নিহিত আশা ও আকাজ্ক্ষা নেতার ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হয়। শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই এই নিয়ম। সেইজন্য হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কেই আমি বলি যেন তাহারা দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা-সমাধানের জন্য মুসলিম লীগ অথবা কংগ্রেস এবং হিন্দুমহাসভার নিকটে না যান। সেরূপ সমস্যার মীমাংসা গ্রামবাসীগণকে স্বয়ং করিয়া লইতে হইবে। গ্রামবাসীগণের মধ্যে শান্তিতে বসবাস করিবার ইচ্ছা থাকিলে নেতাদের মধ্যেও সেই ইচ্ছা প্রতিফলিত হইবে। লোকের দৈনন্দিন সুখদুঃখের সংবাদ নেতারা কতটুকুই বা রাখেন? প্রতিবেশীর যদি অসুখ করে, তবে কি কেহ কংগ্রেস অথবা লীগের নিকটে কর্তব্যনির্ধারণের জন্য ছুটিয়া যায়? ইহা যে ভাবিতেও পারা যায় না।

পানিয়ালা নামক গ্রামে কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোক গান্ধীজীকে পাকিস্তানের সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন: আপনি বলিয়াছেন যে-সকল প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যায় অধিক, সেখানে তাঁহাদের অভিপ্রেত পাকিস্তান ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অর্থ কি?

উত্তর: আমি যাহা বলিয়াছি তাহা পুরাপুরি আমার মনের কথা। যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ বাহিরের শক্তির দ্বারা শাসিত হইবে ততদিন পাকিস্তান বা হিন্দুস্থান কিছুরই স্থান নাই, আছে

কেবল মিছক বাসম। এখন যে-পরিমাণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহাকে যদি কেহ স্বাধীনতা বলিয়া মনে করেন, তবে তিনি উহার অর্থ জানেন না। ব্রিটিশ-শক্তিকে ভারত ছাড়িয়া যাইতেই হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু যদি আমরা আপোসে বিবাদ মিটাইয়া ফেলিতে না পারি, এবং পরস্পরের রক্তপাতে মত্ত হই, তবে বাহিরের শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ ভারতের স্কন্ধে চাপিয়া বসিবে। ভারতের মত জনবহুল এবং নানা সম্পদের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ এতবড় একটা দেশের সম্পদকে আভ্যন্তরীণ বিবাদের কারণে অপচয় করিতে, অন্য শক্তিগুলি দিবে না। আজ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশকে অপর সকল দেশের জন্য বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কূপমণ্ডুকের মত কোন মতে বাঁচিয়া থাকার কাল চলিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস সারা ভারতের জন্য অহিংস অসহযোগের নীতি স্বীকার করার পূর্বে, অর্থাৎ ১৯২০ সালের পূর্বে, গুজরাটে পরলোকগত আব্বাস তায়েবজীর সভাপতিত্বে আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষের একটিমাত্র প্রদেশও যদি ইচ্ছা করে তবে ব্রিটিশ প্রভুত্ব হইতে মুক্তি ঘোষণা করিয়া সে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ধরা যাউক, এই নীতি অনুসারে একা বাংলা দেশ সত্যসত্যই সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া উঠিল। তাহা হইলে পাকিস্তান বলিতে আমি যাহা বুঝি বাংলায় তাহা স্থাপিত হইয়া যাইবে। ইসলাম গণতন্ত্র ভিন্ন অপর কিছু চাহিতে পারে না। তখন ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে প্রতি পুরুষ এবং নারীর এক এক ভোট থাকিবে। এ দেশে স্বভাবতই মুসলমানদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থাকিবে। জিন্নাহ সাহেব কি এ কথা ঘোষণা করেন নাই যে, পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় অপেক্ষা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্ভব হইলে আরও ভালভাবে থাকিবে? অতএব পাকিস্তানে

নিপীড়িত কেহ থাকিবে না। পাকিস্তানের অর্থ যদি ইহা হইতে ভিন্ন কিছু হয়, তবে তাহা আমার জানা নাই। আর পাকিস্তানের অর্থ যদি ইহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র কিছু হয়, তবে তাঁহার পক্ষে যুক্তির দ্বারা সে অর্থ স্বীকার করা সম্ভব হইবে না।

Q. You said that Muslim majority provinces if they so chose had Pakistan already. What did you mean by this ?

A. Gandhiji replied that he fully meant what he had said. Whilst there was an outside power ruling India there was neither Pakistan nor Hindustan but bare slavery was their lot. And if anybody maintained that the measure of provincial autonomy they enjoyed was equal to independence they were unaware of the contents of independence. It was true that the British power was certain to go. But if they could not patch up their quarrels and indulge in blood-baths, a combination of powers was certain to hold them in bondage. Those powers would not tolerate a country so vast and populous as India and so rich in potential resources to rot away because of internal disturbances. Every country had to live for the rest. Days when they could drag on the frog-in-the-well existence were gone. Even before the Congress had taken up non-violent non-co-operation as the official policy for the whole of India, that is, before 1920, in Gujerat, under the chairmanship of the late Abbas Tyabji Saheb, the speaker had said that it was open even to one province to vindicate its position and become wholly independent of the British power. Thus supposing that following the prescription, Bengal alone became truly and completely independent, there would be complete Pakistan of his definition in Bengal. Islam was nothing if it did not spell complete democracy. Therefore there would be one man and one woman one vote irrespective of religion. Naturally therefore there would be a true Muslim majority in the province. Had not Jinnah declared that in Pakistan minorities would if possible be even better off than the majority ? Therefore there would be no underdog. If Pakistan meant anything more, the speaker did not know and if it did,

so far as he knew, it would make no appeal to his reason.—*Harijan*, 9-2-47, p. 15.

১৪-১-১৯৪৭ তারিখে ভাটিয়ালপুর গ্রামে কয়েক জন মুসলমান যুবকের সঙ্গে তাঁহার ওইরূপ আর এক আলোচনা হয়।

প্রশ্ন: বিহারে যাহা ঘটিয়াছে তাহার পরে স্বতন্ত্র একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করায় তাঁহার আপত্তি কি?

উত্তর: পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনে তাঁহার আপত্তি নাই। বাংলা দেশে আজ তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, সেই পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র কি ধরনের হইবে? সে কথা আজও কেহ স্পষ্ট করিয়া বলে নাই। যদি তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সমগ্র দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে সেই মুসলিম রাষ্ট্র শত্রুপক্ষের সহিত সন্ধি করিতে পারিবে, তবে তিনি রাজি হইতে পারেন না। কোন মানুষ আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার স্বাধীনতা চাহিলে সেরূপ শর্ত স্বীকার করিয়া লওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন: পাকিস্তানের দাবি আদিতে মানিয়া লইলে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ কি আরও সুগম হইবে না?

উত্তর: আদিতে পাকিস্তান কায়েম করার অর্থ হইল, তৃতীয় শক্তির সহায়তায় আপনারা তাহা প্রতিষ্ঠিত করার কথা ভাবিতেছেন। আমি যখন ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিষয় চিন্তা করি তখন রুশ, চীন বা অপর কোন শক্তির সাহায্য না পাইয়া, নিজের শক্তির দ্বারা তাহা অর্জন করিবার কথা ভাবি। সেরূপ স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা হইবে এবং স্থায়ী হইবে। একবার সারা দেশকে মুক্ত করিতে পারিলে তখন পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের বিষয়ে নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন : বর্তমান দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে পাকিস্তানও হইল না, শান্তিও আসিল না। এ বিষয়ে আপনি কি উপদেশ দেন ?

উত্তর : সেই পথ অনুসন্ধান করিবার জন্যই তো আমি চেষ্টা করিতেছি। যে দিন আমি তাহার সন্ধান পাইব, সেই দিন সারা পৃথিবীর সম্মুখে আমি তাহা ঘোষণা করিব।

Q. What is your objection to the establishment of a separate Muslim State after what has happened in Bihar ?

A. I have no objection to a Muslim State. The question is, what is going to be the character of the State ? This point has not been made clear so far. If the Muslim State implied freedom to make unfriendly treaties with foreign powers to the detriment of the country, then obviously it cannot be a matter of agreement No one can be asked to sign an agreement granting freedom to another to launch hostilities against himself

Q. Would it not be better to concede Pakistan and get freedom for the whole of India ?

A. When you think of establishing Pakistan first, you think in terms of getting it with the aid of a third power. When I think of the freedom of India, I think in terms of achieving it without any foreign aid, be it Russian, Chinese or any other power, but on the basis of our own inner strength. Then only that freedom will be real and lasting. Once freedom is secured for the country as a whole, then we can decide about Pakistan or Hindustan.

Q. After the recent disturbances there is neither Pakistan nor peace. What is your solution to the situation ?

A. That is exactly what I am in search for. As soon as it is discovered, the world shall know it.

১৭-২-১৯৪৭ তারিখ। গ্রাম দেবীপুর। সন্ধ্যাবেলা সরদার জীবন সিংএর সহিত শাহ খলিলুর রহমান নামে জনৈক স্থানীয় পীর সাহেব গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ইনি অনেক হিন্দুকে

ধর্মান্তরিত করিয়াছিলেন বলিয়া গান্ধীজীর নিকটে সংবাদ আসিয়াছিল। গান্ধীজী পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, হিন্দুদের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য এরূপ কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছিল। গান্ধীজী তাঁহাকে বলিলেন, যে প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য মান দিতে হয়, সেরূপ প্রাণের মূল্য কি? পীর সাহেব বরং যদি হিন্দুদিগকে মান রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিবার শিক্ষা দিতেন, তবেই ধর্মগুরু হিসাবে তাঁহার উপযুক্ত কাজ হইত। হিন্দুদের পক্ষে তাহাই উচিত হইত। পীর সাহেব তবু বলিলেন, প্রাণ-রক্ষা করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় লওয়ায় কোন দোষ নাই। গান্ধীজী অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, ঈশ্বরের সহিত কখনও সাক্ষাৎ হইবে কি না জানি না, কিন্তু যদি সম্ভব হয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব, আপনার মত মানুষকে তিনি পীর বা ধর্মগুরু হইতে দিলেন কেন?

চিকিৎসার ব্যবস্থা : হিন্দুদের প্রতি

ঠিক কোন্ তারিখে মনে নাই, একবার নোয়াখালিতে জনৈক রমণী গান্ধীজীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি দাঙ্গার সময়ে লাঞ্ছিতা হইয়াছিলেন, এবং এখন গান্ধীজীর চরণ স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হইবার প্রার্থনা জানাইয়া তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন। নারীটির প্রার্থনা কি তাহা জানাইবামাত্র গান্ধীজী কঠিন স্বরে বলিলেন, উহাকে বুঝাইয়া দাও, উহার কোনও অপরাধ হয় নাই, কোনও পাপ হয় নাই। যদি কাহারও পাপ হইয়া থাকে, প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন হয়, তবে সমগ্র হিন্দু-সমাজ করিবে। গান্ধীজী পায়ে হাত দিয়া প্রণাম পছন্দ করিতেন না, তবু আমি নারীটিকে প্রণাম করিতে বলায় তিনি নিশ্চল

ভাবে গান্ধীজীর পায়ের উপরে কিছুক্ষণ মাথা রাখিয়া নীরবে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গান্ধীজীর অন্তরের দাহ তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পারিয়াছিলেন কি না জানি না। যে সহস্র সহস্র হিন্দু ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, গান্ধীজী সেই ধর্মান্তরকরণকে কোন রকমে স্বীকার করিতে পারেন নাই। মুসলমান নেতৃবৃন্দের দ্বারা তিনি বারংবার এ কথা বলাইয়াছিলেন যে, বলপ্রয়োগের বশে যাহারা মুসলমান নাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের একজনও মুসলমান হয় নাই। ফলে সমগ্র নোয়াখালির পশ্চিমাঞ্চলে গান্ধীজীর আবির্ভাবের ফলে হিন্দু যেমন হিন্দু ছিল, আবার তেমনই হিন্দু রহিয়া গেল। কাহারও প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্ন উঠিল না; লাঞ্ছিতা কন্যা বা বধূদের স্বগৃহে ফিরিয়া আসার আর কোনও বাধা রহিল না। গান্ধীজী নোয়াখালিতে উপস্থিত না হইলে হিন্দুধর্মের ইতিহাসে এরূপ অভাবনীয় ঘটনা ঘটিত কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কিন্তু গান্ধীজীর পক্ষে এটুকুতে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। ৫-১২-১৯৪৬ তারিখে যখন হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হিন্দুদের জায়গায় জায়গায় একত্র করিয়া নিরাপদে রাখিলে কি ভাল হয় না? গান্ধীজী উত্তরে জানাইয়াছিলেন, তাহা হইলে পরোক্ষভাবে মুসলিম লীগের দুই অধিজাতীয়ত্বের দাবিকে স্বীকার করিয়াই লওয়া হইবে। অতএব তাঁহার ইচ্ছা, হিন্দু যদি একা কোথায় থাকে, তবুও প্রাণভয়ে যেন ধর্মত্যাগ না করে। সকল হিন্দু যদি দেশত্যাগ করিয়া যায়, তবু তিনি একা হিন্দুর প্রতিনিধি হইয়া নোয়াখালিতে স্বীয় ধর্মমত স্বাধীনভাবে পালন করিয়া অবস্থান করিবেন।

নির্মলবাবু তখন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, এখন পর্যন্ত সে-জাতীয়

সাহস তো একজনের মধ্যেও দেখা যাইতেছে না। গান্ধীজী বলিলেন, যদি এভাবে থাকিবার চেষ্টা করিয়া কিছু লোক প্রাণ দেয়, তবে অল্প বহুতে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। নির্মলবাবু বলিলেন, কিন্তু এরূপ শক্তি সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাহিরে। গান্ধীজী বলিলেন, আমি আদর্শবাদী সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার দাবি হইল, আমি আদর্শকে কাজে পরিণত করিবার কৌশলও জানি। এই কারণেই মনে-প্রাণে বাঙালী হইবার জন্য এখানে আসিয়াছি। অহিংস সংগ্রাম-কৌশলের কি শক্তি আছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি। হইতে পারে আমার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইবে, কিন্তু নিষ্ফল ভাবে আমি মরিতে চাই না।

৪-১-১৯৪৭ সালে গান্ধীজী চণ্ডীপুর-চাঙ্গিরগাঁও গ্রাম-সেবা-সঙ্ঘের কর্মীগণের সভায় তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে নানা উপদেশ দেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনি আত্মরক্ষার বিষয়েও কিছু বলেন।

প্রশ্ন ঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আক্রমণাত্মক মনোভাবকে শান্ত করিবার জন্য সঙ্ঘ কি ভাবে চেষ্টা করিবেন ?

উত্তর ঃ গান্ধীজী বলিলেন, শান্ত করিবার চেষ্টায় যেন মান বিসর্জন দিয়া, মাথা নীচু করিয়া কিছু করা না হয়। সর্বোত্তম উপায় হইল, অন্তরের ভয় দূর করিয়া যাহা সঙ্গত তাহা আশ্রয় করিয়া থাকা। আঘাতের বিরুদ্ধে আঘাত হানিলে শেষ পর্যন্ত সেরূপ খেলায় কোথায় কোনও ফললাভ হয় না। সাহসী বা বীরের অহিংসার দ্বারাই এখানকার সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইতে পারে।

প্রশ্ন ঃ গভর্মেণ্ট যে সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছেন, তাহার দ্বারা সাময়িকভাবে বাস করার মত ঘরও করা যায় না। এ সাহায্য কি শরণার্থীগণ গ্রহণ করিবেন ?

উত্তর : শরণার্থীদের সততার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, সাময়িক আশ্রয়ের জন্য নিম্নপক্ষে কতটুকু আবশ্যক। গভর্ণমেন্ট যাহা দিতে চান তাহা যদি তদপেক্ষা কম হয়, তবে শরণার্থীগণের পক্ষে সেরূপ সাহায্য অস্বীকার করা উচিত। তাহা সত্ত্বেও, মাথার উপরে যদি আচ্ছাদন না থাকে, তবু তাহাদের কাতর না হইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসা উচিত।

প্রশ্ন : নিরাপত্তার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কি এক এক জায়গায় জড়ো করিয়া রাখা চলিতে পারে?

উত্তর : এরূপ ব্যবস্থার সম্বন্ধে আমার মতে চিন্তাও করা উচিত নয়। ইহার অর্থ হইল, সারা দেশকে টুকরা টুকরা করা। তখন বিভিন্ন দলের মধ্যে বাহুবলের উপরে নির্ভর করিয়া একপ্রকার যুদ্ধবিরতিরূপ শান্তি বর্তমান থাকিবে মাত্র। যে কোন সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে পুরুষোচিত কাজ হইল, সে বৃদ্ধই হউক আর তরুণই হউক, এমন কি একা হইলেও, যেন নিজের আত্মশক্তির অর্থাৎ ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করে।

Q. What line of action should the Sangh adopt to appease the aggressive mentality of the majority community?

A. Appeasement had become a word of bad odour. In no case could there be any appeasement at the cost of honour. The real and only appeasement was to shed all fear and to do what was right at any cost. Blow for blow was a played-out game. Non-violence of the brave was the only real approach to the problem.

Q. Should the refugees accept Government help which is perfectly insufficient for even the erection of temporary shelters?

A. The refugees must honestly try and find out what they needed for the least kind of temporary shelter. If their basic requirements were not covered by the proposed Government grants, they should refuse to accept them but still return to their

homes, even if it meant no cover over their heads. This has to be done in a sportsmanlike spirit.

Q. In course of rehabilitation, should members of the minority community be lodged together in sufficient numbers for the purpose of safety ?

A. Such concentration of population is an unthinkable proposition. It would imply that the whole country would be divided into hostile sections, perhaps enjoying a sort of armed peace. The manly thing to do is for every single individual of whatever sect, whether old or young to derive protection on account of inner strength which is from God.—*Harijan*, 26-1-47, p. 519.

৩-১-১৯৪৭ তারিখে আবার চণ্ডীপুর গ্রামে মহিলাদের এক সভায় গান্ধীজী উপদেশ দিয়াছিলেন যেন শ্রোতাদের প্রত্যেকে এই সংকল্প গ্রহণ করেন যে, প্রতিদিন তথাকথিত অস্পৃশ্য একজন নমঃশূদ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমশ্রেণীর বন্ধুর মত তাহার সহিত আহারে বসিবেন। যদি কাহারও সেরূপ আর্থিক সঙ্গতি না থাকে তবে হিন্দুদের মধ্যে দেবতার উদ্দেশ্যে যেমন অন্ন নিবেদন করিবার রীতি আছে, তেমনই ভাবে কোন নমঃশূদ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া অন্ন গ্রহণের থালি অথবা পানীয় জল যেন স্পর্শ করাইয়া লওয়া হয়। বহু শতাব্দী যাবৎ আমাদেরই মত অপর মানুষকে, শুধু জাতির কারণে আমরা যেভাবে নিগৃহীত করিয়া রাখিয়াছি, শুধু এই উপায়েই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে।

২৪-১১-১৯৪৬ শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়কে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, বাঙালীর কাছে আজ আমি বিশেষভাবে একটি আশা লইয়া আসিয়াছি। বাংলা দেশ যদি সমূলে অস্পৃশ্যতা দূর করিতে পারে, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম বাঁচিয়া যাইবে। অস্পৃশ্যতার বিষ বর্তমান থাকিলে হিন্দুধর্মের রক্ষা নাই।

প্রার্থনা-সভায় এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাতের ক্ষেত্রেও গান্ধীজী

দাঙ্গাবিধ্বস্ত পরিবারবর্গকে বলিতেন, যে-দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও মানুষকে বলিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, নিজের শারীরিক শ্রমের উপরে নির্ভর করিয়া নূতন জীবনের গোড়াপত্তন করিতে হইবে। যিনি ডাক্তার, যিনি ইঞ্জিনিয়ার অথবা শিক্ষক, যাঁহারা স্থানীয় প্রজাবৃন্দের অর্থের কল্যাণে শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় বিদ্যা এবং অভিজ্ঞতার সহায়তায় গ্রামবাসীর জীবনকে উন্নততর করিতে হইবে। তখন আর হিন্দু এবং মুসলমান বলিয়া কেহ পরস্পরকে ভাবিবে না, চাষী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার রূপে মানুষে মানুষে সেব্য-সেবকের সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। সাহসের সহিত এই নবজীবন রচনার দিকে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

অর্থাৎ বাঙালী হিন্দুর জীবনকে ভয়শূন্য, সামাজিক অসমতা দোষ-মুক্ত এবং আর্থিক ব্যবধান-বিবর্জিত করিবার জন্য গান্ধীজী উপদেশ দিতে লাগিলেন। গান্ধীজী শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহিত কথোপকথনের সময়ে ২৪-১১-১৯৪৬ তারিখে বলিয়াছিলেন, যদি বাংলা আজ স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করে তাহা হইলে সারা ভারত রক্ষা পাইবে। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার ফলে হিন্দুর মনে সাম্প্রদায়িকতার ভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল; সারা ভারতে তাহা ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল, ইহা নিরীক্ষণ করিয়া গান্ধীজী চিন্তান্বিত হইলেন। তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন সাম্প্রদায়িকতার বন্যায় জাতীয়তার সমূলে পরাজয় হইবার সম্ভাবনা যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ২৪-১১-১৯৪৬ তারিখে এবং পুনরায় ৭-১২-১৯৪৬ তারিখে তাঁহাকে আপন মনে কয়েকবার "কেয়া করেঁ? কেয়া করেঁ?" বলিতে শুনিলাম। শেষের দিন তৎসহ ইহাও বলিলেন, "মেরা দিমাক হার যাতা হায়"—আমার বুদ্ধি পরাস্ত হইয়া যাইতেছে।

হৃদয়ের অসহায় অবস্থায় সান্ত্বনা পাইবার জন্য এইসকল মুহূর্তে তিনি রবীন্দ্রনাথের "একলা চল রে" গানটি শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন।

শুধু মৃত্যু বরণ করার নয়, নিজের আর্থিক ও সামাজিক জীবনে বিপ্লব সাধন করিবার যে সাহসের উপদেশ তিনি দিতেছিলেন, তাহা অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করিবার উপায় তাঁহার নিকট একটিই জানা ছিল। ২০-১১-১৯৪৬ তারিখের প্রার্থনা-সভায় তিনি বলিলেন,

> কিন্তু এই সাহস আমি অপরের মধ্যে দৃষ্টান্তের দ্বারা সঞ্চারিত করিতে পারিব কি না জানি না। এতদিন আমার চারিদিকে পুরাতন সহকর্মীগণ ছিলেন। কিন্তু আজ আমি নিজেকে বলিতেছি, আর নয়, এবার পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতে যদি চাও, তবে একা বাহির হইয়া পড়।

> But whether such courage he could personally infuse in another man or not, was more than he could say. So long he had lived surrounded by a number of companions. But now he said to himself, "Now is the testing time. If you want to know thyself, go forth alone."

৯-১২-১৯৪৬ তারিখে উত্তর এবং পশ্চিম ভারত হইতে আগত কয়েকজন বন্ধুকে তিনি বলিলেন,

> আমি এরূপ নিরন্ধ্র প্রাচীরের সম্মুখে জীবনে কখনও উপস্থিত হই নাই। জনসাধারণের যোগ্য অহিংস সাধন-পন্থার কথা আমি এখন আর ভাবিতেছি না, কিন্তু অহিংস নীতি অনুসারে ব্যক্তিগত-ভাবে আমার নিজের জন্য পথের সন্ধান করিতেই হইবে।

> I have never come across such a dead wall in my life. I do not any longer think of non-violence in terms of the masses, but for myself, I must find my way in terms of non-violence.

শুধু নিজের অহিংস সাধনায় সিদ্ধিলাভের বিষয়েই গান্ধীজী চিন্তা

করিতেন না। মাটির সহিত তাঁহার সংযোগ, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, তাহাদের শক্তির সীমা, কিছুকেই তিনি উপেক্ষা করিয়া চলিতেন না। নিজের অন্তরলোকে হিমালয়ের মত তুষারধবল, কিন্তু একান্ত নিষ্করুণ, মমতাবিহীন, তত্ত্বাভিলাষীর মত ভাবসাগরে নিমগ্ন থাকিলেও সেনাপতি গান্ধী কখনও স্বীয় সৈন্যদলের দুঃখ ভুলিতেন না। নিজের একার জন্য একান্তভাবে অহিংস সম্মত পথের সন্ধান করিলেও দুর্বল মানুষের জন্য অন্যরূপ বিধান দিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, হয়তো তাঁহার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের ফলে এক আবার বহু হইবে, অহিংস কর্মপদ্ধতির জয়-ঘোষণা ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে। ইহার প্রমাণ নিম্নের উদ্ধৃতির সাহায্যে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিব।

তিন মাস নোয়াখালিতে অবস্থান করিবার পর আলুনিয়া নামক একটি গ্রামে গান্ধীজী হিন্দুদের দেশত্যাগের সম্ভাবনার বিষয়ে প্রার্থনান্তিক ভাষণে আলোচনা করিলেন।

প্রশ্ন: লীগ গভর্মেন্ট অথবা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যদি উপযুক্ত খেসারৎ দেয়, তবে উপক্রত অঞ্চল হইতে হিন্দুদের চলিয়া যাওয়া কি আপনি সমর্থন করিবেন?

উত্তর: আমি অহিংসার দৃষ্টিতে ইহা সমর্থন করিয়াছি। এই নীতি সকল প্রদেশ সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে, যেখানে হিন্দু অথবা মুসলমান যে কোন সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য থাকুক না কেন। যদি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কিছুতেই অপরকে সহ্য করিতে না পারে, তবে গভর্মেন্ট আর কি করিতে পারে? আমার মতে, বন্দুকের খোঁচায় যদি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে বশে আনিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা যায়, তবে তাহা ঠিক হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, যদি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় রামধুন সহ্য করিতে না

পারে, হাততালি দিয়া নামগানে আপত্তি করে, রাম যে কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম না হইয়া ঈশ্বরের নাম ইহা বুঝিতে না চায়, এবং হিন্দুরাও যদি করতালি দিয়া নামগান করার আবশ্যকতা স্বীকার করে এবং মুসলমান সম্প্রদায় যদি তাহা সহ্য করিতে না চায়, তবে আমি বিনা দ্বিধায় বলিব, উপযুক্ত খেসারৎ দিলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে চলিয়া যাওয়া উচিত।

Q. Do you support evacuation of the Hindus from the affected areas if the League Government or the majority community agrees to give us due compensation ?

A He had supported the proposition from the non-violent standpoint. It was applicable to all provinces whether the majority was Hindu or Muslim. What could the Government do if the majority had become so hostile that they would not tolerate the presence of the minority community ? In his opinion it would be improper for them to force the majority into submission, nor could they undertake to protect the minority at the point of the bayonet. Suppose for instance that the majority would not tolerate *Ramadhun* or the clapping, would not listen to the fact that Rama was not a person but the name was synonymous with God and that the Hindus believed in clapping, suppose further that the Muslims would not tolerate that, he had then no hesitation in saying that the minority should evacuate if adequate compensation was paid.—*Harijan*, 16 3-47, p. 61.

১৯-২-১৯৪৭ তারিখে বিরামপুর গ্রামে প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রশ্ন : যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাহাদের মনোভাব যদি কিছুতে না বদলায়, তখন আপনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে স্বস্থান পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আপনি ইহাও বলিয়াছেন যে, অহিংস ব্যক্তির পক্ষে প্রতিপক্ষকে

প্রেমের দ্বারা জয় করিবার আশা পরিহার করা উচিত নয়। তাহা হইলে অহিংসায় বিশ্বাসী মানুষের পক্ষে পরাজয় স্বীকার করিয়া সে স্থান ত্যাগ করা কি উচিত হইবে?

উত্তর: এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিব যে, অহিংস ব্যক্তির পক্ষে স্থানত্যাগ করা উচিত নয়, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ, এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের দাবি উঠিতে পারে না। তিনি স্বীয় কর্তব্য পালন করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করিবেন এবং প্রমাণ করিবেন যে তাঁহার উপস্থিতির দ্বারা রাষ্ট্র বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের ভয়ের কোন কারণ ছিল না। নোয়াখালির হিন্দু যে এরূপ আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে নাই তাহা আমি জানি। এখানকার মানুষ সরল গ্রামবাসী। তাহারা মাটির পৃথিবীকে ভালবাসে, নিরাপদে এবং নির্ঝঞ্ঝাটে বাঁচিয়া থাকিতে চায়। এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি দাবি করে যে, তাহাদের পক্ষে স্বস্তিতে থাকিতে হইলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সরানো প্রয়োজন এবং গভর্মেণ্ট যদি তদনুসারে সম্মানজনকভাবে তাহাদের খেসারৎ দেন, তবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষে ভাবিয়া দেখা উচিত, তাহারা সম্মান বজায় রাখিয়া খেসারৎ লইয়া চলিয়া যাইতে পারে কি না। যদি হিন্দুদের অস্তিত্বের কারণেই মুসলমানেরা বিরক্ত হইয়া উঠে, তবে গভর্মেণ্টের পক্ষে লোকাপসারণের পূর্বে খেসারতের ব্যবস্থা করা উচিত। এই নীতি অন্য প্রদেশে, যেখানে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য আছে, সেখানেও অনুসৃত হইতে পারে।

পর-দিবস বিষকাঠালি গ্রামে তিনি পুনরায় বলেন,

প্রশ্ন: গভর্মেণ্ট যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে একঘরে করিয়া বসেন এবং যাহারা দেশত্যাগ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে খেসারৎ

দিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে কি হিন্দুদের সময় থাকিতে পালানো উচিত নয় ?

উত্তর ঃ যাহারা আগেই সরিয়া যাওয়া প্রয়োজন মনে করে এবং এই উদ্দেশ্যে একটি হিন্দু-সঙ্ঘ গড়িতে চায়, তাহাদের সহিত আমার কোথাও মিল নাই। আমি এরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারি না। এ বিষয়ে শেষ দায়িত্ব গভর্মেণ্ট এবং স্থানীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উপরে ন্যস্ত থাকা উচিত। যদি তাহারা বিচারশক্তি হারাইয়া দেউলিয়া হয়, তখন যথাযোগ্য খেসারৎ দিলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে দেশত্যাগ করা উচিত। অন্যথা হিংসার অস্ত্র লইয়া গৃহবিবাদে লিপ্ত হইতে হয়। অহিংসার পথ তো এরূপ হইতে পারে না।

Q. You have advised evacuation if the majority become irrevocably hostile. But you have also maintained that a truly non-violent man should never give up hope of converting his opponent by love. Under these circumstances, how can a non-violent man accept defeat and evacuate ?

A. As to this question, it was perfectly correct that a non-violent man would not move out of his place. For such a one there would be no question of compensation. He would simply die at his post and prove that his presence was not a danger to the State or the community. He knew the Hindus of Noakhali made no such pretension. They were simple folk who loved the world and wanted to live in peace and safety. Such persons would consult their honour if the Government honourably offered them compensation in order to see the majority living in peace. If the mere presence of the Hindus irritated the Muslims who were the majority, he would consider it to be the duty of the Government to offer compensation, as it would be of the Government in a Hindu majority province to offer compensation

to the Muslims if their presence irritated the majority community.

Q. If you think the Government may boycott *i.e.* remove the minority community, if they give adequate compensation, may not people take time by the forelock and go ?

A. As to this he said, that those who felt that they would take time by the forelock, and if a Hindu corporation was formed to take the Hindus away, he had nothing in common with them. He could not be party to any such scheme. The burden lay entirely on the majority community and the Government. He merely meant that when they declared bankruptcy of wisdom, the minority should go if they were adequately compensated. The other way was the way of violence, a civil war, not of non-violence,—*Harijan*, 16·8-47, p. 62.

উপরের দীর্ঘ আলোচনা এবং দৃষ্টান্তসমূহ পাঠ করিয়া, আশা করি, পাঠকের পক্ষে সেনাপতি গান্ধীর চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইবে। তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে গান্ধীজীর ইহাই বিশেষত্ব ছিল যে, যখন সমষ্টির রাজনৈতিক বুদ্ধি উত্তেজনার ছায়ায় রাহুগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে, তখনও তিনি যাহা সত্যতম, যাহা কল্যাণতম মার্গ বলিয়া মনে করিতেন তাহাকেই অবলম্বন করিয়া থাকিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যদি একজনও ধীর অবিচল বুদ্ধির দ্বারা সেই পথকে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করে, পরম বিশ্বাসে, অভয় হৃদয়ে শুদ্ধ চিন্তার দ্বারা প্রদর্শিত পথে চলিতে থাকে, তবে সেই একই ক্রমে বহুতে পরিণত হয়। যে অন্ধকার সমগ্রের জীবনকে পর্যুদস্ত করিতেছে, তাহা উত্তরোত্তর বর্ধমান আলোকের প্রভাবে অবশেষে পরাস্ত হইতে বাধ্য হয়। ইহার জন্য চাই আদর্শ এবং বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা, অর্থাৎ যাহাকে তিনি সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বলিতেন, এবং অসীম ধৈর্য এবং অবস্থাবিশেষে দুরন্ত সাহস। ক্লাউসেভিৎস উত্তম সেনাপতির যে লক্ষণ বর্ণনা

করিয়াছিলেন, যাহা হিংসার জগতে প্রয়োজনায় বলিয়া বিবেচনা করিতেন, অহিংস-সংগ্রাম পরিচালনায় দক্ষ গান্ধী-সেনাপতির মধ্যেও আমরা সেই গুণ পর্যাপ্ত পরিমাণে অবলোকন করি।

ব্যক্তিগত জীবনে উপরোক্ত দৃঢ়তা সময়ে সময়ে আতিশয্যের আকারে দেখা দিত। ১৯৪৬ সালের শেষ সপ্তাহে, আচার্য কৃপালানির সহিত গান্ধীজীর চরিত্রের এই লক্ষণের সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলাম, হয়তো বয়সের জন্য তাঁহার এরূপ হইয়া থাকিবে। কৃপালানিজী উত্তরে বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক নয়। কারণ ১৯১৫ সাল হইতেই গান্ধীজীর মধ্যে এই দৃঢ়তা তিনি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। যাহাকে তিনি সত্য পথ বলিয়া বহু বিচারের পর স্থির করেন, সে পথ হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করা আদৌ সম্ভব নহে।

হয়তো এই দৃঢ়তা না থাকিলে বহু মানুষের জন্য পথনির্দেশের সময়ে তিনি নিজে হালভাঙা নৌকার মত হইয়া পড়িতেন। সেই জন্যই এক সময়ে তিনি লিখিয়াছিলেন,

> নেতাকে নানা মতের লোকের মধ্যে কাজ করিতে হয়। তিনি যদি নিজের বিবেকের নির্দেশ অমান্য করিয়া চলেন, তাহা হইলে তিনি নেতৃত্বের যোগ্য নন। যদি তিনি বিবেকের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়ভাবে মানিয়া না চলেন, তবে তাঁহাকে নোঙর ছেঁড়া ভাঙা নৌকার মত ইতস্তত ভাসিয়া বেড়াইতে হইবে।
>
> তিনিই দক্ষ সেনাপতি যিনি নিজের সুবিধামত, নিজের বাছাই করা জমির উপরে শত্রুর সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত হন। তিনি কি করিবেন, তাহা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কখনও শত্রুর হাতে ছাড়িয়া না দিয়া নিজের আয়ত্তে রাখিবেন।
>
> সত্যাগ্রহ সংগ্রামে কখন যুদ্ধ করিতে হইবে, কখন অগ্রসর

হওয়া দরকার, কখন পিছাইয়া আসা দরকার, কখন আইন-অমান্তের প্রয়োজন, কখন গঠনকর্মের ও সেবাব্রতের দ্বারা অহিংস শক্তি সংগ্রহের প্রয়োজন, ইহার সবই পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হয়। যে পথ সত্যাগ্রহী নিজের জন্য নির্ধারণ করিবেন, তাহা দৃঢ়ভাবে, অবিচলিত হৃদয়ে অনুসরণ করিয়া যাইবেন, উত্তেজনা অথবা নিরাশার বশীভূত হইলে চলিবে না।

A leader is useless when he acts against the promptings of his own conscience, surrounded as he must be by people holding all kinds of views. He will drift like an anchorless ship, if he has not the inner voice to hold him firm and guide him. —*Selections from Gandhi*, no. 522.

An able general always gives battle in his own time on the ground of his choice. He always retains the initiative in these respects and never allows it to pass into the hands of the enemy.

In a *Satyagraha* campaign the mode of fight and the choice of tactics, e.g. whether to advance or retreat, offer civil resistance or organise non-violent strength through constructive work and purely humanitarian service are determined according to the exigencies of the situation. A *Satyagrahi* must carry out whatever plan is laid out for him with a cool determination giving way to neither excitement nor depression.—*Selections from Gandhi*, no. 523.

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, গান্ধীজীর মত সত্যাগ্রহীর উদাহরণ তো অপরকে পরিবর্তিত করিতে সমর্থ হইল না? নোয়াখালিতে হিন্দুও সাহসী হয় নাই, মুসলমান জনতার হৃদয়ও তো বিশুদ্ধতর হইল না? উত্তরে হয়তো বলা চলে, গান্ধীজীকে সেনাপতির পদে বরণ করিলেও আমরা তাঁহাকে সৈনিকের আনুগত্য দিই নাই; বরং তিনি কোন্ অলৌকিক শক্তিতে সব ঠিক করিয়া লইবেন, তাহাই অনেক সময়ে দূর হইতে, হয়তো বা অপরের উপর দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া, নিজেরা শুধু

পর্যবেক্ষণই করিয়াছি। ইংরেজ জাতি ডনকার্ক, সিঙ্গাপুর অথবা ব্রহ্মদেশে পরাজয়ের পরেও অবিচলভাবে চার্চিলের নেতৃত্ব মানিয়া চলিয়াছিল। আমরা তাহার তুলনায় সেনাপতিকে অতি অল্প সমর্থন দিতে পারিয়াছি বা দিবার চেষ্টা করিয়াছি। তবু কেন গান্ধীজী নেতৃত্ব পরিহার করিয়া চলিয়া যাইতেন না, সে প্রশ্নের উত্তর তাঁহার ভাষায় দিয়া বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব।

১৯৪২ সালে তিনি একবার লেখেন,

> ইহা কতকটা সঙ্গতভাবে আমার বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে যে, আমি যদি উত্তম সেনাপতি হই তবে আমার পক্ষে সৈনিকের বিরুদ্ধে দোষারোপ করা উচিত নয়। কারণ, যে মানুষ আমি পাইতেছি, তাহার মধ্য হইতেই তো আমাকে বাছিয়া লইতে হইবে। এই অভিযোগ সঙ্গত বলিয়া আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমার স্বীকৃতির মধ্যে 'কতকটা সঙ্গতভাবে' এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছি, কারণ অহিংস সংগ্রামে আমার সেনাপতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে আমি কতকগুলি শর্ত আরোপ করিয়াছিলাম। শর্তগুলি গৃহীত হইয়াছিল। অভিজ্ঞতার ফলে যদি মনে হয় শর্ত পূরণ করা সম্ভব নয়, তবে আমাকে অপসারিত করিতে হয়, অথবা আমার নিজের পক্ষেই সরিয়া যাইতে হয়। সরিয়া যাইবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি বিফল হইয়াছি; কংগ্রেসের সভ্যগণের সহিত আমার বন্ধন বোধ হয় অচ্ছেদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা আমার শর্ত লইয়া কলহ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা আমাকে ছাড়িবেনও না, যাইতেও দিবেন না। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, দেশের সেবক হিসাবে আমি যতই অপটু হই না কেন, আমি তাঁহাদের প্রয়োজনের সময়ে ছাড়িয়াও যাইব না, এবং হয়তো কিছু সাহায্যও করিতে পারিব। সেইজন্য

তাঁহারা আমার শর্তগুলি, অনেক সময়ে অসন্তোষের সহিত, পূরণ করিবার চেষ্টা করেন। যতদিন এই সকল শর্তের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমার জলন্ত বিশ্বাস থাকে, ততদিন আমি এগুলিকে পরিহার করিতে পারি না। উপরন্তু কংগ্রেসের সভ্যগণের নিকট যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকু লইয়া আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কারণ, যদি আমার বিচার নির্ভুল হয়, তবে একদিন কংগ্রেসের সভ্যগণ আমার বর্ণিত সকল শর্তগুলিই পালন করিবেন, এবং অবশেষে এমন স্বাধীনতালাভে সমর্থ হইবেন, যাহার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দিন পাওয়া যায় নাই।

It has been somewhat justly said that if I am a good general, I must not grumble about my men. For I must choose them from the material at my disposal. I plead guilty. But I have qualified my admission by the adverb 'somewhat', for I laid down the conditions from the very inception of the programme of non-violence. My terms were accepted. If from experience it is found that the terms cannot be worked, I must either be dismissed or I must retire. I retired but to no purpose. The bond between Congressmen and me seems to be unbreakable. They may quarrel with any conditions but they will not leave me or let me go. They know that however unskilled a servant I may be, I will neither desert them not fail them in the hour of need. And so they try, though often grumblingly, to fulfil my conditions. I must then on the one hand adhere to my conditions so long as I have a living faith in them, and on the other take what I can get from Congressmen, expecting that if I am true, they will someday fulfil all my conditions and find themselves in the enjoyment of full independence such as has never before been seen on earth.—*Studies in Gandhism*, p. 314.

মহাত্মা গান্ধী

আমাদের দেশে 'মহাত্মা' শব্দ সাধু-সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গান্ধীজী আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাসী বা সাধু ছিলেন না, তিনি সাধক ছিলেন; তবু ভারতবর্ষের মানুষ কেমন করিয়া মহাত্মা বলিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর সঙ্গলাভের ফলে পার্শ্ববর্তী মানুষের মনে কি বিস্ময়কর উন্নতি ঘটিতে পারে, কিরূপ সাহসের সঞ্চার হইতে পারে, তাহার বিষয়ে ব্রহ্মচর্য অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। ইহাও বলিয়াছি, প্রকৃত ও অনন্য-বুদ্ধিতে মানবপ্রেমের উপরে সেই সাহস সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে তাহা সমুদ্রের জোয়ার এবং ভাটার মত বিপুল শক্তিতে আসিত, আবার নামিয়া যাইত, পুনরায় ফিরিয়া আসিত। কেবল গান্ধীজীর ক্ষেত্রে সাহস বা প্রেম নিরবচ্ছিন্ন ধারায়, নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থিরভাবে জ্বলিত, কোনদিন তাহার 'সত্যতা' সম্বন্ধে সন্দেহ বা সংশয়ের কারণ ঘটে নাই। অপরের ক্ষেত্রেও সেই শক্তি সঞ্চারিত হইয়া যদি কম্পমান হইয়া থাকে, তাহা আধারের ধর্ম অনুসারে ঘটিয়াছিল, ইহা বলাই আমার অভিপ্রায়। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বরং তাহার ব্যতিক্রম ঘটাই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হওয়া উচিত।

নোয়াখালি

নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার উপদ্রুত অঞ্চলে অবশিষ্ট হিন্দুগণকে ইসলামে দীক্ষিত করিবার পর মুসলমান জনতা লীগের নামে অনেক

টাকা চাঁদা হিসাবে আদায় করিয়াছিল, এরূপ অভিযোগ বহু গ্রামে গান্ধীজীর নিকটে উপস্থিত হয়। তিনি কিন্তু নির্ভরযোগ্য প্রমাণের সন্ধান করিতে থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে এক ভদ্রলোকের নিকট একখানি রসিদ পাওয়া গেল। তিনি রসিদখানি লইয়া শিবিরে উপস্থিত হইলেন। রসিদে লেখা ছিল—

> **এতদ্বারায় সর্ব্বসাধারণ মুসলমান বলাগুীয়ার ভাইগণকে যানান যাইতেছে ছুলা মিঞা পোঃ মাষ্টার সাহেব গং স্বইচ্ছা ইছলাম ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া উহাদের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার অবিবিচার করিবেন না ইহাতে অন্যথা করিলে আইন আমলে দণ্ডনীয় হইবেন।**
>
> **নিবেদক**
>
> **(তিনজনের স্বাক্ষর)**

লীগের চাঁদা	**২০০৲**	**২৫০৲ টাকার মধ্যে ২৪০.**
বলাগুীয়ার বিদায়	**৫০৲**	**টাকা বুঝিয়া পাইলাম।**
	——	**বাকী ১০৲ টাকা পরে দিবেন।**
	২৫০৲	

মুসলমানী নাম	**পূর্বের নাম**
ছুলা মিয়া	**... চন্দ্র দাস**
	পোষ্টমাষ্টার

ভদ্রলোকের জবানবন্দি এবং রসিদখানি লইয়া গান্ধীজীর নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি সমস্ত শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি এই ঘটনাটির সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিতে চাই। তাহাতে খুব বেশি হইলে হয়তো ভদ্রলোকের চাকরি যাইবে। কিন্তু তিনি এই ক্ষতিস্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন কি না জিজ্ঞাসা কর। শেষে যেন

বলিয়া না বসেন যে, এই রসিদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই। দুর্বৃত্তগণকে সাজা দিতে হইলে আমাদের পক্ষে নির্ভয়ে সত্যপ্রকাশ করা উচিত। ভদ্রলোককে গান্ধীজীর উপদেশ যথেষ্ট বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তিনি পিছাইয়া গেলেন। রসিদখানি কাজে লাগিল না, আজ জাদুঘরের মত আমার আলমারির শোভাবর্ধন করিতেছে মাত্র। এইরূপে অকৃতকার্য হইবার পর, আমার মনে হইয়াছিল, গান্ধীজী কাহাকে বাঁচাইবেন? আমরা নিজেরাই যে বাঁচিতে চাই না।

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন গান্ধীজী শ্রীরামপুর গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শরণার্থী কোনও রমণীর উপরে, কয়েক মাইল দূরের এক গ্রাম হইতে, অত্যাচারের সংবাদ আসে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কালবিলম্ব ঘটিতে না দিয়া সেই রমণীর জবানবন্দি গ্রহণ করিলেন। পুলিসে সংবাদ দেওয়া হইল; কিন্তু রমণীটি পুলিসের নিকটে অত্যাচারের কথা গোপন করিয়া গেলেন। সেই রমণীটিকে গান্ধীজীর সম্মুখে আনিবার পর তিনি সকল কথা স্বীকার করিয়া বলিলেন, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি কাছারিতে সত্য স্বীকার করিতে পারিব না। এরূপ অবস্থায় আইনের পথে প্রতিকারের আশা করা সম্ভব ছিল না। গান্ধীজী মর্মাহত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, মানুষকে এইরূপ দুর্বল করিয়া রাখার ফলে সমস্ত হিন্দু সমাজ পক্ষাঘাত-গ্রস্ত রোগীর মত পঙ্গু হইয়াছে। অনেক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তবে আমাদিগকে শুদ্ধ হইতে হইবে।

কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে যাহা সম্ভব হয় নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে সেইরূপ সাহসের সঞ্চার ঘটিতে দেখিয়াছি বলিয়া আমরা হতাশ হইতাম না। জগৎপুর নামে একটি গ্রামে দাঙ্গার সময়ে একটি বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়া যায়। দুর্বৃত্তগণ পিছনে কোন প্রমাণাদি রাখিয়া

যাইবে না বলিয়া সেই বাড়ির দুইজন যুবককে হত্যা করার পর ঘরের খাট চৌকি প্রভৃতির সাহায্যে তাহাদিগকে দাহ করিয়া ফেলে। ১১ই জানুয়ারি ১৯৪৭ সাল, সেই বাড়িতে নিহত যুবকদ্বয়ের ভগ্নী ললিতাকে (ইহা তাঁহার প্রকৃত নাম নহে) লইয়া গেলাম। এক বৎসর হইতে পার্শ্ববর্তী কোন গৃহস্থবাড়ির জনৈক যুবকের সঙ্গে ললিতার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল। ইতিমধ্যে দাঙ্গার ফলে সব ওলটপালট হইয়া যায়। দাঙ্গার সময়ে দুর্বৃত্তেরা ললিতাকেও নিস্তার দেয় নাই। ১০ জানুয়ারি ললিতা গান্ধীজীকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, মহিলা-সভায় গান্ধীজী যে উপদেশ দিয়াছিলেন, যে সাহসের বাণী শুনাইয়া ছিলেন, তাহা অভিনিবেশসহকারে শুনিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পর-দিবস সকালে যখন গান্ধীজী লামচর গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন আমি তাঁহার অনুমতি লইয়া ললিতাকে সঙ্গে লইয়া পোড়া বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। এক দিকে যুবক ভ্রাতৃদ্বয়ের অস্থি তখনও কাঠকয়লার সহিত মিশিয়া পড়িয়া ছিল, ঘরের চিহ্নমাত্র ছিল না, নগ্ন ভিটাগুলি দাঁড়াইয়া ছিল, উপরে আগুনের আঁচে ঝালসানো নারিকেল-গাছের পাতাগুলি মুষড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই শ্মশানভূমির মধ্যে ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আবার এখানে ফিরিয়া আসিয়া ঘর বাঁধিতে পারিবেন? ললিতা কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে দূরে মাঠের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, পারিব। উহারা আমার আর কি ক্ষতি করিতে পারে?

ললিতার মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, অবশিষ্ট এক ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, এবং শুনিয়াছিলাম, যে যুবকটির সাহত ললিতার সম্বন্ধ হইতেছিল, তিনি পূর্বের মতই ললিতাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন; উপরন্তু, ললিতা, তাঁহার মাতা, ভাই, ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি

সকলকে তিনিই নিজের বাড়িতেই ইতিমধ্যে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন।

যে সাহস এই নারীর মধ্যে দেখিয়াছি, সে সাহস অর্জন করিলে আজ সমগ্র জাতি যে বাঁচিয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সময়ে সময়ে আমার মনে হইয়াছে, ইহা কেমন করিয়া হইল? গান্ধীজীর মাহাত্ম্য যে ক্রিয়া করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাই সবটুকু নহে। ঐ নারী যাহাকে ভালবাসিত তাহার ভালবাসা হারায় নাই; উপরন্তু মা, ভাই, ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি কাহারও দৃষ্টিতে ছোট হইয়া যায় নাই, তাই বোধ হয় গান্ধীজীর উপদেশের ফলে তাহার মধ্যে শক্তির সঞ্চার সম্ভব হইয়াছিল। অপর দিকে, ললিতার মা, ভাই প্রভৃতির পক্ষেও এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে উদারতা অথবা সুস্থ মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল, কারণ সে সময়ে নোয়াখালিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের ফলে বাংলা দেশের হিন্দুসমাজ, এতদিন যাহাদিগকে বিনা কারণে, এবং নিজের অক্ষমতার প্রতিশোধ লইবার জন্য, দূরে ঠেলিয়া রাখিত, যাহাদের মনুষ্যত্বের কোমর ভাঙিয়া দিত, তাহাদের উপরে শাসনদণ্ড হয়তো বা সাময়িকভাবে সংবরণ করিয়াছিল।

এইরূপে গান্ধীজীর প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্রিয়া করিয়া অত্যাচারিত মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়তা করিত। যে প্রেমকে গান্ধীজী সর্বোপরি স্থান দিতেন, সেই মানবপ্রেমের সহিত হিন্দুধর্মের মূলবস্তুর উপরেও তাঁহার অবিচল নিষ্ঠা ছিল। সেইজন্য তিনি, ইতিহাসের দুর্বল মুহূর্তে হিন্দু-সমাজদেহে যে মরিচা ধরিয়া গিয়াছিল, তাহার সংস্কার সাধন করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে প্রাণবান হিন্দুধর্ম এবং প্রাণশক্তি-সম্পন্ন মানুষের বিকাশের জন্য তপস্যামগ্ন ছিলেন। তাহার ফল

অস্ফুটভাবে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পাইত, ললিতার চরিত্রে তাহারই সাক্ষ্য দেয়।

প্রেম

১৯৩৪ সালে বাংলা দেশ হইতে কয়েকজন কর্মী গান্ধীজীর সহিত উড়িষ্যায় সাক্ষাৎ করিতে যান; তখন তিনি অস্পৃশতা দূরীকরণের চেষ্টায় পদব্রজে পরিক্রমা করিতেছিলেন। কর্মীগণ তাঁহার নিকটে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে তিনি উপদেশ দিয়া বলেন

> **যদি তোমাদের মধ্যে ভাবের প্রসার হয়, তবে তোমরা ঠিক পথে চলিয়াছ; আর যদি মনে হয়, সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছ, তবে তোমাদের পথে কোথাও ভুল হইয়াছে।**

> **If there is a feeling of expansion, then you are on the right track; if there is a feeling of contraction, then there must be something wrong somewhere.**

১৯৩৩-৩৪ সালে বাংলা দেশের জনৈক কর্মী হরিজনদের মধ্যে আশ্রম স্থাপনা করিয়া শিক্ষাবিস্তারের কাজ আরম্ভ করেন। মেথর-পল্লীতে মেথরেরা সারাদিন নোঙরার মধ্যে খাটুনির পর মদ খাইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়া থাকে। আশ্রমের স্থাপয়িতা তাহাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন যে, তাহারা আর মদ ছুঁইবে না, সন্ধ্যাবেলায় নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করিবে। কয়েকদিন মেথরের দল প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহারা আবার মদ ধরিল। যিনি আশ্রম পরিচালনা করিতেছিলেন, তিনি মেথরগণকে সুপথে আনিবার জন্য অনশন আরম্ভ করিলেন। অনশনের সংবাদ গান্ধীজীর নিকটে প্রেরণ করা হইল।

তিনি সংবাদ পাইবামাত্র কর্মীর পত্নীকে উপদেশ দিয়া পত্র লেখেন, প্রত্যহ কি পরিমাণ জল পান করা উচিত, জলের সহিত কতটুকু লবণ মিশাইতে হইবে, বমনের ভাব বৃদ্ধি পাইলে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য ইত্যাদি। প্রত্যহ গান্ধীজীর নিকটে একখানি পত্র লিখিতে হইত; এবং অনশনকারীর শারীরিক অবস্থার সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া তিনি কোন না কোন উপদেশ দিতেন।

আশ্চর্যের বিষয়, যতদিন অনশন চলিয়াছিল, ততদিন গান্ধীজী কর্মীর শরীরের বিষয় ছাড়া আর কিছু লেখেন নাই। কিন্তু যেদিন সংবাদ পৌঁছিল, নির্ধারিত উপবাস সমাপ্ত হইয়াছে, সেইদিনই তিনি পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, উপবাস করা ঠিক হয় নাই। কারণ, তাহার পিছনে আহত অভিমান ছিল। মেথরদের প্রতি অনন্যভাবে প্রেম পোষণ করিলে কর্মী তাহাদের সংস্কারের জন্য আরও ধৈর্য প্রকাশ করিতেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলেও যদি তাহাদের সংস্কার করা সম্ভব না হইত, এবং ইতিমধ্যে সেবকের প্রতি সেবার প্রভাবে মেথরদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার হইত, তখন প্রয়োজন হইলে, অর্থাৎ অনিবার্য হইলে, উপবাস করা উচিত ছিল। এ ক্ষেত্রে সেব্য-সেবকের মধ্যে সেরূপ সম্পর্কের উদয় হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার মত যথেষ্ট প্রমাণ নাই। অতএব বর্তমান উপবাস সত্যানুমোদিত হয় নাই।

কেবল গান্ধীজীর মত মানুষের পক্ষে এরূপ অবস্থাতেও রূঢ় হওয়া সম্ভব ছিল, কারণ তিনি নিজের সম্পর্কেও যেমন নিষ্করুণভাবে বিচার করিতেন, যাহাদিগকে তিনি পরিচালিত করিতেন, তাহাদের সম্পর্কেও সেইরূপ ব্যবহার করিতেন।

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে, বড়দিন উপলক্ষ্যে প্রার্থনার সময়ে গান্ধীজী আমাকে বাইবেল গ্রন্থ হইতে কোন অংশ অনুবাদ করিয়া

জনসাধারণকে শুনাইবার জন্য আদেশ দিলেন। ভগবান যীশুখ্রীষ্টের Sermon on the Mount তাঁহার প্রিয় ছিল এবং গান্ধীজীর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমি অনুমান করিয়াছিলাম, হয়তো তাহাই আজ প্রার্থনা-সভায় পঠিত হইবে। কিন্তু দেখিলাম, তাহার পরিবর্তে তিনি করিন্থিয়ান পর্বের প্রথম সর্গ হইতে সাতটি শ্লোক বাছিয়া রাখিয়াছেন।

যদি আমি মানুষ অথবা দেবদূতগণের ভাষায় কথা বলি, আমার অন্তরে যদি প্রেম না থাকে, তবে আমার শব্দ কাঁসরের অথবা খঞ্জনির আওয়াজ হইতে ভিন্ন নয়।

যদি ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ক্ষমতা আমি লাভ করিয়া থাকি, সকল রহস্য বুঝিবার ক্ষমতা যদি থাকে, সর্ববিধ জ্ঞান যদি আমার আয়ত্তে থাকে, বিশ্বাসের এমন প্রচণ্ডতা যদি থাকে যে তাহার শক্তিতে আমি পর্বতকে টলাইয়া দিতে পারি, তবু যদি আমার প্রেম না থাকে তবে আমার কিছুই নাই।

যদি আমার সকল সম্পদ বণ্টন করিয়া দরিদ্রদের খাইতে দিই, আমার দেহকে পর্যন্ত ভস্মীভূত হইবার জন্য অর্পণ করি, তবু যদি আমার প্রেম না থাকে, তবে বিন্দুমাত্র লাভ হইবে না।

প্রেমের ধর্ম হইল, তাহা বহু দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি দেয়, এবং (দুঃখ সত্ত্বেও) অপরের প্রতি দয়া নষ্ট হয় না ; প্রেম ঈর্ষা করে না, প্রেম আত্মপ্রচার করে না, অভিমানে ফুলিয়া ওঠে না ;

অশোভন ব্যবহার করে না, স্বার্থের জন্য কিছু চায় না, সহজে উত্তেজিত হয় না, অকল্যাণ চিন্তা করে না ;

অধর্মে সন্তোষ লাভ করে না, সত্যে আনন্দিত হয় ;

সব রক্ষা করে, সব বিশ্বাস করে, সকল ক্ষেত্রে আশা পোষণ করে, সকলই সহ্য করে।

I Corinthians XIII

Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become *as* sounding brass, or a tinkling cymbal.

2. And though I have *the gift of* prophecy, and understood all mysteries, and all knowledge ; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.

3. And though I bestow all my goods to feed the *poor*, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing.

4. Charity suffereth long, *and* is kind ; charity envieth not ; charity vaunteth not itself, is not puffed up,

5. Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil ;

6. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth ;

7. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.

এই প্রেমই গান্ধীজীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি সত্যকে স্বীয় জীবনে ইষ্টদেবতার স্থান দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রেম সেই সত্যরূপ সাধ্যের সাধন ছিল। ক্ষণেকের জন্য প্রেমের প্রভাবে সত্য আচ্ছন্ন হইয়া যাইত বলিয়া হয়তো আমরা অনুভব করিতাম, কিন্তু কে জানে মানুষের প্রতি বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি গান্ধীজী যে পরম বিশ্বাসের অস্ত্র প্রয়োগ করিতেন, সেই বিশ্বাসের সোনার কাঠির স্পর্শে সেই ব্যক্তিবিশেষের সত্যতর রূপ জাগিয়া উঠিত কি না ? আমরা বাহিরের বাস্তব দৃষ্টি লইয়া মানবচরিত্রের যে রূপকে স্থায়ী বলিয়া মনে করিতাম, তাঁহার দৃষ্টি তাহাকে খণ্ডসত্য অপেক্ষা বেশি মর্যাদা দিত না, এবং

প্রেমের আঘাতে সেই ব্যক্তির জড়তাভারগ্রস্ত, মূর্ছাচ্ছন্ন, অথচ সত্যতর রূপকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন। তাই বোধ হয় প্রেমকেই তিনি সত্যের সাধনরূপে ব্যবহার করিতেন; কাহারও প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রতি আমরা শাসনদণ্ড উত্তোলন করিলে আমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিতেন, উহাকে ভালবাস, উহার সদ্‌গুণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহার পরে বিচার করিও। হয়তো উহার সম্বন্ধে আজ তোমার যাহা সত্য বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা হইবে না।

গান্ধীজী একবার লিখিয়াছিলেন,

যখন আমি শিশু তখন রাজকোটে দুইজন অন্ধ শিল্পী বাস করিতেন। একজন বাদ্যকর ছিলেন। তিনি যখন বাজাইতেন তখন তাঁহার অঙ্গুলি নির্ভুল গতিতে তারের উপর দিয়া খেলিয়া যাইত এবং সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সেই সঙ্গীত শুনিত।

প্রত্যেক মানুষের অন্তরেও তেমনই অনেকগুলি তন্ত্রী আছে। যদি আমরা ঠিক তন্ত্রীতে আঘাত করিবার কৌশল আয়ত্ত করি, তবে অন্তরের মধ্যে সুপ্ত সঙ্গীতকে জাগাইয়া তোলা সম্ভব হয়।

When I was a little child, there used to be two blind performers in Rajkot. One of them was a musician. When he played on his instrument, his fingers swept the strings with an unerring instinct and everybody listened spell-bound to his playing. Similarly there are chords in every human heart. If we only know how to strike the right chord, we bring out the music.—*Harijan*, 27-5-39, p. 186.

একবার জনৈক কর্মীর সম্পর্কে গান্ধীজী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, "উসকো বাদশাহ বনা দো, বহৎ আচ্ছা কাম করতা হ্যয়, আওর অগর ডেমোক্রাসিমে ডাল দো তো গির যাতা হ্যয়।" 'উহাকে কোন

প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিনায়ক করিয়া দাও, খুব ভাল কাজ করিবে, কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মারফৎ কাজ করিতে বল, অকর্মণ্য হইয়া যায়।' সেরূপ কর্মীর আত্মবিকাশের বা স্বধর্মপালনের জন্য উপযুক্ত বাতাবরণের মধ্যে কাজের সুযোগ দিতে গান্ধীজী পশ্চাৎপদ হইতেন না; ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব ছিল।

একবার শ্রীযুক্ত কিশোরলাল মশরুওয়ালা আমাকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আপনি যদি স্বীকার করেন যে গান্ধীজীর পক্ষে কাহারও নিকট সেবা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন আছে, তবে সেই ব্যক্তিকে কার্যক্ষম অবস্থায় রাখিবার জন্য যাবতীয় বস্তুর প্রয়োজন সেগুলি স্বভাবত দিতে হইবে। এইরূপে ফাউণ্টেন পেন, টর্চ, লিখিবার কাগজ, ভাল আলো হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যক্তিবিশেষের বন্ধুত্ব বা সঙ্গ, খেলিবার জন্য ছোট ছেলে অথবা বিড়ালবাচ্চারও প্রয়োজন হইতে পারে।" অর্থাৎ, গান্ধীজী এরূপ ব্যবস্থা করিতেও কুণ্ঠিত হন না; আমাদের পক্ষেও সেই অজুহাতে আপত্তি করা চলে না; ইহা বলাই কিশোরলালজীর অভিপ্রায় ছিল।

> **All those conditions which will keep him 'efficient' must be fulfilled. And that is how so many things come in train; whether they be good lights, torches, fountain pens, stationery, or x or y, or now and then some children or kitten to play with.**

নিজের বিষয়ে গান্ধীজী

কিন্তু পরের ক্ষেত্রে এরূপ নমনীয় হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজী নিজের সম্বন্ধে কতই না কঠিন হইতে পারিতেন। নিজের অন্তরে তাঁহার খেলার আবশ্যকতা হইত, মানুষের সঙ্গের প্রয়োজন হইত; কিন্তু ভাবের

গভীরতর স্তরে ডুবিবার জন্ত যদি সেগুলিকে বলি দিবার আবশ্যকতা হইত, তখন তিনি কালবিলম্ব করিতেন না। কখনও কখনও হয়তো সংস্কারবশে ইতস্তত করিতেন বটে, কিন্তু আবার পুরাতন ক্ষত্রিয় তাঁহার অন্তরে সতেজে আবির্ভূত হইত।

নিজের অন্তরের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলিয়াই মহাত্মা উপাধি তাঁহার নিকট পীড়াদায়ক ছিল এবং তিনি বারংবার সংশোধন করিয়া মানুষবন্ধুর নিকট জানাইতেন, তিনিও তাহাদেরই মত "মিট্টীকী বনি হুই পুতলি" অর্থাৎ 'মাটির তৈয়ারি পুতুল মাত্র।'

শ্রীরামপুর গ্রামে আমরা যে গৃহে বাস করিতাম, সেখানে জনৈক বৃদ্ধা বাস করিতেন ; তাঁহাকে আমরা পিসীমা বলিয়া ডাকিতাম, কারণ তিনি গৃহস্বামীর পিসীমা ছিলেন। পিসীমা গান্ধীজীর রান্নার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, প্রত্যহ তাঁহার ঘর স্বহস্তে লেপিয়া দিয়া যাইতেন। গান্ধীজী পর্যন্ত নিষেধ করিয়া তাঁহাকে বিরত করিতে পারেন নাই। ৮-১২-১৯৪৬ তারিখে সারারাত পুরাতন হাঁপানি রোগে কষ্ট পাইয়া প্রাতঃকালে পিসীমা একটি পাথরের বাটিতে জল লইয়া গান্ধীজীর সম্মুখে আসিয়া প্রার্থনা জানাইলেন, গান্ধীজী যেন পায়ের আঙুল দিয়া ওই জল স্পর্শ করিয়া দেন, তিনি পাদোদক পান করিয়া সুস্থ হইবেন। এরূপ প্রস্তাবে গান্ধীজীকে রাজি করানো আদৌ সম্ভব ছিল না। তিনি রোগীকে প্রাকৃতিক চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং আলমারি হইতে ফল বাহির করিয়া ফলাহারের উপদেশ দিলেন। কিন্তু পিসীমা কিছুতেই শুনিলেন না, অবশেষে গান্ধীজী হাতের পরিষ্কার আঙুলের অগ্রভাগদিয়া বাটির জল স্পর্শ করিয়া দিলেন।

১১-১-১৯৪৭ তারিখে লামচর নামক গ্রামে প্রার্থনা-সভার পর

গান্ধীজী চৌধুরী-বাড়িতে শরণার্থী-শিবির পরিদর্শন করিয়া রাজমোহন দে, বৈকুণ্ঠনাথ দের বাড়ি এবং চৌকিদার-বাড়ি দেখিতে যান। কোনও এক গৃহস্থ তাঁহাকে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, এতদিন আমরা পাথরের মূর্তি পূজা করিয়া আসিতেছি, আজ স্বয়ং ভগবানকে মানবশরীরে অবতীর্ণ দেখিলাম। গান্ধীজী উপহাস করিয়া উত্তর দিলেন, পাথরের মূর্তির অন্তত এইটুকু গুণ আছে যে, সে কাহারও অনিষ্ট করে না। তাহার পর বলিলেন, সবার উপরে এক ভগবানই আছেন, আর সব মিথ্যা।

আচার্য নন্দলাল বসুর নিকটে বহু দিন পূর্বে একটি কাহিনী শুনিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন শান্তিনিকেতনে নীচু বাংলায় অবস্থান করিতেছিলেন ; গান্ধীজী শান্তিনিকেতন পৌঁছিয়াই 'বড় দাদা'কে প্রণাম করিতে যান। দ্বিজেন্দ্রনাথ তখন চোখে ভাল দেখিতে পাইতেন না বলিয়া গান্ধীজীর মুখখানি একেবারে চোখের কাছে আনিয়া দেখিলেন এবং পরে বলিলেন, আমি তোমার প্রতি আস্থা রাখি। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস, শুধু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের পরেই স্থান পায়। গান্ধীজী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, কি আপসোসের কথা ! অর্থাৎ তিনি উপহাস করিয়া যেন ইহাই বলিলেন যে 'বড়দাদা'র মতিভ্রম না হইলে এমন কথা বলিতেন না ?

> **"I have faith in you. I have faith in God. My faith in you is only next to my faith in God," said Borodada. "What a pity," said Gandhiji laughingly.—*Young India*, 11-6-1925, p. 202.**

১৮-১২-১৯৪৬ তারিখে শ্রীরামপুর গ্রামে আমি গান্ধীজীকে তেল মাখাইতেছিলাম। সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসঙ্গ আসিয়া

পড়িল। রেজ্ঞারেও ডোকের লেখা বই আমি পাঠ করিয়াছি কি না গান্ধীজী আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ডোকের লেখা গান্ধীজীর জীবনী আমি যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছি বলার পর আমি মন্তব্য প্রকাশ করিলাম, অধিকাংশ লেখকই আপনাকে দেবতার পর্য্যায়ে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাহাতে সুবিধা আছে। দেবতাদের পক্ষে অহিংসা সম্ভব, সাধারণ মানুষের পক্ষে নয়, ইহাই তাঁহারা পরোক্ষভাবে বলিতে চান। হিংসার পরিবর্তে অহিংস সংগ্রামকৌশল যে পরীক্ষার যোগ্য এবং সাধারণ মানুষের সাধ্যের বহিভূ'ত নয়, এইটি নিজের মনের নিকট স্বীকার না করার জন্য তাঁহারা আপনার দেবত্ব প্রচার করিয়া থাকেন। কেবল মিসেস মিলি গ্রেহাম পোলাকের লেখায় মানুষ হিসাবে আপনার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্য কোথাও সেরূপ দেখি নাই। গান্ধীজী বলিলেন, মিলি যে অন্য ধরনের মানুষ ছিলেন। কাহারও ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হইবার মত মানুষ তিনি ছিলেন না।

গান্ধীজী বারংবার ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, তিনি মানুষ; যাহা তিনি পারেন, যথেষ্ট অধ্যবসায় সহকারে যে কোন মানুষ তাহা পারে।

নারায়ণপুর নামক গ্রামে ডাক্তার মাতারহমান কাকী নামক জনৈক ভদ্রলোক গান্ধীজীকে প্রশ্ন করিলে পর পর-দিবস ১৬-১-১৯৪৭ তারিখে প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন।

প্রঃ অহিংসার দূত, বর্তমান যুগের বুদ্ধ, আজ দেশে আত্মকলহ এবং রক্তস্নান নিবারণ করিতে পারিতেছেন না কেন?

উঃ উত্তরে গান্ধীজী বলেন, আমি বর্তমান যুগের বুদ্ধের আখ্যা স্বীকার করিতে পারি না। আমি একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু জীবনে বহু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া চলিয়াছি। কিন্তু সেই কারণে

এখানে সমবেত নরনারী হইতে আমি কোন অংশে বড় নয়। আমি ভারতের সকল সম্প্রদায়ের সেবক, নিরপেক্ষভাবে দুই সম্প্রদায়ের (হিন্দু এবং মুসলমান) সেবা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। আত্মকলহ এবং রক্তস্রোত বন্ধ করার শক্তি আমার নাই, যদিও সেরূপ শক্তি থাকিলে হয়তো ভাল হইত। বুদ্ধদেব অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী অবতারপুরুষগণ ইচ্ছামাত্র মানুষে মানুষে কলহ বিবাদ বন্ধ করিতে পারিতেন। আমি পারি না, ইহার চেয়ে আমার অক্ষমতার প্রকৃষ্টতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? এ কথা সত্য যে আমি অহিংসাকে আশ্রয় করিয়া চলি এবং নোয়াখালিতে আমার অহিংসার শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্যই আসিয়াছি।

Q. Why cannot the apostle of non-violence, the modern Buddha, stop internecine war and blood bath in the country?

A. Gandhiji replying to this question acquitted himself from the charge of being the modern Buddha. He was and claimed to be a simple man having extensive experience at his back. But on that account claimed to be no better than any member of the audience. He was an equal servant of both the communities or all the communities of India. He wished he had the power to stop "internecine war" and consequent "blood bath." Buddha or the prophets that followed him had to wave the wand in order to stop wars. The fact that he could not do so was proof positive that he had no superior power at his back. It was true that he swore by non-violence and so he had come to Noakhali in order to test ths power of his non-violence.—*Harijan*, 9-2-47, p. 14.

আরও একটি অনুরূপ উক্তির বিষয়ে আমার মনে পড়িয়া যাইতেছে। স্বাধীনতা-লাভের পরে যখন নানা স্থানে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা চলিতেছিল, তখন অধ্যাপক স্টুয়ার্ট নেলসন নামে জনৈক আমেরিকাবাসী

নিগ্রো অধ্যাপক গান্ধীজীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু আজ সেই উপায়ে গৃহযুদ্ধ নিবারণ করিতে পারিতেছে না কেন? গান্ধীজী উত্তরে বলিয়াছিলেন,

> তাহার কারণ, আমরা এ যাবৎ যে অহিংসা অভ্যাস করিয়া আসিয়াছি তাহা দুর্বলের অহিংসা, অর্থাৎ তাহা অস্ত্রের অভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ভিন্ন কিছু নয়। কিন্তু সবলের অহিংসা অন্যরূপ। যে শক্তিশালী সে শত্রুকে ভয় দেখাইয়া বশে আনিবার পরিবর্তে অহিংস অসহযোগের দ্বারা নিজের উপরে আঘাত আকর্ষণ করে এবং শত্রুর হৃদয়ে ভয়ের পরিবর্তে প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান জাগাইয়া তোলে। হৃদয়ের এইরূপ পরিবর্তন ঘটিবার পর উভয়ে মিলিয়া নূতন সমাজব্যবস্থা রচনায় ব্রতী হয়।
>
> আমি ভারতের অহিংসাকে সবলের অহিংসা বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। অনেকে আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন বটে যে, আমার ভুল হইতেছে। কিন্তু ঈশ্বর আমার দৃষ্টিকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। নয়তো ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ করা আমার দ্বারা হইত না। ঈশ্বর আমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ভারতবর্ষের জন্য যতটুকু সেবার প্রয়োজন তাহা এইভাবে আদায় করিয়া লইয়াছেন।

Intoxicated with his success n South Africa, he came to India. Here too the struggle bore fruit. But he now realized that it was not based on non-violence. If he had known so then. he would not have launched the struggle. But God wanted to take that work from him. So he blurred his vision. It was because their struggle was not non-violent that they to-day witnessed loot, arson and murder. —*Harijan*, 27-7-47, p. 253.

Gandhiji then proceeded to say that it was indeed true that many English friends had warned him that the so-called non-violent non-co-operation of India was not really non-violent. It was the passivity of the weak and not the non-violence of the stout in heart who would never surrender their sense of human unity and brotherhood even in the midst of conflict of interests, who would ever try to convert and not coerce their adversary.

Gandhiji proceeded to say that this was indeed true. He had all along laboured under an illusion. But he was never sorry for it. He realized that if his vision were not covered by that illusion, India would never have reached the point which it had done to-day.—*Harijan*, 30-8-47, p. 302.

নিজের সম্বন্ধে সর্বশেষে গান্ধীজীর ধারণার বিষয়ে তিনটি লেখা উদ্ধৃত করিয়া আমরা গান্ধীচরিত কীর্তন সমাপ্ত করিব।

আমাকে সন্ন্যাসী বলা ভুল। যে আদর্শের দ্বারা আমার জীবন পরিচালিত, তাহা সাধারণ মানুষের গ্রহণের জন্যই আমি সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। আমি নিজেকে সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে বলিয়া মনে করি না; সাধারণের যে যোগ্যতা আছে, আমার তদপেক্ষা কম আছে। আমি যদি অহিংসা বা ব্রহ্মচর্যের অভ্যাসে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া থাকি, তাহার জন্য আমার বিশেষ কোন যোগ্যতা প্রমাণিত হয় না, কারণ কঠিন তপস্যার দ্বারাই আমি এই পথ অতিক্রম করিতে পারিয়াছি। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, আমি যতটুকু পারিয়াছি তাহা উপযুক্ত আশা এবং বিশ্বাসের সহিত অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিলে যে কোন নর বা নারীর পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব।

আমি একজন নিতান্ত দীন ব্যক্তি যে সম্পূর্ণ ভাল হইবার জন্য অবিরত চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। আমার চিন্তা, বাক্য এবং কর্ম

সম্পূর্ণ সত্য এবং সম্পূর্ণ অহিংসার দ্বারা শাসিত হউক ইহাই একান্ত ভাবে আমি কামনা করি। কিন্তু যে আদর্শকে সত্য বলিয়া চিনিয়াছি, সেই আদর্শে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পৌঁছাইতে পারিতেছি না, ইহা আমি জানি। ঊর্ধ্বপথে যাত্রায় কষ্ট আছে, কিন্তু সে কষ্ট আমার নিকট আনন্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। যতই উপরের ধাপে উঠিতেছি, ততই যেন পরবর্তী উচ্চতর ধাপে উঠিবার নূতন শক্তি অন্তরে লাভ করিতেছি।

কিন্তু ইহাও জানি যে পথ দুর্গম। নিজেকে শূন্যে পরিণত করিতে হইবে (অর্থাৎ নিঃশেষে সকল সংস্কারকে বলি দিতে হইবে)। যতদিন পর্যন্ত সাধক স্বেচ্ছায় অপর সকল মানুষের নীচে নিজের আসন রচনা না করেন ততদিন তাঁহার মুক্তি নাই। অহিংসা চরমতম নম্রতার নামান্তর মাত্র।

It is wrong to call me an ascetic. The ideals that regulate my life are presented for acceptance by mankind n general. I claim to be no more than an average man with less than average ability. Nor can I claim any special merit for such non violence or continence as I have been able to reach with laborious research. I have not the shadow of a doubt that any man or woman can achieve what I have, if he or she would make the same effort and cultivate the same hope and faith.

I am but a poor struggling soul yearning to be wholly good—wholly truthful and wholly non-violent in thought, word and deed, but ever failing to reach the ideal which I know to be true. It is a painful climb, but the pain of it is a positive pleasure to me. Every step upward makes me feel stronger and fit for the next.

But I know that I have still before me a difficult path to traverse. I must reduce myself to zero. So long as one does not of his own free will put himself last among his fellow creatures, there is no salvation for him. *Ahimsa* is the farthest limit of humility.—*Selections from Gandhi*, Nos. 600, 12 and 13.

———